

হালিসহর আনন্দম

আনন্দম্-এর আনন্দধারা

শারদ সংখ্যা – ১৪৩৩

ISBN NO. – 978-93-7498-087-3

স্বপন পাল

সম্পাদক

শিবসৌম্য বিশ্বাস ও স্বপ্না রায়

যুগ্ম সহ সম্পাদক

পত্রিকা কার্যালয়

আনন্দম্ অডিটোরিয়াম

সরকার বাজার, হালিসহর উ: ২৪ পরগনা

মো : 9830293674 / 9830052024 / 9433926419 / 9830845764

BOOK TITLE

আনন্দধারা শারদসংখ্যা ২০২৬

ANANDA DHARA SAHITYA PATRIKA

Sharadiya Sankhya – 2026

ISBN NO. - 978-93-7498-087-3

Edited by : Swapan Pal

Cover of Book	: Swapan Pal
Publisher	: Computer Raj
Type setter	: Computer Raj
Offset printer	: Anandam Printer
Binding	: Raj Binder
Mobile	: 9830293674
Price	: 300/-
Email	: <u>apuswapanpal@gmail.com</u>
Website	: Halisahar Anandam Welfare Society



978-93-7498-087-3

প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'নেপালে' যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি

সম্পাদকীয়

।। মা নিসাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্ত্রতীঃ সমাঃ

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।।

আবেগের প্রথম লিখিত রূপ। তারপর কত কোটি কোটি গল্প, গান, কবিতা লেখা হয়েছে। ভাষা, ব্যাকরণ, অংক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, মহাজাগতিক বিষয় নিয়ে লেখা, তর্ক বিতর্ক, সত্যের উন্মেষ ঘটছে। কত সত্যকে স্বার্থে উন্মত্তরা ধ্বংস করেছে, অবয়ব পাণ্টেছে, - হাজার পাঁচেক বছর মাত্র সভ্যতার বয়স। আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে হয়েছে। কোনো যুদ্ধই চিরস্থায়ী হয় না। কোনো ধ্বংসই সম্পূর্ণ হয় না।

আমরা এই মুহূর্তে এক যুগ সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি উন্নতির শিখরে। আমরা যেমন সারাজীবন চাইলেও বিমানে চড়তে পারবো না। ঠিক উন্নতির শিখরে বেশিক্ষণ চড়ে থাকা যাবে না। কলির শেষ সত্য এর সূচনা - যা হবার তাই ঘটছে। মহাপ্রলয় আসবে। পৃথিবী রসাতলে যাবে। সাম্প্রতিক নেপালের ঘটনার মত আরও অনেক প্রলয় আসন্ন।

আসন্ন অনেক অদেখাকে দেখার। ঠিক অলৌকিক এর মত। অবিশ্বাস্য সব দেখতে পারবো একে একে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার, থোড়িয়াম এর শক্তি, রে দিয়ে লক্ষনরেখা সর্বশেষ আগ্রাসী এ আই। হ্যাঁ এ আই এমন এক প্রযুক্তি, আমাদের বুদ্ধি যেখানে আর কাজ করবে না। অবাক হয়ে থাকবো। তখন কি লিখবো? কি ভাববো? ভাবনার বহিঃপ্রকাশ কে দেখবে? কে শুনবে? আবেগ যেখানে মূল্যহীন, ক্রিয়া যেখানে প্রতিক্রিয়াহীন, শ্রম যেখানে মূল্যহীন, টাকা যেখানে কাগজ মাত্র, সোনা যেখানে সাধারণ ধাতু। প্রয়োজনের তুলনায় যেখানে খাবার বেশি, পোশাক বেশি, বিনোদন বেশি - শুধু সম্ভান এর জন্য কামনা বাসনা। আগামীর পৃথিবী হোক মঙ্গলময়। আমরা তৈরী তো! লাইব্রেরি আমরা ভুলে গেছি। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমছে, চাকরির প্রয়োজন নেই। পড়ার প্রয়োজন নেই। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের হাতের মুঠোয়। বুদ্ধি শেষ, বিদ্যা শেষ, অর্থ শেষ, বই শেষ, আবেগ শেষ, লেখা শেষ, - আমাদের পত্রিকা! কোটি কোটি পত্রিকা, বই, মলাট, প্রচ্ছদ, সমস্ত কিছু হাতের মুঠোয়। চাইলেই পাতার পর পাতা পড়তে পারি হাতে রাখা মুঠোফোনে, বা সামনে থাকা বড়ো পর্দায়। মাত্র একটা ক্লিক। এক ক্লিকেই যা চাই। তবে!

আমাদের তৈরী ধর্ম, জাতি, বর্ণ, দেশ বেড়া জাল এক ক্লিকেই সমান। নতুন প্রজন্ম কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শ্রমিক একই অঙ্গে বহুরূপী। শক্তিরূপেণ সংস্থিত। আমাদের আরাধ্য দেবীও কাঁদছেন বিসর্জনে।

অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাস্ত্রত।

নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংখ্যঃ।।

হালিশহর আনন্দম

আনন্দম এ আমরা কেনো সকলে আছি ও
কেনো থাকবো এই সুন্দর হৃদয়ের ঠিকানায়!

কৃষ্ণদাস সরকার

পুণ্যতোয়া গঙ্গার পূর্ব তীরে সাধক রামপ্রসাদ সেনের পুণ্য ভূমিতে অবস্থিত
হালিশহর আনন্দম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

ভোরের মিষ্টি আলোয় আলোকিত আনন্দম,
শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি কথা কবিতা সুরের স্বরগম,
সকলকে সাথে নিয়ে এক শুভক্ষণে
বেঁধে রেখেছে আমাদের অমোঘ বন্ধনে।

আমার গ্রামের শেষে বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ি। যে বাড়ি পরিপূর্ণ ভালবাসায়। ঠিক
সেই বাড়ির মত বিশ্বাস আর ভালোবাসায় পূর্ণতা প্রাপ্ত আমাদের সকলের আনন্দম,
"হালিশহর আনন্দম ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি "। সৃষ্টির উল্লাসে সৃষ্টির জন্য দীর্ঘ
২৫ বছর যাবৎ এই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বর্তমানে সরকারি ও কেন্দ্রীয়
সরকারের নীতি আয়োগ দ্বারা রেজিস্টার্ড একটি সংস্থা। অনুদানে আয়কর মুক্ত।
আনন্দমের ২৫ বছরের শ্রম, মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করা। সমতা সততা
স্বচ্ছতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাবার নাম,
"আনন্দম"। তাইতো আজ আনন্দমের লোগোকে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারতবর্ষের সর্ব
বৃহৎ সংস্থা ডাক বিভাগ। ডাক টিকিটে লাল কেপ্লার সাথে অবস্থান আমাদের
আনন্দমের লোগো। আমরা গর্বিত ও কৃতজ্ঞ আজ। "আনন্দম" হালিশহরের
সংস্কৃতির পথের ও সামাজিক কাজের এক বটবৃক্ষ, এখন সারা বাংলায় বিস্তৃত।
সংস্থার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সবুজে সবুজে আবৃত। এক একটি শাখায় দায়িত্বে
আছেন আমাদের বিভিন্ন সদস্য সদস্যা।

১) পড়াশুনার কোচিং ছাড়াও নাচ-গান-আবৃত্তি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
আছে।

হালিসহর আনন্দম

- ২) যাঁরা লেখেন, যাঁরা নিজের সৃষ্টিকে ধরে রাখেন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নিজের কলমে, তাঁদের জন্য আছে আনন্দমের সাহিত্য শাখা, " আনন্দধারা ", দায়িত্বে যুগ্ম সহ সম্পাদক। কবি ও লেখক শিবসৌম্য বিশ্বাস ও স্বপ্না রায়। সম্পাদক কবি ও সংগঠক স্বপন পাল মহাশয়।
- ৩) স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা শিবির - ইংরেজি প্রতিমাসের দুই তারিখ। দায়িত্বে আমাদের মাননীয় সদস্য ও সদস্যা। আছে জ্যোতির্ময় পাল, স্বানা পাল।
- ৪) নাটক, শ্রুতি নাটক বিষয়ক আলোচনা। নাচ, গান, আবৃত্তির প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা কেন্দ্র। দায়িত্বে আমাদের মাননীয় সদস্য, সদস্যা, শিক্ষক শিক্ষিকা।
- ৫) আবৃত্তি, নৃত্য, গান, বাচিক বিষয়ক, দায়িত্বে আমাদের মাননীয় সদস্য সদস্যা।
- ৬) পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার, ও অন্যান্য সেমিনার দায়িত্বে আমাদের মাননীয় সদস্য সদস্যা।
- ৭) যাঁরা মনে করবেন দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকবেন, সমাজের নিপীড়িত মানুষদের পাশে থাকবেন, তাঁদের জন্য আনন্দমের ওয়েলফেয়ার বিভাগ, দায়িত্বে মাননীয় সদস্য সদস্যা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার রিন্টু দে দায়িত্ব নিয়ে অসহায় মানুষদের পাশে থেকে কাজ করেন।
- ৮) যাঁরা মনে করবেন ঘরোয়া আলোচনায় আড্ডা দেবেন, যে আড্ডা ভাসবে সুরে কথায় কবিতায় সাহিত্যের অঙ্গনে, হয়তো বা শুধু অংশ গ্রহণ করে সেই আড্ডায় থাকতে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এইটি সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- ৯) গাড়ি পরিষেবা - দায়িত্বে রুদ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার, টেকনিশিয়ান ও প্রশিক্ষক।
- ১০) সাংস্কৃতিক কাজের পাশাপাশি আমরা শিক্ষার আঙিনায় আলোকিত। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা এই মহৎ কাজে এগিয়ে এসেছেন। হালিশহর কাঁচরাপাড়া জোনপুর নৈহাটি সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজন করেছিলাম মক টেস্ট ২০২৬। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোনো সাহায্য, প্রতিযোগিতায় মেধা অন্বেষণ, দূষণ রোধের চেষ্টা, প্রভৃতির উদ্যোগ সদস্য-সদস্যগণ দ্বারা পরিচালিত।
- ১১) হালিশহর ভ্রমণ, হৃদয় দিয়ে দেখে নেওয়া প্রাচীন ও বর্তমান মঠ মন্দির, হাঁটতে হাঁটতে বা গাড়িতে কুমারহট্ট হালিশহরের ইতিহাস জানা, মনের এক অনন্য অনুভূতি। আনন্দমের সদস্য গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১২) বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ, দায়িত্বে আইনজীবী সদস্যগণ।

আনন্দম ক্লাস্তির শেষে প্রশান্তির জায়গা, নিজের সৃষ্টিকে উন্মুক্ত করার জায়গা, মানুষদের পাশে থেকে সমাজের জন্য কিছু কাজ করা একটু সহানুভূতি সহমর্মিতা ও মানবিকতার আধারে। একই ছাদের নিচে আমরা পাই আমাদের প্রতিদিন চলার আবেগ অনুভূতি। তাইতো আনন্দম এক অদ্বিতীয় সংগঠন যার দায়িত্বে রয়েছেন একজন কবি সংগঠক পরিশ্রমী মানুষ। কুমারহট্ট হালিশহরের নাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ, নিজের হাতে গড়ে প্রায় ২০০০ টি সাধক রামপ্রসাদ সেনের মূর্তি তুলে দিয়েছেন বিশিষ্ট মানুষদের হাতে ও পৃথিবীর ৮ টি দেশে, আমাদের প্রিয় সম্পাদক, কবি শিল্পী সংগঠক স্বপন পাল মহাশয়। আনন্দমে আমাদের সভাপতি মাননীয়া মনীষা পাত্রের অবদানকেও স্বীকার করতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই সুন্দর সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পেরে। যতদিন স্বচ্ছতা সমতা সততার আধার থাকবে শিরদাঁড়াটা উঁচু করে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকবো, অংশগ্রহণ করবো বিভিন্ন কাজে এবং সমাজের দুঃস্থ মানুষদের পাশে। আমি জানি সম্মান করলে সম্মান পাওয়া যায়, ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়, টু ওয়ে কমিউনিকেশন। নবীনরা যুক্ত হবে এই মহৎ কাজে তাদের হাতে সমস্ত কিছু সমর্পণ করে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করবো। শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যেমন আছেন, আছেন ফটোগ্রাফার, জ্যোতিষী, কবি, সাহিত্যিক ও গৃহবধূরাও। সাংস্কৃতিক আঙিনার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সান্নিধ্যে হালিশহর আনন্দম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আজ আলোকিত। সেই উৎসারিত আলোয় উদ্ভাসিত হোক সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। আনন্দমের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিনিয়ত নতুন সদস্য সদস্যা যুক্ত হচ্ছেন আনন্দমে। তাঁদেরকে শুভেচ্ছা। প্রতিটি সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে আনন্দম এগিয়ে চলুক সমাজ গঠনে, সৃষ্টি হোক স্বচ্ছতা সততা সমতার বাতাবরণ। আনন্দমের বিজয় রথের সাথী হয়ে আমরাও যেনো পথ চলতে পারি। উন্মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি হৃদয়ের ঠিকানায় সকলের প্রিয় সংগঠন, - "হালিশহর আনন্দম"।

আনন্দম্ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

Reg. No. S0023521

২০২৬-২০২৭ এর কমিটি

সম্পাদক	: স্বপন পাল
সহ সম্পাদক	: স্বানা পাল
সভাপতি	: মনীষা পাত্র
সহ সভাপতি	: কৃষ্ণদাস সরকার
কোষাধ্যক্ষ	: কৃষ্ণা পাল
সহ কোষাধ্যক্ষ	: জ্যোতির্ময় পাল
উপদেষ্টামণ্ডলী	: শিবসৌম্য বিশ্বাস, রিন্টু দে, ডা: বাসুদেব দাস, সুবোধ দেবনাথ, আশিষ ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অর্পিতা দত্ত দাস, কৃষ্ণা মজুমদার, মালা প্রামানিক, স্বপ্না রায়, রুদ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
সদস্য/সদস্যা	: শুভ্রাংশু মিত্র, অপর্ণা দে, অশোক কুমার ঘোষ, বাবলু দিলীপ রায়, ভাস্কর মজুমদার, বিবস্বন নাথ, ড: সীমা রায়, গৌতম ভৌমিক, জয়শ্রী দাস, মনোজ মুখার্জী, রমা বিশ্বাস, রিতা দে, সঞ্চিতা কাস্তাল, সুবীর মুখার্জি, কল্পনা রায়, কাকলি মল্লিক, করবী গোস্বামী, কৃষ্ণ প্রধান, চন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তাপসী রায়, নিবেদিতা দাস, প্রসাদ ব্যানার্জী, বকুল বিশ্বাস, লক্ষ্মী দাস, শর্মিষ্ঠা সিংহ রায়, সুকান্ত মুখার্জি, সুভাষ ঘোষ, কবিতা দাস, বিদ্যার্থী মিত্র, প্রতিভা বিশ্বাস ভৌমিক, অঞ্জু সরকার, শিল্পী সরকার, জয় চক্রবর্তী, শিপ্রা মন্ডল, মঞ্জু কর্মকার, মীনাক্ষি চ্যাটার্জী, হুন্দা মুখার্জী।

আনন্দধারা শারদসংখ্যা ২০২৬

লেখকসূচী

সম্পাদকীয়

কৃষ্ণদাস সরকার – আনন্দমে আমরা কেন সকলে আছি ও কেনো থাকবো?

১১-৫০ প্রফেসর ডঃ সুব্রত শাস্ত্রী, ডঃ অপরাজিতা শাস্ত্রী, নীলাচল চট্টরাজ, উৎপলকুমার ধারা, আতাউর রহমান, রাবেয়া রহমান, প্রবীর কুমার বিশ্বাস, ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত ঘোষ, অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মল করণ, পার্থ ভট্টাচার্য, তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নাথ সরকার, কাজল সুর, রত্না মুখোপাধ্যায়, সুমন রহমান, চিন্ময়ী বিশ্বাস, সুজান মিঠি, বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা ঘোষ, অমিত সাহা, পার্থ সারথি ভট্টাচার্য, শঙ্কর হালদার, অশোক কুমার পাণ্ডে, নায়েব আলি গায়েন, সজল কুমার গুহ, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী।

৫১-১০০ ডাঃ অনিরুদ্ধ পাল, রঞ্জন ভাওয়াল, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর মজুমদার, পাণ্ডু বিশ্বাস, ডঃ ব্যাসদেব শঙ্করাচার্য্য, অম্বর কান্তি কুমার, বুমা সরকার, শোভা সান্যাল, ডঃ সুদীপ্ত রঞ্জন সাহা, ডঃ সঞ্জয় প্রামানিক, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অনিমা গুছাইত, কৌশিক গাঙ্গুলী, স্বপন কুমার দাস, মনীষা পাত্র, ডাঃ দুলাল কৃষ্ণ দাস, তন্ময় ভট্টাচার্য্য, শুভ্রাংশু মিত্র, ভাস্কর মজুমদার, মিলন ঘোষ, সুবোধ দেবনাথ, ড. সীমা রায়, গোপা দেবনাথ, কৌশিক মন্ডল, ড. অমৃতলাল বিশ্বাস, শ্রীমন্ত দাস, চন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুজিত বালু, সুভাষ চন্দ্র বসু, আশিস্ ভট্টাচার্য্য, গৌতম ভৌমিক, নূপুর গাঙ্গুলী, স্বপন মজুমদার, হিমাংশু ভূষণ বালো, প্রদীপ নারায়ণ পাণ্ডে, মনীষা রায়, অদিতি মুখার্জী সেনগুপ্ত, সুনীল রঞ্জন পাণ্ডে, আলোকা বণিক, জগদীশ মণ্ডল, উত্তম ব্যানার্জী, অঙ্কনা নন্দী, সুপদ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাস, শুভম রায়, পি. শাস্ত্রী, সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জী, শিবানী চ্যাটার্জী, নিবেদিতা দাস, দুর্গাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, বাবলু দিলীপ রায়, সঞ্চিতা কানথাল, শিল্পী সরকার, পার্থ দেবনাথ।

হালিসহর আনন্দম

১০১-১৫০ রামকৃষ্ণ পাল, হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুকুমার বিশ্বাস, অনিমা মুখোপাধ্যায়, তুষার আচার্য্য, নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, বিমল চন্দ্র পাল, তিমির রঞ্জন হালদার, সুপ্রভাত মল্লিক, জয়নারায়ণ সরকার, মমতা রায়, মাধুরী মাইতি, শুদ্ধদেব সান্যাল, অর্কপ্রভ ভদ্র, জয় চক্রবর্তী, মরুভূমি, অঞ্জু সরকার, সুবীর মুখার্জী, সৌমেন দে, মনোজ কুমার দেওয়ান, সুভাষ চন্দ্র মজুমদার, শিব শঙ্কর বস্তু, অমিত ঘোষ, বিক্রমজিত ঘোষ, মৌসুমী দে, স্বপ্নানীল সরকার, শিউলী সরকার, বাপি সিনহা, শঙ্কর রায়, গৌর চন্দ্র দাস, নকুল সাহা, সন্ধ্যা মন্ডল, কল্যাণ আচার্য্য, উদয় কুমার সাহা, সুনির্মল মিস্ত্রী, আর্যব মুখার্জী, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী বোস, গৌরাজ দেবশর্মা, দীনেশ চন্দ্র হাজারী, কাজল দাস, সুতপা দেবনাথ, গনেশ চন্দ্র রায়, অগ্নিদূত, বিভূ মুখোপাধ্যায়, অনিল সাহা, দেবযানী সেনগুপ্ত, সুনীল সমাচার্য্য, মনোরঞ্জন হালদার, সমীর কুমার প্রতিহার, তৃপ্তি পাল, প্রমোদ বড়ুয়া, পাঁচু গোপাল হাজারী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, রমা সরকার, লেখা মন্ডল, তুলসী দে, সাগর চক্রবর্তী, সৌরভ ঘোষ, মনিশঙ্কর রায়চৌধুরী।

১৫১-২১১ রূপকুমার হালদার, নিমাই চন্দ্র মন্ডল, নির্মল কুমার প্রধান, ড: দিবাকর নাথ, অদ্রিকা সরকার, পলাশ হালদার, মৌসুমী রায়, দেবব্রত মাইতি, স্বপন সাহা, সুনীল আদক, সুব্রত দাস, অসিত কুমার মল্লিক, ইলা সাহা, গৌতম দেবশর্মা, আশিষ পাল, দেবানন্দ পাল, ইন্দ্রানুজ চৌধুরী, শ্রী আঢ্য, অমিত কুমার দাস, ফুলেশ্বরী গায়েন, রিয়া দে, টিয়া বিশ্বাস, স্মিতিক জোয়ার্দার, কৌশিকী কুন্ডু, কাকলী মন্ডল, অনাথ, অঙ্কিতা প্রধান, বর্ণালী গুপ্ত, মালা প্রামানিক, প্রসাদ ব্যানার্জী, সুনীল ঘোষাল, কনকেন্দু চ্যাটার্জী, নয়না বিশ্বাস, স্বপ্নারূন বন্দ্যোপাধ্যায়, উজান দাস, মহ: বাকিবিল্লাহ মন্ডল, দিশিতা হালদার, দীপ দুলাল বিশ্বাস, ঋত্বিকা চৌধুরী, বৈদ্যনাথ পাল, তাপস কুমার দত্ত, মদন ঘোষ, স্বপন পাল, অপর্ণা দে, স্বপ্না রায়, শিব সৌম্য বিশ্বাস।

দুর্গা পূজায় বিদ্ব বৃক্ষ ও শাক - সজীর ব্যবহার
প্রফেসর ডঃ সুব্রত শাস্ত্রী

বাঙালীর বিভিন্ন উৎসব পার্বণের মধ্যে শারদীয়া দুর্গোৎসব একটি জাঁকজমকপূর্ণ শ্রেষ্ঠ উৎসব। শরৎকালে এই পূজা হয়ে থাকে বলে একে শারদীয়া দুর্গোৎসবও বলা হয়। শরতের প্রকৃতি সত্যিই অতি সুন্দর ও মনোরম। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের ভান্ডার উন্মুক্ত করে হাতছানি দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান করে তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য। আর এই অপরূপ মায়াবী প্রকৃতির প্রাণখোলা পরিবেশে কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ সকল স্তরের মানুষই এই আনন্দ দোলায় চেপে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সত্যিই সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ফুরফুরে বাতাস হৃদয়কে পবিত্র করে তোলে এবং প্রাণকে মাতৃময় করে তোলে। বাসন্তকালেই দেবীর আরাধনা হতো কিন্তু অকালে রামচন্দ্র পূজো করে মায়েস আশীর্বাদ লাভ করেন। তাই বসন্তকালের পূজো বাসন্তী পূজো নামে খ্যাত। যা কালের পূজো তার ক্ষেত্রে দেবীর বোধন বা জাগরণের প্রয়োজন পড়ে না। আর শরৎকালে রামচন্দ্রের এই পূজো অকাল বোধন নামে খ্যাত। তবে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন পূজোর আগে রাজা সুরথ ও বৈশ্য শরৎকালে দুর্গা পূজো করেছিলেন। এইভাবেই শরৎকালে দেবী অর্চনা শুরু হয়।

শরৎকালে শারদীয়া শ্রী দুর্গা পূজোয় বৃক্ষ শাক সজী রূপ সামগ্রীর ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হবে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা পূজোর অপরিস্রব অঙ্গ রূপে। সমগ্র বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান দেখা যায়। দুর্গা পূজার মতো আরো অন্যান্য দেব দেবীর পূজোতেও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান দেখা যায়। কৃষিকার্য বৃক্ষ শাক সজীর উর্বরতা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের তথা সমাজের মানুষের মধ্যে নবজীবন ও জীবনীশক্তির উদ্বোধন এর জন্যই অনুষ্ঠান করে। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের কিংবা

হালিসহর আনন্দম

পার্থিব সত্ত্বার বিকাশ ও সার্থকতা রূপ সেতু বন্ধনের জন্য এই সকল কিছু ধর্মানুষ্ঠান ও রীতিনীতি শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বের সমাজে অনুষ্ঠিত হয়।

মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার পূজায়ও দেখি নবপত্রিকার প্রবেশ ও দেবী রূপে তার উপাসনা ও আরাধনা। ভারতে আধ্যাত্ম সাধনার দৃষ্টিই সর্বত্র প্রসারিত এবং এই দৃষ্টিই সমগ্র ভারতের মানুষকে দিয়েছে জড় থেকে চৈতন্যের ও পার্থিব থেকে অপার্থিবের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণা। দেবী দুর্গা পূজায় দেখা যায় কদলী বৃক্ষকে চিন্তা করা হয়েছে ব্রহ্মাণী রূপে, কচু গাছকে কালী রূপে, হরিদ্রা গাছকে দুর্গা, জয়ন্তী গাছকে কার্তিকী, বিল্ব বৃক্ষকে শিবা, দাড়িম গাছকে রক্তদন্তিকা, অশোক গাছকে শোকরহিতা, মান গাছকে চামুণ্ডা ও ধান গাছকে লক্ষ্মী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

★ পবিত্র নবপত্রিকার পূজায় আছে ★

- ১.এষা রম্ভাস্থাং ব্রহ্মানীম্
- ২.কচুস্থাং কালিকাম্
৩. হরিদ্রাস্থাং দুর্গাম্
৪. জয়ন্তীস্থাং কার্তিকীশ্চ পূজায়েৎ
৫. বিল্বস্থাং শিবাম্
৬. দাড়িমীস্থাং রক্তদন্তিকাম্
৭. অশোকাস্থাং শোকরহিতম্
৮. মানস্থাং চামুণ্ডাম্
৯. ধান্যস্থাং লক্ষ্মীম্

এই নয়টি বৃক্ষ (বা বৃক্ষের ডাল) দেবী দুর্গার পূজায় ব্যবহৃত হয় দেবী দুর্গারই অনুকল্প বা প্রতিনিধি রূপে। "" শ্রী দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী"" শুধু নয়। বৃহন্নদিকেশর,দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতির অভিমতে দেবী দুর্গার প্রতিনিধি রূপে চিন্তা করে বিভিন্ন বৃক্ষ বা বৃক্ষ শাখার পূজা করা হয় আদিম যুগের নীতি ও

হালিসহর আনন্দম

আচরণকে অনুসরণ করে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিল্ব বৃক্ষে দেবকী দুর্গাকে আহ্বান করে যে জয়ন্তী,মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী,কপালিনী, প্রভৃতি নামের উল্লেখ করা হয় সেগুলি সমস্ত শক্তিরূপিনী দেবীরই রূপান্তর ও নামান্তর সে কথার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়----

"" ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বহা স্বধা নমোহস্ততে""

" ক্রিয়াকাণ্ডবিধি" - পূজা গ্রন্থে বিল্ববৃক্ষের পূজায় সংকল্পের পাদ টীকায় মন্তব্য করা হয়েছে:-"কেহ কেহ বিল্ববৃক্ষেরই যে আমন্ত্রণের সংকল্প করেন --ইহাই সঙ্গত কারণ মন্ত্রে দেবী দুর্গার আমন্ত্রণের কোনো উল্লেখ নাই।" অবশ্য পূজাবিধির সাধারণ রচয়িতারা দেবী ধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত নন। সেজন্য তাঁরা বিল্ববৃক্ষকে ও দেবী দুর্গার দেবী সত্ত্বাকে পৃথক ভাবে কল্পনা করেন- যা ইতিহাসে সঙ্গত নয়। আমরা দেবী দুর্গার বিশ্ব মাতৃহের ধারণা ক্ষেত্রে গ্রহ, উপগ্রহ,কাঠ প্রস্তর,বৃক্ষ ও ভূত প্রেতের প্রভৃতির পূজা ও উপাসনার ক্ষেত্রে দেবী ধারণার ক্রমবিকাশের একটি সুস্পষ্ট ইতিহাসের সন্ধান পাই। এ সম্বন্ধে বিশেষ সকল মনীষী ও গবেষকদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত তাই। সেজন্য দুর্গা পূজাকে বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিকদের অভিমতে বলা যায় যে শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার সামগ্রিক রূপ, আয়োজন ও অনুষ্ঠান দেবী ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসেরই সুস্পষ্ট পরিচয়।

আবার দেবীর পূজার সপ্তমী তিথির পূর্ব দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে প্রথম বিল্ববৃক্ষে দেবীর আবেশ বা আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান চিন্তা করে বিল্ববৃক্ষমূলে দেবী দুর্গার পূজা করা হয়। পরের দিন সপ্তমীতে পূজামন্ডপে প্রবেশ করে ওই পূজিত বিল্ববৃক্ষের শাখা(ডাল) ও বিল্বফল পূজা স্থলে স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ দেবী তখন বৃক্ষ থেকে প্রতিমায় বা বৃক্ষ রূপ থেকে দেবী মূর্তিতে রূপান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হন পূজার জন্য।

হালিসহর আনন্দম

"" ওঁ মেঘমন্দর কৈলাশ হিমবহিষরেগিরৌ।

জাতঃ বিল্ববৃক্ষ ত্বমাদ্বিকায়ঃ যদাপ্রিয়ঃ।।

শ্রীকৈলাশশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।

নেতব্যোহপি ময়াগচ্ছ পূজ্যো দুর্গতস্বরূপঃ।।

ওঁ দেবদেব্যাপ্সোসডৃত শ্রীবৃক্ষ চন্ডিকাপ্রিয়ে।

আমন্ত্রয়ামি পূজার্থং শাখামেকং প্রযচ্ছমে।।""

শ্রীফল ও শ্রীবৃক্ষ বলতে বিল্বফল ও বিল্ববৃক্ষ 'জ্যোতিসূর্য্য'। বৈদিক যুগে বিল্বফলকে সূর্য্য রূপে চিন্তা করা হতো এবং সেক্ষেত্রে বিল্ববৃক্ষ সূর্য্যকল্পিত জ্যোতির্বৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ তাই অতীব পবিত্র বৃক্ষ। সেজন্য সকল দেবতা ও দেবী পূজার শেষে হোমকার্যে বিল্বপত্রকে ঘৃতাসিক্ত করে অগ্নিতে (সূর্যের অনুকল্প অগ্নিতে) আহুতি দেওয়ার বিধি আছে। পূজাবিধিতে বিল্ববৃক্ষকে বলা হয়েছে –

"" ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ

চন্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো।।""

বিল্ববৃক্ষ শঙ্কর শিবের প্রিয়। এজন্য শিব সোহাগী সকল শক্তি দেব দেবী পূজায় বিল্ববৃক্ষের, বিল্বকাষ্ঠের, বিল্বপত্রের বিল্বফলের এতো সমাদর। অবশ্য নবপত্রিকার কথাও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নবপত্রিকাও দেবী দুর্গার প্রতীক ও প্রতিনিধি। এই থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণ হয় যে দেবী দুর্গাই শুধু নন সকল দেব দেবীর পূজাতেই আরাধনাতে বৃক্ষ পূজাদি থেকে বিশেষ লাভ করেছে।

সুতরাং দেখা যায় যে বৃক্ষ পূজা ক্রমোন্নতির পথে ক্রমশ দেবী দুর্গার রূপ কল্পিতা ও দেবী অভিন্ন রূপে আরাধিতা। জড়কে চৈতন্য রূপে এবং প্রাণহীন অচেতনকে প্রাণবান চৈতন্য রূপে চিন্তা করা যেমন ভারতবাসীর স্বভাব সিদ্ধ আচার ও আচরণ, তেমনি বিশ্ববাসীরও ধ্যানচিন্তা। যদিও জড় ও অচেতনকে চেতন বা চৈতন্য তথা চৈতন্য সত্ত্বার উত্তীর্ণ হতে সময় লেগেছে এবং তা ক্রমোত্তরণের নীতি ও রীতি অনুসারেই সম্ভব হয়েছে।

"" ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে

শরণ্যে ত্রম্যকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।""

শ্রী শ্রী চন্ডীতে মাতৃকাতত্ত্ব

ড: অপরাজিতা শাস্ত্রী

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ওতোপ্রোতভাবে সমাচ্ছন্ন মহাশক্তির বিচিত্র রূপ ও বিকাশকে নিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মহিমাময়ী সত্ত্বা, মূর্তি ও স্থিতি। বিশ্বপ্রসবিনী ও বিশ্ববিনাশিনী রূপে মহা প্রকৃতির শ্রী শ্রী দুর্গা অষ্টাদশ হস্তে মহিষাসুরকে নিধন করে যেমন হয়েছিলেন মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনী তেমনি "চন্ডী বা চন্ডিকা দেবী মাহাত্ম্য" গ্রন্থের সর্বোচ্চ দেবী মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবীর সমন্বয়ে। শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেখতে পাওয়া যায় যে অতি প্রাচীনকালে দ্বিতীয় মনুর রাজত্বকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির উপদেশে সর্বপ্রথম মৃন্ময়ী মূর্তিতে শ্রী শ্রী দুর্গা মাতার পূজা করেছিলেন। "শ্রী শ্রী চন্ডী" মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত আঠারো খানা মহাপুরাণের অন্যতম "মার্কেন্ডয় পুরাণ" এর অন্তর্গত। এই পুরাণে ৮১ তম-৯৩তম অধ্যায় এই ১৩টি অধ্যায়েরই নাম হলো "" শ্রী শ্রী চন্ডী"" এর অপর নাম "দেবী মাহাত্ম্য" ও "সগুসতী স্তোত্র"।

সমগ্র চন্ডীতে মোট ১৩টি অধ্যায় ৫৭৮টি শ্লোক এবং ৭০০টি মন্ত্র আছে। এই রূপে ৭০০ মন্ত্র আছে বলে 'সগুসতী' বলা হয়। এবং এতেই দেবী দুর্গা বা মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে বলে একে দেবী মাহাত্ম্যও বলা হয়ে থাকে। শ্রী শ্রী চন্ডীর ১৩টি অধ্যায়ে তিনটি চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে ---

প্রথম চরিত্র:- মধুকৈটভ বধ - ১ম অধ্যায়

মধ্যম চরিত্র:- মহিষাসুর বধ ২য়-৪র্থ- মোট ৩টি অধ্যায়

উত্তর চরিত্র:- শুভ নিশুভ বধ ৫ম থেকে ১৩ দশ অধ্যায় মোট ৯টি অধ্যায়

শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবীর সুন্দর ৪টি স্তব আছে।

প্রথম স্তব:- প্রথম অধ্যায় ভগবান বিষ্ণুকে জাগ্রত করার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার ভগবতী যোগমায়া দেবী স্তব(১/৬৫-৮২)

দ্বিতীয় স্তব:- চতুর্থ অধ্যায় মহিষাসুর নিহত হলে দেবগণ কর্তৃক মা দুর্গার স্তব (৪/৩-২৮)

তৃতীয় স্তব:- পঞ্চম অধ্যায় শুভ নিশুভকে বধ করার জন্য দেবগণ কর্তৃক দেবী বিষ্ণু মহামায়ার স্তব (৫/৮-৮২)

চতুর্থ স্তব:- একাদশ অধ্যায়ে শুভ নিশুভ বধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সানন্দে জগজ্জননী দেবী কাত্যায়নীর স্তব (১১/৩-৩৫)

শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবী কবচে একাদশ মাতৃকা গণের নাম উল্লেখ আছে। মাতৃকা শব্দটি সংস্কৃত 'মাতৃ বা মাতরঃ' থেকে এসেছে। সংখ্যায় সাত হওয়ার

দরুণ এদের সপ্তমাতৃকা নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রী শ্রী চন্ডীর দেবী কবচে নবদুর্গার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

শ্রী শ্রী চন্ডীতে মহাশক্তিময়ী একাদশ মাতৃকাগণ হলেন- "চামুন্ডা", "বারাহী", "ঐন্দ্রী", "বৈষ্ণবী", "নারসিংহী", "শিবদূতী", "মাহেশ্বরী", "কৌমারী", লক্ষ্মী, "ঈশ্বরী", "ব্রাহ্মী"। হিন্দু ধর্মের শাক্ত শাখা তান্ত্রিক ধর্মে মাতৃকাগণের গুরুত্ব সর্বোচ্চ। শাক্ত ধর্মে তারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধকালে মহাশক্তির মহাকালী রূপে বর্ণিত হন। যুদ্ধ দেবতা স্কন্দের পূজার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত "" বৃহৎ সংহতায়"" বরাহমিহির লিখেছেন -দেবতার নামানুসারে এবং তাদের গুণ অনুযায়ী মাতৃকাগণের সৃষ্টি। তারা এই সকল পুরুষ দেবতার স্ত্রী অথবা শক্তি হিসাবে পরিচিত। তাই বলা হয়--- "" প্রেত সংস্থা তু চামুন্ডা বারাহী মহিষাসনা ঐন্দ্রী গজ সমারুঢ়া বৈষ্ণবী গড়ুরাসনা। নারসিংহী মহাবীরা শিবদূতী মহাবলা মাহেশ্বরী বৃষারুঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা। লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্ত হরিপ্রিয়া। শ্বেতপয়োধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা। ব্রাহ্মী হংসাসমরুঢ়া সর্বাভরণভূষিতা।।"" শবাসনা, চামুন্ডা, মহিষারুঢ়া, বারাহী গজাসনা, ঐন্দ্রী, গরুড়াসনা, বৈষ্ণবী, মহাবীরা, নারসিংহী, মহাবলা, শিবদূতী, বৃষারুঢ়া, মাহেশ্বরী, শিখিবাহনা, কৌমারী, বিষ্ণুপ্রিয়া, পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা। লক্ষ্মীদেবী বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা ঈশ্বরী, হংসারুঢ়া সর্বাঙ্গকার ভূষিতা ব্রাহ্মী সকলে একাদশ মাতৃকা নানা অলংকারে শোভিতা।

ঋকবেদে সপ্তমাতৃকা ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রানী, বারাহী, নারসিংহী, চামুন্ডা দেখা যায়। বৈদিক সপ্তমাতৃকা পুরাণের যুগে সাত থেকে বর্ধিত বা কল্পিত হয়ে একাদশ মাতৃকায় রূপ পরিগ্রহ করেছেন। দেবী দুর্গা বা মহিষমর্দিনী দুর্গা বৈদিক বা পৌরাণিক মাতৃকাগণেরই রূপান্তর। শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবী কবচে নবদুর্গার উল্লেখ আছে। সেই নবদুর্গার নাম শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুন্ডাভা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী শ্রী শ্রী চন্ডীতে আছে।

"" প্রথমং শৈলপুত্রী দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ং চন্দ্রঘন্টোতি কুন্ডাভাতি চতুর্থকম্।। পঞ্চমং স্কন্দমাতোতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং কালরাত্রিতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।"" প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের পার্বতী, দক্ষসূতা, দাক্ষায়ণী, সতী, উমা, হৈমবতী, ঋষি কাত্যায়ন কর্তৃক কন্যারূপে পালিতা ও পূজিতা হন। দেবী কাত্যায়নী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা এই দেবীগণ নামে রূপে কর্মে ভিন্ন হলেও দেবী সত্ত্বা ও অপার্থিব মাধুর্যে এক ও অভিন্ন। কারণে ও কোমলতায়, কাঠিন্যে ও গাষ্ঠীর্থে এর প্রকাশ মহিমাময় ও লীলাময়তার সার্থক। হিমালয়ের পার্বতী ও উমা হৈমবতী এ প্রসঙ্গে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেছেন - এদের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। নবদুর্গার দুটি নাম কালরাত্রি এ

হালিসহর আনন্দম

মহাগৌরীর মধ্যে কালরাত্রি নামটি উমা হৈমবতী মহাশক্তির পরিচায়ক। কারণ কালরাত্রি রূপে উমা হৈমবতী দুর্গা বিশ্ব সৃষ্টির কারণ এবং ভিন্ন সত্ত্বায় ও রূপে তিনি কালী ও মহাকালী। "মৎস্যপুরাণে" হিমালয়ের পার্বতীকে কালী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে পঞ্চদ্বিধিকশত মোহধ্যায়ে গৌরীত্ব লাভের জন্য কালীকা পার্বতীর তপোচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"কৃষ্ণেত্যুক্তা হরেনাহং নিন্দিতাচাপ্যনিন্দিতা।

মাহং তপঃ করিষ্যামি যেন্ গৌরীত্বমাশ্লাম্"

কালিকা পুরাণেও পার্বতীর কালীকা গৌরী লাভের কাহিনী বর্ণিত আছে। শিবের জ্যোতির্ময় শাস্ত্র রূপের ধ্যান করতে থাকলে যোগীশ্বর শিব পার্বতীর ধ্যানে পার্বতীকে দেখা দেন। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন - আত্মতত্ত্ব বোঝাবার জন্য শিব প্রথমে পার্বতীকে কালিকাতত্ত্ব রূপ দেখান পরে পরা প্রকৃতির রূপ দেখালেন। পার্বতী তখন বুঝলেন যে স্বরূপে পার্বতী, কালী, গৌরী আবার তিনিই বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী। যেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। শিব শক্তি সম্পর্কে তাই "Iconography of Parvati" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় R.D.Trivedi হিমালয়ের পার্বতী তত্ত্বকে আরো একটু নতুন ভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি 1 Parvati and her early life 2 Parvati in panchatapas 3.Parvati as Shiva's consort. এই তিনটি রূপে বুঝিয়েছেন বেদের সপ্তমাত্মকার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেন। উমা ও পার্বতী একই শক্তি। এক ও অভিন্ন। মহাকবি কালিদাস তাঁর "কুমার সম্বৎ" কাব্যে শিব ও পার্বতীর দাম্পত্যে বিশ্বভীর্ণ রূপ ও কাহিনী অপরূপ বর্ণনা করেছেন। সমগ্র ভারতে দেবী পার্বতীর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি শিবানী, মহা গৌরী, দুর্গা, বা মহিষমর্দনী।

কুমাণ যুগে প্রথম পাদে প্রস্তরে নির্মিত দেবী মূর্তির প্রতীক পাওয়া যায় যা থেকে শ্রদ্ধেয় আনন্দ কুমার স্বামী অনুমান করেছেন- যে পৃথিবী ও শস্য প্রভৃতির উর্বরা শক্তির প্রতীক রূপে স্তম্ভে প্রকৃতির পূজার প্রচলন ছিলো এবং তাঁর প্রতক্ষ্য নির্দশন মথুরায় স্তম্ভ শিল্পে উত্কীর্ণ হয়েছে। এভাবেই গুপ্ত শিল্পে শ্রী লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, অভিষেক লক্ষ্মী প্রভৃতির কল্যাণী মূর্তি প্রতক্ষ্য সংগ্রহশালায় দেখা যায়। তক্ষশীলা, মথুরা, কৌশানী, রাজঘাট পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থানে কুমাণ যুগের দেবীমূর্তি রক্ষিত আছে।

চণ্ডীপাঠ কেন করা উচিত

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কর্মকর্তারা বলেছেন এই চণ্ডীপাঠ কেন করবো এটা করলে কি উপকার। এইসব প্রশ্নের উত্তরে একে দুভাগে ভাগ করা হয় ১- জাগতিক ২- পরমার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত চাওয়া পাওয়া এই দুটি জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ। পরস্পরবিরোধী এই দুই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে পাওয়া যায় কিনা।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভগবান লাভের কথা চিন্তা করিনা, করার অবকাশ ও পাইনা। যে কোনো একদিনের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রাতঃকাল থেকে রাতি পর্যন্ত শরীরের চাহিদা পূরণের চেষ্টা, আত্মীয় স্বজনের সুখ শান্তির বিধানের চেষ্টা, আর্থিক উন্নতি, মান যশ প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় দিন কেটে যায় এর মধ্যে মুক্তি লাভের চিন্তা বা কর্মসাধন করার অবকাশ নেই। কিন্তু জীবন সংগ্রামের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে সবসময় সব উদ্দেশ্য খুব সহজে সাধিত হয়না অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় যার থেকে মুক্তি না পেলে জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে যায় আত্মীয় পরিজন টাকা পয়সা থাকলেও নিঃসঙ্গ বোধ একাকীত্ব ঘিরে ধরে। মন দুর্বল হয়ে যায়। পরিবার পরিজন এর কথা চিন্তা করে বিনীত রজনী যাপন করে স্বর্গসুখ পাওয়া অভিজ্ঞা জাগে প্রাপ্য সম্মানটুকু ফিরে পেতে চায়। মানুষ এই চক্রব্যুহ থেকে বেড়োতে চায়। তাই সেই অমৃত রস সন্ধান দিয়েছিলেন রাজা সুরথ মেধস মুনীকে প্রশ্ন করেছিলেন

- ১- সেই মহামায়া কে?
- ২- কি প্রকারে তিনি উৎপন্ন?
- ৩- তাঁর কার্য কি?
- ৪- তাঁর স্বভাব ও স্বরূপ কি?

পুরাকালে মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলে মর্ত্যে আত্মগোপন করে। এই অবস্থা থেকে পরিব্রাজক এর জন্য ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পরামর্শে বিষ্ণুর নিকট সমস্ত দুর্দশার কথা জানালে বিষ্ণুর বদন থেকে ও ব্রহ্মা মহেশ্বরের মুখ থেকে এক অতীব উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত ও তেজপুঞ্জ মিলিত হয়ে এক অপরূপ নারী মূর্তি ধারণ করে। এবং সমস্ত দেবতা অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রমুখ দেবতারা আবির্ভূত দশভূজকে নিজ নিজ অস্ত্র নিবেদন করে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য প্রার্থনা করেন। ইনি দেবী দুর্গা নামে খ্যাত। তাই চণ্ডী পাঠের দ্বারা মানুষ নিজের মনের ভেতরে শক্তি অনুভব করে। মানুষের দৈনন্দিন সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা কষ্ট দূর করে এই মহামায়ার জপ স্তব স্ততির মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের মনে ও জীবনে শান্তি লাভ করবে। তাই এই অভয়বাণী দেবীর চির শাস্ত্র –

"" ইথং যদা যদাবাধা দানবোথ্যাবিষ্যাতি
তদা তদাস্বতীর্থাংকরিয়াম্য - রিসংরক্ষয়ম্"" ।

হালিসহর আনন্দম

আমার পূজো
নীলাচল চট্টরাজ

গ্রামের পূজো
উৎপলকুমার ধারা

শারদীয়ার দীপ্তি শিখা, সজল মেঘে –
ভিজিয়ে দেয়, আপন সুরে বাদল বাতাস,
মেঘমল্লার সন্ধ্যতারার - আকুল নয়ন
ঢাকের তালে, হুন্দ তোলে, প্রিয়ার আকাশ।
আশ্বিন মাসের কাশের দোলায়, মেঘছায়া,
পূজোর গানে - দৃষ্টি প্রদীপ তন্দ্রাহারা –
জাগাও প্লাবন, শ্যামল ছন্দে স্বপ্নমোহে,
অঞ্জলির নিশীথ রাতের উতল ধারা।
মা দুর্গার লুপ্ততারা চোখের জলে,
পরশহারা অশ্রুসিক্ত, বাদল ছাওয়া –
সবুজ ধানের আদর মাখা স্বপ্ন প্রেমে –
আশীর্বাদের ছোঁয়ায় পাগল - স্তব্ধ হওয়া।
অভিসার সেই - বেদনামুখর বিহ্বল রাতে,
আবাহনের নূপুরধ্বনি নদীর ধারে -
মিলনগীতি বিরামবিহীন, তোমার মনে,
প্রতিমারই স্রোত বয়ে যায়, হৃদয় পারে।
দশমীতে গন্ধ পাগল মত্ত হওয়া –
বাতায়ন আজ উঠল কেঁদে আকাশজুড়ে,
বিসর্জনের - অপরাজিতার উদাস হৃদয়,
আসছে বছর আসবে মা গো, বিজয় সুরে।

ছোটো হতে হতে নদী একেবারে সরু
বড়ো মাঠটিও আজ ছোটো একেবারে
মাঠে আর চরেনাতো একটিও গরু
দখল নদী ও মাঠ করে থোমোটারে!
নদীটির ঘাট আজ ভেঙে খান খান
হয়না সে-ঘাটে আর ভাটিয়ালি গান
তবু পূজো এলে নদী ফিরে পায় প্রাণ
ভাঙাঘাটে হয় আজো কলাবউ স্নান !
নেই শালুকের ঝিল, সাঁতারের ঘাট
শিউলির গাছগুলি পড়ে গেছে কাটা
খুঁজেও পাইনা আর কাশফোটা মাঠ
শহরে পা-বাড়াচ্ছে সবুজের গাঁ-টা !
আগমনী শুনে তবু ঢাকিটার ছেলে
কাঁসিটিকে ঘোসেমেজে চকচকে করে
বেড়ার ঘরেতে পোটো কুপি জ্বেলে জ্বেলে
মাটিমেখে দুর্গার মূর্তিটা গড়ে !
সেই গ্রামটিতে ঠিক আশ্বিন মাসে
পঞ্জিকা বলে যেই পূজোর তারিখ
ঠিক সেই গ্রামে মা-দশভূজা আসে
সবাই পূজোর খুশি লুটে নেয় ঠিক !!

পরম শান্তি

আনন্দধারা শারদসংখ্যা ২০২৬

আতাউর রহমান

আমার কোন শোক নেই, নেই কোন সহানুভূতি,
নরম হৃদয় পাথর করেছে, পাথরে প্রাণের সঞ্চর দেখিনি।
শুধু শুধু অনাবশ্যক অন্যের জন্য কেন কাঁদবো,
যেখানে আমার নেই কোন সুচাগ্র স্বার্থ!
আমিতো অঙ্গীকার করেছি কাউকে রাখবনা সুস্থ,
কয়েকটা প্রজন্ম করবো ধ্বংস!
এক একটা সম্প্রদায়কে অঙ্কুরে বিনাশ করব,
তারপর থামবো অশ্বমেধের যজ্ঞ!
যে যেভাবে পারে যত খুশি কাঁদুক ক্ষতি কি তবে,
আমিতো আছি মহাসুখে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে।
এখনতো আগুন লাগেনি পেটে
রাশি রাশি সম্পদ গচ্ছিত আছে গোপন ঘরে!
শত অন্যায় সহিবো, রইবো মুখ বুঝে,
আমি ঠিক জিতে যাবো তোমাকে ল্যাং মেরে!
আমার দিকে যদি কোন ভীত আসে ধেয়ে,
বেলাগাম নিন্দার বাণী ছড়াও যদি চারিদিকে,
অভিমুখ ঘুরিয়ে দেবো অন্যের ঘাড়ে,
বুঝবে সেদিন প্রতিবাদের ফল কাকে বলে?
অন্যের দুঃখ দেখে আমার কোন কষ্ট নেই,
আমিতো গুছিয়ে নিয়েছি সবই পচা পাক মুখ গুঁজে!
কতইবা করবে নিন্দে দান অনুদান গিলে,
অভুক্ত পেট ঘুমিয়ে যাবে ক্ষুধার তাড়নাতো!
তারপরেও যদি ফোঁস করার তেজ থাকে
জেনো চারিদিকের পোষা পেটুয়া জোরসে কড়কে দেবে
কারাগারে সর্বের ফুল দেখবে চোখে!
পারবেনা আটকাতে, নির্মম নিষ্ঠুর হতে জানি,
আমি কিন্তু এগিয়ে যাবো তোমাদের কঙ্কাল মাড়িয়ে!
এ মাটিতে আর অঙ্কুরিত হবে না বিপ্লবের চারা,
প্রতিহিংসার আঁচে পুড়িয়ে দিয়েছি সাতপুরুষ মাটি,
ধ্বংসভূপেই খুঁজবে পরম শান্তি!

রক্তক্ষরণ

রাবেয়া রহমান

যতবার ভাবি শুধরে নেবো নিজেকে,
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত নরম মননে পলি জমা মাটি।
সংকল্পের দৃঢ় আন্তরণ শক্ত করেছে যেই,
ঠিক তখনই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে
ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফিরে ফিরে আসে সম্পর্ক!
হৃদয় আসনে বসিয়েছি, ভালোবাসি তাই,
রক্তক্ষরণে হৃদয় আঙিনায়, খেলা করে কত শত স্মৃতি!
যতবারই ভাবি ভালবাসবো না আর কাউকে,
আলোমাখা পৃথিবীর অনুভূতি শিরা উপশিরা বেয়ে
"ভালবাসি ভালবাসি" আলিঙ্গনে মত্ত হয় মায়া!
যতবারই ভাবি এবার কঠোর থেকে কঠোরতর হবো,
সুযোগ দেবোনা আর কাউকে অনুভূতি নিয়ে খেলবার!
শুধু প্রয়োজনে প্রিয় হয়ে,
আলগা ভালোবাসার ছোঁয়ায় সম্পর্ককে ধরে রাখতে চাই না।
যতবার ভাবি মুখোশের আড়ালে কে এলো, কে গেলো পরোয়া না করে,
স্বার্থপরের মত সম্পর্ক হারানোর অভ্যাসে মত্ত রাখবো নিজেকে!
ভালোবাসাকে দূরে ঠেলে, যোগাযোগ মুছে দিয়ে,
কঠিন আবরণে মুড়ে পাথর করে দেবো নিজেকে!
কিন্তু অভিমানে কি ভালোবাসাকে ভুলে থাকা যায়!? যায় না।
যে সম্পর্কে স্তম্ভাকৃতি অভিমানে অনুভূতি
জমতে জমতে পাথর হয়ে যায়, আঘাতে আঘাতে হার মানে হৃদয়।
আর যাইহোক ভালোবাসা থাকেনা সেই সম্পর্কে।
তবু, অনেকেই বদলাতে চেয়েও বদলাতে পারে না নিজেকে।
শোধরাতে চেয়েও জীবন থেকে ভালোবাসাকে
বিসর্জন দিতে পারে না প্রেম। পারে না! পারিনা!
সহজাত প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় কি! যায় না।
শক্ত পাথরে সম্পর্কের জলোচ্ছ্বাস,
নরম মননে রক্তক্ষরণ হয় প্রতিনিয়ত।....

কে বলে শ্রেষ্ঠ !

প্রবীর কুমার বিশ্বাস

শিয়াল শকুন ব্যাঘ্র হরিণ, কিংবা বনের ভালুক
সবাই বোঝে অনায়াসেই, নিজের নিজের তালুক।
কেউতো কারোই জাত ভাইকে করেনা আক্রমণ
মানব জাতির মধ্যে এই রোগ বড়ই সংক্রমণ।
হত্যালীলায় মানুষই প্রথম, বিশ্বসেরা জীব
নিমেষ তরে জীবন্ত প্রাণ, করে ফেলে নিজীব।
দ্বিতীয় যখন বিশ্ব যুদ্ধ, পঁচাত্তর মিলিয়ন হত্যা
বিশ্বের কাছে সেদিন ছিল, এ এক নির্মম বার্তা।
বিজ্ঞানী বানায় মারণাস্ত্র, শুধুই মানুষের জন্য
যার ভাঙারে আছে যতো বেশী, সে দেশ হয়েছে ধন্য।
চড়ুই শালিক ঈগল ফড়িং, যতেক প্রাণীকূল
মানুষের কি এদের দেখেও হয় না চক্ষুশূল?
হাঙ্গর কুমীর গরু ছাগল অথবা সিংহ তেজী
কাঠবিড়ালী হুঁদুর ছুঁচো, বনবিড়াল বা বেজী
এরাতো কেউ নিজের জাতে করেনা হানাহানি
মানুষ কিন্তু এদেরও মারে, আমরা সবাই জানি।
তবে কি মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়েছে, পশুর থেকেও হীন?
শ্রেষ্ঠজীবের তকমা পেয়েও ওদের কাছে ঋণ।
মনুষ্যকূল হার মেনেছে জীব জগতের কাছে
ওদের বন্দি করে খেলা দেখাই তার লক্ষ প্রমাণ আছে।

অন্তর্জাগরণে

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ থেকে অনন্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়
আমি খুঁজে পাই আমার করতলে
অসীমের বিলম্বিত ছায়া।
হৃদয়ে টুঁ মেরে দেখি,
প্রত্যয়ে বাস করছে বোধিলিপি।
আকাশ এবং অনন্ত ঘিরে তাই
নিপাতনে সিদ্ধ অসংখ্য সন্ধি।
বাধ্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার কাছে,
সেখান থেকেই শুরু হবে আমার যাত্রা।
আমি একদিন অনাহতে অন্তর্জাগ করতে করতে
নিশ্চয়ই পৌঁছাব তোমার পরমে।

হে মোর জীবন দেবতা

সুশান্ত ঘোষ

হে মোর জীবন দেবতা এত যে ডাকি তোমায়, তবু নাহি পাই দেখা।
জীবন যুদ্ধে চলার পথে আমি ক্লান্ত বিষন্ন আমি যে বড্ড একা।।
মন্দির মসজিদ গির্জায় এতো যে খুঁজি তোমায়।
হে মোর ইষ্ট দেবতা তুমি আছো কোথায়।
তোমার অদৃশ্য শক্তি চলার পথে অনুভব করি, তবু পথে বহু বাধাবিঘ্ন।
" বিশ্বাসে মিলায় বস্তু" এই প্রবাদ বাক্য
মনে রেখেই, জানি আমার ওপর তোমার নজর তীক্ষ্ণ।।
তোমার চিত্রগুপ্তের খাতায় হয়তো অনেক অপরাধ হয়েছে জমা।
হে প্রভু চলার পথে যদি কভু করি ভুল, করিয়ো ক্ষমা।।
আজি এ জীবন সায়াহ্নে অপরাহ্ন বেলায় দেখা দাও একটি বার।
তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হোক জীবন আমার।।

আনন্দধারা

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

এই যে বৃষ্টি এই যে রোদ সব আনন্দধারা
সবখানেতেই হোক না গড়া তোমার-আমার পাড়া ।
শিশুর হাসি ফুলের ফোটা তোমার মধ্যে আমার জোটা
এই খুশিতে এই আনন্দে জীবন গড়ে তোলা
মিশতে পারলে তুমি-আমি দুঃখকে যায় ভোলা ।
আমার মধ্যে তোমার থাকা তোমার ছবি আমার আঁকা
যারা থাকে এই ভাবনায় জয় করে সব সুখ
তাদের মনের পৃথিবীতে তারাই তো হয় মুখ ।
তারাই থাকে আনন্দেতে সুখকে নিজের করে পেতে
ভালোবাসার বিতান তারা তৈরি করতে পারে
বিহানবেলায় ভালোবাসায় তারা কি আর হারে ।
কেউ না হেরে সবাই জিতে যাক
সবাই নিজের আনন্দকে পাক
তুমি-আমি-আমরা সবাই তেমন সমাজ গড়ে
চেষ্টায়ে বলি খুব আনন্দে আমরা আছি ভোরে
"লালটুকটুক সূর্য আলোয় সবাই ভালো সবার ভালোয়
আনন্দের এই ধারায় ধারায় হোক সে পরিচত
আলোয় আলোয় আমরা সবাই সবার সমাদৃত ।

সুরের মূর্ছনা
নির্মল করণ

আগমনীর সুরের ধারায় যেই ভাসে পথ-ঘাট
আমরা তখন বাঁধনছেঁড়া পার হই চৌকাঠ
রাত্রি জেগে দুগ্ধা ঠাকুর দেখছি ঘুরে ঘুরে
সেলফি তুলি, ভেসে বেড়াই খুশির সমুদুরে।
ফেরার পথে দেখছি এসে পাড়ার দুগ্ধা-থানে
সবাই মেতে 'যেমন খুশি' মজার অনুষ্ঠানে
গানের আসর বেশ জমেছে, তবলা বাজায় কেউ
নাচের সঙ্গে ঝিকমিকানো রঙিন আলোর ঢেউ।
কচি-কাঁচা বলছে ছড়া নেই মনে ভয়ডর
কেউবা বসে গীটার বাজায় সুরটা মনোহর
দারুণ মজা হৈ-ছল্লোড় মঞ্চস্থানি ঘিরে
একটা ছেলে মন কেড়ে নেয় হাজার লোকের ভিড়ে!
তার বাঁশিতে সুর ওঠে যেই, মঞ্চ ভেসে যায়
এক লহমায় মুগ্ধ সবাই সুরের মূর্ছনায়...
সেই ছেলেটার জামায় তালি, রুখোশুখো চুল
চিনলে না তো? পাশের পাড়ার ছোট্ট সফিকুল।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প
পার্থ ভট্টাচার্য

এই বছর, ২০২৬ মহান মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্বশত অর্থাৎ দেড়শোতম জন্মবার্ষিকী। শরৎচন্দ্র ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের পার্থিব মানবতাবাদী ধারার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর এক জন্মদিনের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের লেখনী ডুব দিয়েছে বাঙালি হৃদয়ের অতলে' অর্থাৎ অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি ঘরের, সমাজের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, প্রেম ভালবাসা, স্বার্থপরতা মহানুভবতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা আবার উদার, সংস্কারমুক্ত, মানবিক, প্রগতিশীল, বিপ্লবী চরিত্রসমূহ প্রাণ পেয়েছে শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে। শারদীয়া পত্রিকার সীমিত পরিসরে এই মহান উপন্যাসিকের রচনার সমস্ত দিক আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবুও সার্বশতজন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর প্রয়াস থেকে তাঁর কয়েকটি গল্পের অমূল্য সম্পদগুলো এবং আজকের সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনা হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ এবং খন্ডিত।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে গল্প বলতে জানতেন এবং তাই তাঁর রচনা মানুষের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করে, কাঁদায়, হাসায়। এই মত ভুল নয়, তবে কেবলমাত্র এখানেই শরৎসাহিত্যের প্রকৃত মূল্য নয়। যে কারণে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাতেই শরৎসাহিত্যের অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে, তার মূল কারণ, শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিংশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত পরাধীন, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কুপ্রথা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত সাধারণ বাঙালি সমাজের, বিশেষত গ্রামীণ জীবনের অকল্পনীয় দুঃখদুর্দশার কাহিনী এত বাস্তবানুগরূপে বর্ণনা করেছেন এবং সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করা উদার মানবতাবাদী চরিত্র, এমনকি ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠনকারী বিপ্লবী নেতার চরিত্র চিত্রিত করেছেন যে, তা পড়ার পর অবশ্যম্ভাবীরূপেই পাঠকের মন শুধু কাঁদে না, চিন্তা করে যে, এই দুর্দশার থেকে দেশকে, সমাজকে মুক্ত না করে উপায় নেই। এই

জন্যই শরৎসাহিত্য এবং শরৎচন্দ্র নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের জন ছিলেন। এই জনাই, শরৎচন্দ্র মূলত বাংলাদেশের (অবিভক্ত ব্রিটিশ যুগের) সমাজকাহিনী চিত্রিত করলেও তা অন্যান্য প্রদেশেরও সমাজ পরিবর্তনকামী মানুষদের কাছে সমান জনপ্রিয় এবং তাঁরা কাহিনীগুলো নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করান। কারণ, ব্রিটিশ শাসনে সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা এবং একই সঙ্গে মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কার, জাতি-পাত, ধর্মাত্মতার চেহারাটা সারা ভারতে প্রায় একই রকম ছিল।

শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক পরিচিত এবং জনপ্রিয় গল্প ‘মহেশ’। তখনকার যুগের মতোই আজকের সমাজ বাস্তবতার নিরিখেও গল্পটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ গোরু। এই গৃহপালিত প্রাণীটির অপরিসীম উপযোগিতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কোনো এক সময়ে গোরুর এই অপরিসীম উপকারিতার কথা ভেবেই হিন্দু ধর্মে তাকে ভগবতী আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও, মুখে একথা বললেও বাস্তবে হিন্দুরাও অন্যান্য ধর্মের লোকদের মতোই গোরুকে দৈনন্দিন জীবনে আর পাঁচটা গৃহপালিত পশুর থেকে কোনো বেশি যত্ন করে না, বরং সমস্ত কাজে তাকে যথাসম্ভব খাটায়, পেটায় (যার থেকে গোরুর মতো খাটনি, কলুর বলদ, চিনির বলদ প্রভৃতি কথাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে) এবং ‘ভগবতী’র বাচ্চাকে বেঁধে রেখে তারই মুখের খাদ্য দুধ কেড়ে নিয়ে খায় এবং ব্যবসা করে। পার্থক্য এটুকুই যে, হিন্দুধর্মমতে এগুলো পাপ না হলেও, গোরুকে হত্যা করা বা গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে গোমাংস ভক্ষণ বা গোহত্যা নিষিদ্ধ নয়। এই সুবিধের সুযোগ নিয়েই, হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষক এবং গোপালকরা গাভী বক্ষ্যা হলে বা দুধ দেওয়ার বয়স শেষ হয়ে গেলে এবং বলদ বৃদ্ধ হয়ে পরিশ্রম করার আর ক্ষমতা না থাকলে তাদের মুসলমান চর্মকারদের কাছে বা গোহাটায় বিক্রি করে দিত। তা না হলে সেই গোরুগুলোকে কৃষক বা গোপালকদের বসিয়ে খাওয়াতে হবে এবং ছেড়ে দিলে তারা খিদের জ্বালায় নানান জায়গায় উৎপাত করে বেড়াবে। স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা গ্রামীণ অর্থনীতির এই লাভজনক প্রথাটি বর্তমান সরকার অবশ্য কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মীয় অজুহাতে বন্ধ করে দিয়েছেন। ‘মহেশ’ গল্পের দরিদ্র চাষী গফুর ধর্মে মুসলমান, কিন্তু আদর করে নিজের একটি মাত্র বলদের নাম রেখেছে ‘মহেশ’। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী শিবঠাকুরের এক নাম মহেশ এবং তাঁর বাহন ঘোড়া। বোঝা যায়, শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন

যে, দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের প্রভাবই একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে কাজ করে যায়, তাদের অজ্ঞাতসারেই। এখন, 'মহেশ' বুড়ো হয়ে গেলেও গফুর তাকে বেচে ফেলতে পারে না কারণ, পুরো পাঁচটি সন সে তাদের 'প্রতিপালন করেছে'। অথচ, মহেশকে খাওয়ানোর খড়টুকুও সে ক্ষেত থেকে ঘরে আনতে পারে নি, জমিদার বকেয়া খাজনা বলে কেড়ে নিয়েছে। পুরোহিত তর্করত্ন না জেনেই গফুরকে ধমকাধমকি করেন যে, হিন্দুর গাঁ। গোহত্যা হলে জমিদার গফুরকে জ্যান্ত কবর দেবে। কিন্তু গফুর পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করলেও তাকে গোরুকে খাওয়ানোর জন্য এক পালি খড় ধার দেন না। পেটের জ্বালায় মহেশ বাগানে ঢুকে পড়লে আর এক হিন্দু বড়লোক, মানিক ঘোষেরা তাকে খোঁয়াড়ে দেয়। মেয়ের কাছে 'জ্বর হয়েছে' মিথ্যে বলে গফুর নিজের মুখের ভাত পর্যন্ত মহেশকে ধরে দেয়। কিন্তু এতেও সে বাঁচতে পারে না। জমিদারের বাগানে মহেশ ঢোকায় গফুরকে চাবুক খেতে হয়। ঘরে ফিরে দেখে ঘরে চাল নেই। খাবার জল চায়। এদিকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গ্রামে পানীয় জলের আকাল। একটিমাত্র পুকুর থেকে জল সংগ্রহ মুসলমানের মেয়ে আমিনার প্রায় অসাধ্য। তাই তার ঘরেও জল নেই। লাক্ষিত, অপমানিত গফুর রাগ করে প্রথমে মেয়েকে চড় মারে। এদিকে তেষ্ঠায় মহেশও কাতর। আমিনা অনেক কষ্টে একটু জল জোগাড় করে আনলে মহেশ তাকে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়ে জলটুকু শুষে খায়। গফুরের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে তারই আদরের মহেশের ওপর। সে রাগে উন্মত্ত হয়ে লাঙলের আঘাতে মহেশকে মেরে ফেলে এবং তারপর অনুতপ্ত হয়ে সব কিছু ফেলে রেখে নিঃস্ব হাতে মেয়ের হাত ধরে শহরে চলে যায় চটকলে কাজ করতে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় জমিদারের নির্মম শোষণ এবং পরিণামে কৃষকের গ্রামীণ সমাজ থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হওয়া, হিন্দু সমাজপতিদের 'গোমাতা' নিয়ে লোকদেখানো ভক্তির ভগ্নমি, 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমির গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত অবস্থা প্রভৃতি তখনকার কতগুলো জ্বলন্ত সমস্যার দিকে এই একটি মাত্র ছোটো গল্পের পরিসরেই শরৎচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গল্পের একেবারে শেষে গফুর যেখানে আল্লার কাছে শোষণ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেছে তার মতো মর্মস্পর্শী সংলাপ বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত আর লিখিত হয়নি।

‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, যে কোনো বিষয়েই ধর্মীয় আচার-বিচারকে হিন্দু সমাজে খুব বড়ো করে দেখানো হয়। যুগ যুগ ধরে

ধর্মগুরুদের নিরন্তর প্রচারের ফলে আচার-বিচারের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা আপামর মানুষ বিশ্বাসও করে। কিন্তু আচার-বিচারও বাস্তবে গরীব মানুষের জন্য নয়, জাতিভেদ প্রথায় দীর্ঘ হিন্দু সমাজের তথাকথিত নীচ শ্রেণীর জন্য তো নয়ই। সেখানেও পয়সা লাগে। ধনী মুখার্জী গৃহিণীর মৃত্যুর পর তাঁকে সুসজ্জিত করে সাড়ম্বরে চিতায় দাহ করা হয়। অসুস্থ হতদরিদ্র স্বামী পরিত্যক্তা দুলে মহিলা অভাগী আজন্মলালিত বিশ্বাসের ফলে দিবাস্বপ্ন দেখে যে, মুখার্জী গৃহিণী রথে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছেন। অভাগীর বিশ্বাস হয় যে, তারও মৃত্যু হলে সন্তান কাঙালী তাকে মুখান্নি করে চিতায় দাহ করবে এবং সেও ঐরকম স্বর্গে যাবে। এরপরেই কদিনের জ্বরে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হল। কিন্তু তার সন্তান কাঙালি মাকে দাহ করার জন্য কাঠ জোগাড় করতে পারল না। নিজের বাড়িরই উঠানে তার মায়ের হাতে পোঁতা গাছও কাটতে গিয়ে সে জমিদারের লেঠেলের হাতে নির্যাতিত হল এবং অবশেষে তাদের জাতের নিয়মানুসারে তার মার মৃতদেহ নদীর চড়ায় পুঁতে দেওয়া হল।

‘রামের সুমতি’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’ ‘মেজদিদি’ এই গল্পগুলোতে শরৎচন্দ্র বাঙালি পরিবারের অন্দরমহলকে অপূর্ব শৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পগুলোতে আমরা পাই নারায়ণী, সিদ্ধেশ্বরী, বিন্দুবাসিনীর মতো আটপোরে বাঙালি পরিবারের অন্দরমহলের অসামান্য মানবিক গুণে ভূষিত উদার হৃদয় নারীচরিত্রগুলোকে। এঁদের মাতৃত্বের অনুভূতি বা দায়িত্ববোধ শুধু নিজের গর্ভজাত সন্তানের জন্য নয়, যৌথ পরিবারের সকল সন্তানই তাদের সন্তান। ‘মেজদিদি’ গল্পে এমনকি সম্পূর্ণ অনাঙ্ঘীয় অসহায় গরীব ছেলে কেষ্টকে মাতৃস্নেহে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য হেমঙ্গিনী স্বামী সহ গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করেছে। পরিশেষে নিজের সংসার ছেড়ে কেষ্টকে নিয়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে তার স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরে কেষ্টকে পরিবারে স্থান দিতে রাজী হয়েছে। ‘বিন্দুর ছেলে’ গল্পেও নিঃসন্তান বিন্দুবাসিনী জায়ের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো পালন করে এবং তার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার বেদনায় অসুস্থ হয়ে প্রায় মরনাপন্ন হয়। ‘রামের সুমতি’ গল্পে নারায়ণী কিশোর বৈমাট্রেয় দেওর রামলালকে নিজের বড়ছেলের মতো ভালবাসতে গিয়ে নিজের মা, স্বামী সকলের গঞ্জনা সহ্য করেছে। ‘নিষ্কৃতি’ গল্পের সংসারের মূল উপার্জনশীল কর্তা সিদ্ধেশ্বরীর স্বামী বা বড়োভাই গিরীশ। কিন্তু সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী তাঁর অপদার্থ খুড়তুতো ভাই রমেশের স্ত্রী শৈলজা। বড়োগিন্নি সিদ্ধেশ্বরী সরল,

সাদাসিধে গৃহবধু। খুড়তুতো ছোটো জা শৈলজাকে সে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। স্বার্থপর মেজভাই ও মেজগিন্নির চক্রান্তে সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজার ভুলবোঝাবুঝি হলে রমেশ ও শৈলজা দেশের বাড়িতে গিয়ে আলাদা থাকে। মেজভাইয়ের চক্রান্তে গিরীশের প্রায় অজান্তেই রমেশের সঙ্গে তাদের মামলাও বেধে যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন গিরীশ দেশের বাড়ির সমস্ত বিষয়সম্পত্তি শৈলজার নামে লিখে দিয়ে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দেয়। এই নারীচরিত্রগুলোর একাধারে কোমল, দরদী, স্নেহস্ফরা মাতৃহৃদয় আবার তারই সঙ্গে নির্ভীক, ব্যক্তিত্বের চিত্রায়ণে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, বাঙালি পরিবারে চিরকাল যাদের ‘মেয়েছেলে’ বলে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, তাদেরই অতুলনীয় স্নেহ, মমতা, আত্মত্যাগ, কর্তব্য অকর্তব্য বিবেচনা বোধ ভারতীয় সমাজের অমূল্য সম্পদ। তখনকার যুগের এই গৃহিণীরা স্বাভাবিকভাবেই উপার্জনশীল নয়। কিন্তু তাই বলে পরিবারের সমস্ত বিষয়ে স্বামীর বা অন্যদের অন্যায় অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতিবাদ করে এবং পরিবারের মূল চালিকা হিসেবে নিজের অধিকারকে এবং ন্যায়বোধকে প্রতিষ্ঠা করে। আবার, নারী হলেই যে, দরদী, মমতাময়ী হবে তারও কোনো মানে নেই। ‘রামের সুমতি’র নারায়ণীর মা দিগম্বরী, ‘মেজদিদি’র কাদম্বিনী, ‘নিষ্কৃতি’র মেজবৌ নয়নতারা প্রভৃতিদের মতো স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, কুটিল, মিথ্যাচারী নারীচরিত্রেরও অভাব বঙ্গীয় সমাজে যে নেই, তাও শরৎচন্দ্র পাশাপাশিই দেখিয়েছেন।

গল্পগুলোর পুরুষ চরিত্রগুলোয় তাদের বিশেষত্বে উজ্জ্বল। ‘নিষ্কৃতি’ গল্পে বড়োভাই গিরীশ সম্পন্ন, আত্মভোলা মানুষ। কিন্তু নিজের সহোদর ভাইয়ের থেকে খুড়তুতো ছোটোভাই রমেশের এবং বিশেষত তার স্ত্রীর প্রতি বেশি স্নেহশীল এবং রমেশের স্ত্রী শৈলজাকে ভ্রাতৃবধু নয়, নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন। রমেশ অকর্মণ্য হলেও তিনি সে বিষয়ে উদাসীন। স্বার্থপর কূটবুদ্ধি উকিল মেজভাই হরিশ এবং তার স্ত্রীর চক্রান্তে রমেশের সঙ্গে গিরীশ হরিশের মামলা বেধে গেলেও গিরীশ রমেশকে আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত হরিশের বিরুদ্ধে গিয়েই একটি বাড়ি রমেশের স্ত্রী শৈলজার নামে লিখে দেন। গিরীশ চরিত্রের অতুলনীয় মহত্ত্ব সত্যিই পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। ‘বিন্দুর ছেলে’ গল্পে বাড়ির বড়ো কর্তা তাঁর স্ত্রীকে বলেন একটি অমূল্য অবিস্মরণীয় সামাজিক মূল্যবোধের কথা- ‘ক্ষমাই যদি না করতে পারবে তবে বড়ো হয়েছিলে কিসের জন্যে?’ এছাড়া ‘রামের

সুমতি'র অসৎ কবিরাজ নীলমণি, 'মহেশ' গল্পের তর্করত্ন একেবারে তখনকার গ্রামীণ বাঙালি সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

'মন্দির', 'আঁধারে আলো', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি আরও অনেক গল্প শরৎচন্দ্র লিখেছেন। স্থানাভাবে সেগুলো নিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তবে, শরৎচন্দ্রের মূল গুরুত্ব ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাঁর 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'পথের দাবী' প্রভৃতি সুবিখ্যাত উপন্যাসসমূহ নিয়ে বিদগ্ধ, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচকদের বিস্তারিত ও মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই শরৎরচনা এত হৃদয়স্পর্শী এই কারণে যে, প্রথমত, তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অধিকাংশই আমাদের পরিচিত সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ। নারী চরিত্রের মধ্যে ঘরোয়া আটপোরে গৃহস্থ মহিলারা যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখীর মতো বাঙ্গালী, গণিকারা যাদের সাধারণ মানুষ 'খারাপ মহিলা' বলে দেগে দেয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন মানুষের জীবিকাই তার সত্যিকারের পরিচয় নয়। তথাকথিত বারান্দাদের মধ্যেও থাকতে পারে মনুষ্যত্ব, দয়া, সন্তানস্নেহ, প্রেম, আত্মত্যাগ, দয়া, ধর্মধর্মবোধের মতো অসাধারণ গুণাবলী। কাজেই ওপর থেকে একনজরে দেখেই কোনো মানুষের চরিত্র সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত তাঁর সাহিত্যে তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, লোভ, লালসা সমাজের প্রগতির পথে কত বড়ো অন্তরায়। 'পথের দাবী' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার নেতা কর্মীদের মহান সংগ্রামের চিত্র সুনিপুণভাবে এঁকেছেন। সে সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা আছে। আজকের ভারতবর্ষে, স্বাধীনতার আশি বছর পরেও দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথা, জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ সমাজ থেকে আজও দূরীভূত হয়নি। গফুর, আমিনা, অভাগী, কাঙালিদের ওপর শোষণ অত্যাচারের স্টিমরোলার আজও সমানভাবে চলছে। শত সহস্র মূল্যবান জীবন বলিদান দেওয়া শহিদদের সুখী, সমৃদ্ধ ভারত গঠনের স্বপ্ন আজও পূরিত হয়নি। বিশ্বের ক্ষুধার্ত, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে আমাদের প্রিয় দেশ এই ভারতবর্ষ। এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজতে হলে সার্বশতবর্ষে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা সমাজে প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

মা

তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়

বর্ষা এলেই মনে পড়ে যায় টাপুর টুপুর গান
কবির কলম উজ্জীবিত হয় কবিতায় জাগে প্রাণ
জলহারা নদী, প্রাণহারা বিলে উচ্ছ্বাস আসে ফিরে
আষাঢ় শ্রাবণ থইথই জল আনন্দ নীড় নীরে!
মাঝি মাঝাদের গালভরা হাসি, উল্লাস গৃহকোণে,
উঠবে জালে রূপালী ফসল আসার আশায় চনমনে!
কান্ত কবি, জীবনানন্দ, মহাকবি কালিদাস,
কোথায় তাঁরা কি লিখছে বসে, কোথায় তাঁদের বাস?
কত দিন রাত পেরিয়ে গেল এল না তাঁদের লেখা
রসিক কবিরা বেরসিক হল ম্রিয়মান দীপশিখা!
গঙ্গা পদ্মা ইছামতীর বুকে ভাসে না পঙ্খী ভেলা
গান কবিতা উদাস, নিজীব, গতিহীন পথচলা।
বর্ষাকাল এলেই আমার মা' কে মনে পড়ে
বর্ষামুখর গভীর রাতে বজ্রপাত আর ঝড়ে,
মায়ের আঁচল, মায়ের বাহু কত যে শক্তিদর
অনুভবেই জাগে চেতনাশক্তি মহাকল্যাণকর!
মা-হারা এই পৃথিবীতে আমার হাহাকার সম্বল,
শ্রাবণ ধারায় হু হু করে প্রাণ চোখ করে ছলছল!
কোলে তুলে নাও জননী আমার, বিষণ্ণ এইপ্রাণ
মা ছাড়া পৃথিবী অর্থবহ নয়, বিপন্ন, বিবর্ণ, ম্লান!

প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়াতলে
রবীন্দ্র নাথ সরকার

আমরা বাস করছি, প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়া তলে।
প্রকৃতি দিয়েছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ---
যারা ভরিয়ে দিয়েছে, আমাদের পর্যাপ্ত আলোতে।
যাদের অভাবে আমরা হারিয়ে যেতাম গভীর অন্ধকারে।
তবুও আমরা দিনের আলোতে,
রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের বাতি জ্বলতে দেখি;
যখন কোন প্রয়োজন নেই তখনও অপ্রয়োজনে
বাড়িতে, সরকারি, বেসরকারি অফিসে বিদ্যুৎ নষ্ট করি।
আমরা বাস করছি, প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়া তলে।

প্রকৃতি দিয়েছে মহাসমুদ্র আর অসংখ্য নদী - নালা - খাল - বিল,
যারা ক্লান্তিহীন ভাবে আমাদের দিয়ে চলেছে জল অনবরত,
যা থেকে আমরা পাই জীবনে বেঁচে থাকার অমৃতধারা অবিরত।
যার জন্য জমিতে উৎপাদিত হয় শস্য,
আর আমরা পেয়ে যাই, আমাদের খাদ্য।
তবুও আমরা জলাশয় বন্ধ করে, তুলছি বহুতল।
চাষের জমি কেড়ে নিয়ে গড়ছি বিনোদন হল।
আমরা বাস করছি প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়া তলে।

হালিসহর আনন্দম

প্রকৃতি দিয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ বনানী আর বন,
যার বিশুদ্ধ বাতাস ভরে তোলে আমাদের প্রাণ।
যার উপর ভর করে বেঁচে থাকে অসংখ্য
পশু - পাখি - কীটপতঙ্গ, তৈরি হয় পর্যটন কেন্দ্র;
মনের দুঃখ আর শরীরের ক্লান্তিকে দূর করে
আমাদের দেয় পরম আনন্দ।
তবুও আমরা কখনো গোপনে কখনো বা প্রকাশ্যে সরাসরি
বেশি ভোগের আশায় ধ্বংস করছি এইসব বনভূমি।
আমরা বাস করছি প্রকৃতির ম্লিঙ্ঘ ছায়া তলে।

প্রকৃতি দিয়েছে অসংখ্য পাহাড়,
পর্বতমালা আর হিমালয়ের শৈলচূড়া;
যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ুকে করে নিয়ন্ত্রণ
আর সুচারু রাখে আমাদের জীবন।
তবুও সীমাহীন ভোগের নেশায়,
স্বার্থের অন্ধ আকাজ্জায়।
অবাধে ধ্বংস করছি পাহাড় - পর্বত।
আমরা বাস করছি প্রকৃতির ম্লিঙ্ঘ ছায়া তলে।

কথায় কথায় আমরা বলি ---
এইসব আমরা তো সবাই জানি,
কিন্তু যথাযথভাবে পালন করার দায়িত্ব
কজনই বা মানি?

বাবুদেরও কাম নাই

কাজল সুর

“আয়না চুড়ি মো-হিমানী

মনে মনে চাইছো জানি”

ও মেয়ে পারুম না।

তুমার চাহিদা আমি মিটাইবার পারুম না।

মুনোবল আছে মোর অর্থ বল নাই।

ট্যাহা কুথায় পাই।

কারখানার চিমনিতে আর ধুয়ার দ্যাখা নাই।

আমার লগে থাইকলে শুধু পাইনতা ভাত দিবার পারুম

তার অধিক নাই।

সুদিন আইনতে গ্যালে লড়াই জানা চাই।

লুকের বাড়ি কাম কইরব কি

বাবুদের ও কাম নাই।

সংখ্যা

রত্না মুখোপাধ্যায়

অবেলায় সংখ্যার সংবাদ শিরোনামে,

বেশিভাগ সংখ্যার ভীষণ রক্তাক্ত, উন্মাদ।

ওদের লাল নীল ধূসর রং কখনো আগুন, কখনো জল।

জল ভরা দুচোখে কুমির মাচা বাঁধে,

স্বাপদেরা হাতে তুলে নেয় মুঠো মুঠো খৈ।

পাজি খুলে মহেন্দ্র যোগ খোঁজে শিবা যজমান।

তবু সাত পাঁচ ভাবনায়, সময় হেঁটে চলে...,

গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কাজল

দীর্ঘতা দখলে নামে শ্মশান গোরস্থান।

বৃষ্টি ও একটা অমীমাংসিত গল্প

সুমন রহমান

তোমার সাথে কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজা হলো না
কোনো এক শ্রাবণের থমথমে বিকেলে
একটা ছাতার নিচে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটাও হয়নি আমাদের
হয়নি কাদা-মাথা পথ ধরে সমস্ত বারণ তুড়ি মেরে উড়িয়ে
কোথাও একটা হারিয়ে যাওয়া।
কতবার এই শহরের আকাশে বুক কাঁপিয়ে মেঘ ডেকেছে,
কতবার জানালার কাঁচ বেয়ে নেমে এসেছে বৃষ্টির জল ঠিক যেন কারো চেনা
কান্না।
তবুও শেষ পর্যন্ত তোমাকে আর মুখ ফুটে বলা হলো না
"কী ভাবছো অত? চলো, আজ বরং বৃষ্টিতেই ভিজি"
এখন যখন হুটহাট মেঘ ভেঙে তুমুল বৃষ্টি নামে,
আমার মনে হয়, প্রকৃতি আসলে আমাদের এই না-পাওয়ার গল্পটাই লিখছে।
এর প্রতিটি ফোঁটা যখন ফুটপাতে আছড়ে পড়ে, তখন মনে হয়
পৃথিবীর সব ইচ্ছেদের বেঁচে থাকতে নেই, কিছু ইচ্ছে জন্মায় শুধু অপূর্ণ থাকবে
বলে।
তোমার সাথে কখনো বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি
এই একটা খতের দাগ, এই একটা গভীর আক্ষেপ বুকে নিয়ে
আমি হয়তো একদিন নিয়ম মেনে বৃদ্ধ হয়ে যাবো,
স্মৃতির ফিকে হবে, চোখের দৃষ্টি বাপসা হবে
তবুও কোনো এক নিব্বুম বর্ষার দুপুরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হবে
হিসেব কষলে দেখা যাবে জীবনে পেয়েছি হয়তো অনেক কিছুই,
শুধু তোমার সাথে ওই একটা বার, একবারও বৃষ্টিতে ভেজা আর হলো না।

শরৎ কালে
চিন্ময়ী বিশ্বাস

এই শরতে আসবে বলে পথ চেয়ে তাই থাকা,
দূর্গামায়ের পূজোর সময় খুশির আবেগ মাখা।
অপেক্ষাতে দিন গুনছে কাশ শিউলি মেশে,
আকাশ জুড়ে পেঁজা-তুলার মেঘটা বেড়ায় ভেসে।
বছর শেষে আসবে তুমি সঙ্গে ছেলে-মেয়ে,
আমরা সবাই সেই খুশিতে উঠছি নেচে গেয়ে।
মাগো তোমার অপেক্ষাতে উঠেছে সেজে পাড়া,
ঢাক করতাল বাজছে দোদুল আগমনীর সাড়া।
নতুন জুতো সাজ-পোশাকে নগরবাসীর মনে
খুশির ছোঁয়া এখন তারা সাজছে জনে জনে।
সব বাঙালীর ঘরের মেয়ে দূর্গা রূপেই আসে,
আগমনী গানের সাথে আলোক মালায় ভাসে।
পুজো মানে নিখাদ আড্ডা পুজোয় খুশির ভীড়,
পুজো মানে বন্ধু, প্রেমিক ভরা সবার নীড়।

তপোবন

সুজান মিঠি

ভারত বর্ষের তপোবন জেগে উঠেছে।
জল ধারা সেতারে সুর তুলে ছুঁয়ে যাচ্ছে সুখ
হরিণ শাবক এসেছে তৃষ্ণা মেটাতে
রোদ্দুর এসে ঝুঁকে পড়ছে বন দেবীর মূর্তির পাদদেশে
বৃষ্টি মাঝেমধ্যে আল্পনা রেখে যাচ্ছে মাটিতে
রুমঝুম নূপুর পায়ে সখি এসে দাঁড়িয়েছে
সঞ্চয়িতার কাছে। লজ্জায় আনত মুখ তার।
সখি সঞ্চয়িতার দুই ক্রুর মাঝে ফুল বিন্দু ঐক্যে
দিয়ে বলল, এর নাম আনন্দ।
পল্লব এসে চিবুক ধরে সঞ্চয়িতাকে বলে গেছে
গান্ধর্ব হোক না হয়, তবু আমরা আমরাই
এখানে আকাশ নীল, হৃদয় ভোরের মত রাঙা
সঞ্চয়িতার চোঁট তিরতির করে উঠেছে
নদী তার সুর বাড়িয়ে জিঞ্জেস করেছে ভাষা নেবে...?
অরণ্যে দাবানল নেই, অসুখ নেই
শুধু শান্তি মন্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে এ দিক ও দিক
দেবালয়ে জাগ্রত দেবতা
ক্ষেতে কাজ শেষ করে এসে বিশ্রাম নেয়
বধূ এসে ভাত বেড়ে দেয় তাকে।
সঞ্চয়িতা আর পল্লব স্বপ্ন বাঁধে পাখির মত ডানা কাটে মেঘে
বাতাসও হেসে ওঠে তাদের উঠানে লুটিয়ে
তপোবন চিত্রটি শেষ হওয়ার আগেই ছেলোটি ঘুমিয়ে পড়ল।

রোহতাসগড় - এক অজানা ইতিহাসের গল্প

বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

কাল রাত থেকেই আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ছিল। কারণ, আমরা এমন একটি দুর্গ দেখতে যাচ্ছি, যার সম্বন্ধে অল্প অল্প জানি। কিন্তু সেই জানাটা এতটাই অল্প যে, মনে হচ্ছিল, বিহারের সাসারাম এসে যদি এই দুর্গটা না দেখি, তাহলে অনেক কিছুই অদেখা থেকে যাবে। সকালে যখন রওনা দিলাম, তখন সকাল ৯টা বেজে গেছে। মনটা উসখুস করছিল, এত দেরি হয়ে গেল! সাসারাম থেকে যেতে হবে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে, পাহাড়ি পথে। আকাশে কালো মেঘ মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে, আবার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দূরে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এখানে অস্বাভাবিক গরম। সেই গরমকে হার মানাতে পারে, এমন বড় বড় গাছপালাও রাস্তার ধারে খুব একটা নেই। বৃষ্টি না হলে রবি ফসল যে মার খাবে, সেটা স্থানীয় মানুষদের কথায় বারবার টের পাচ্ছিলাম। আর বৃষ্টি না হলে পর্যটনও মার খাবে। কারণ সাসারামে পর্যটকরা আসেন শুধু ঐতিহাসিক স্থাপত্য দেখতে নয়, এখানকার অসাধারণ সব জলপ্রপাতও বর্ষার সময় হয়ে ওঠে ভয়ংকর সুন্দর।

আকবরপুর থেকে রাস্তা বাঁ দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি ঢুকে পড়ল। কাঁচা মাটির রাস্তা। এখান থেকেই শুরু হলো পাহাড়ি পথ। রাস্তা বলতে এটাকে রাস্তা বলতেও একটু ভয় লাগে। কোথাও কাদা, কোথাও পাথর, কোথাও আবার এতটাই এবড়োখেবড়ো যে গাড়ির চাকা কাদায় পড়ে ফেসে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুর্গের ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রাচীর। এক একটা ভাঙ্গা গেট। আর পাবোই না কেন দুর্গটা তো কম বড় ছিল না। কিন্তু এই কঠিন পথের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক অন্যরকম সৌন্দর্য। ধীরে ধীরে আমরা ঢুকে পড়লাম কইমুর পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। চারপাশে শাল, সেগুন, মহুয়া-সহ নানা ধরনের গাছপালা, লতাগুল্ম আর বুনো সবুজে পাহাড় যেন নিজের শরীর ঢেকে রেখেছে। কোথাও ঘন জঙ্গলের অন্ধকার, কোথাও গাছের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ের ঢাল। বর্ষার মেঘে পাহাড়ের রং আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। বাতাসে মাটির গন্ধ, ভেজা পাতার গন্ধ আর জঙ্গলের এক অদ্ভুত সোঁদা আবেশ। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন ধীরে ধীরে সভ্যতার পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে প্রকৃতির আরও গভীরে চলে যাচ্ছি।

কইমুর পাহাড়ের এই নির্জনতা, ঘন সবুজ আর দুর্গম পথের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইতিহাসের এক বিস্ময়। আমাদের গন্তব্য রোহতাসগড় দুর্গ। কইমুর

পাহাড়ের মাথায়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই প্রাচীন দুর্গের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। রোহতাসগড়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও পর্যটন সূত্রে ৪২ বর্গকিলোমিটার। পথ যত কঠিন হচ্ছে, কৌতূহল ততই বাড়ছে। মনে হচ্ছে, এত কষ্ট করে এই পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে যখন, তখন সামনে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে এমন কিছু, যা শুধু চোখে দেখার নয়, মনে রাখার মতো। আজ রোহতাসগড় মূলত ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে বহু যুগের ইতিহাস। কোথাও প্রাচীন শিলালিপি, কোথাও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ, কোথাও মন্দির, কোথাও মসজিদ, আবার কোথাও বিশাল জলাধার—সব মিলিয়ে রোহতাসগড় যেন একটি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ইতিহাসের জাদুঘর। এখানে এসে বোঝা যায়, ইতিহাস কখনও শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না। কখনও ইতিহাসকে ছুঁতে হয় পাথরের দেয়ালে, হাঁটতে হয় পুরনো সিঁড়ির ওপর দিয়ে, আর শুনতে হয় পাহাড়ের বাতাসে মিশে থাকা কয়েকশো বছরের নীরব গল্প। রোহতাসগড় তাই শুধু একটি দুর্গ নয়—এটি অন্তত তেরো-চৌদ্দ শতকের নথিভুক্ত ইতিহাসের সাক্ষী, যার শিকড় আরও পুরনো লোকঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত।

আমাদের গাড়ি এসে থামলো একদম দুর্গের কাছে। বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আমাদের এবার প্রথম গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে দুর্গ দেখতে।

পুরনো বর্ণনায় দুর্গটির সঙ্গে সৌরবংশীয় রাজা হরিশচন্দ্র ও তাঁর পুত্র রোহিতাশ্বের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। বিহার সরকারের পর্যটন বিভাগের তথ্যেও এই ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে। তবে হরিশচন্দ্রের সময়ে বর্তমান দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল, এমন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। আমার ধারণা হরিশচন্দ্রের পুত্র যদি করে থাকেন তাহলে এতদিন টিকে থাকতে পারত না। প্রথম নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রোহতাসগড়ের ইতিহাসে প্রথম শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ৭ম শতকে। দুর্গের এলাকায় পাওয়া একটি শিলালিপিতে মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, এই শশাঙ্কদেবই বাংলার গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ অন্তত সপ্তম শতকে এই পাহাড় ও দুর্গাঞ্চল রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার কেউ বলেন, রাজা প্রতাপধবল এটি তৈরি করেছিলেন এবং উৎসর্গ করেছিলেন রোহিতাশ্বেরকে।

রোহিতাশ্বের কিংবদন্তির বহু পরে, শশাঙ্কদেবের কথা থাকলেও দ্বাদশ শতকে রোহতাসগড় ও আশপাশের পাহাড়ি অঞ্চল খয়ারালা শাসকদের হাতে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসে। মহানায়ক প্রতাপধবল

এই বংশের সবচেয়ে পরিচিত শাসক। তাঁর শিলালিপি রোহতাসের ইতিহাসকে কিংবদন্তির জগৎ থেকে বের করে আমাদের সামনে একটি প্রমাণিত মধ্যযুগীয় ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়।

দ্বাদশ শতকে রোহতাসগড় ছিল খয়ারবালা (Khayaravala) রাজবংশের অধীনে। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে রোহতাসগড়ের সঙ্গে শ্রী প্রতাপ-এর নাম পাওয়া যায়। এর আগে প্রতাপধবল নামের খয়ারবালা শাসকেরও রোহতাস অঞ্চলে ক্ষমতা ছিল। কে এই প্রতাপধবল?

খয়ারবালা বা খয়ারওয়ালরা মধ্যযুগে বর্তমান দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রভাবশালী একটি রাজবংশ ছিল। তাদের ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল রোহতাস অঞ্চল। রোহতাসগড়ের সঙ্গে এই রাজবংশের সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় শিলালিপি থেকে। প্রায় ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের রোহতাসগড় শিলালিপিতে খয়ারবালা বংশের শাসক প্রতাপধবল এবং তাঁর উত্তরসূরি শ্রী প্রতাপ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে রোহতাস অঞ্চল খয়ারবালা শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রতাপধবল ছিলেন এই বংশের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। তাঁর সময়ে রোহতাস ও আশপাশের পাহাড়ি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে খয়ারবালাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাঁরা শুধু দুর্গ বা পাহাড়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, আশপাশের সমতল অঞ্চলেও তাঁদের প্রভাব ছিল। এখান থেকেই শুরু হবে রোহতাসগড়ের দুর্গের আসল লড়াই। কি ভাবে রাজাকে বোকা বানিয়ে শেরশাহ এই দুর্গ দখল করলেন? রোহতাসগড়কে “দুর্গ” না বলে “পাহাড়ের মাথায় গড়ে ওঠা এক বিশাল দুর্গনগরী” বললে অনেক বেশি যথার্থ হবে। ঠিক সেই দুর্গনগরীর সামনে যখন আমাদের গাড়ি এসে থামল, তখন ঘড়িতে প্রায় দুপুর একটা। সকলেরই বেশ খিদে পেয়ে গেছে। সামনেই একটা খাবারের দোকান। এই দোকানেই আমাদের খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল। একেবারে বিহারের আদিবাসী খাঁচের ভাতের হোটেল। গিয়ে শুনলাম, রান্না শেষ হতে আরও প্রায় তিরিশ মিনিট লাগবে। ভাবলাম, এই সময়টুকু বসে থেকে নষ্ট করে লাভ কী! আগে একটু দুর্গটা ঘুরে আসি, তারপর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে খাওয়া যাবে। দোকান থেকে বেরিয়ে ডানদিকের কোণে চোখ পড়তেই একটা টিলা বা উঁচু ঢিবির মতো অংশ দেখা গেল। সামনে একটি বড় গেট। গেটের সামনে দুজন নিরাপত্তারক্ষী দাঁড়িয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের ছাড়া তখন আর কোনো পর্যটক চোখে পড়ল না। এত বিশাল একটি ঐতিহাসিক দুর্গনগরী, অথচ দুপুরবেলায় এমন নিস্তব্ধতা!

গেট পেরিয়েই যেন পরিবেশটা হঠাৎ বদলে গেল। সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের লন। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পুরনো গাছ। গাছগুলোর মোটা কাণ্ড আর বিস্তৃত ডালপালা দেখে মনে হচ্ছিল, এরা যেন এই দুর্গেরই বহু পুরনো বাসিন্দা। কত রাজা, কত সৈন্য, কত মানুষের আসা-যাওয়া দেখেছে এই গাছগুলি, তার কোনো হিসাব নেই। সরকারি বর্ণনাতেও রোহতাসগড়ের মালভূমির চারপাশে ঘন জঙ্গল ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। একসময় পাহাড়ের উপর দিয়ে বেশ কয়েকটি জলধারাও প্রবাহিত হতো। লনের উপর দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম। চারপাশ ক্রমশ আরও নির্জন। কোথাও ভাঙা প্রাচীর, কোথাও পুরনো পাথরের স্তূপ, আবার কোথাও ঝোপঝাড়ের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা কোনো স্থাপনার চিহ্ন। মনে হচ্ছিল, আমরা কোনো পরিত্যক্ত শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। অথচ এই নির্জনতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কয়েকশো বছরের ইতিহাস। কিছুটা এগিয়ে সামনে দেখা গেল হাতিয়া পোল। নামটির মধ্যেই যেন তার পরিচয়। এই প্রবেশদ্বারের সঙ্গে হাতির অলংকরণ জড়িয়ে আছে। এটি রাজা মানসিংহের প্রাসাদ-চত্বরের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ। হাতিয়া পোলের দিকে এগোতে এগোতে পথটা আর আগের মতো সমতল থাকল না। কোথাও পাথর বসানো পথ, কোথাও মাটির সরু রাস্তা, কোথাও আবার ঘাসে ঢাকা পুরনো পথ। দুই পাশে ভাঙা দেওয়ালের অংশ। কোনো কোনো জায়গায় প্রাচীন স্থাপনার শুধু ভিত্তিটুকু পড়ে আছে। দেখে বোঝা যায়, একসময় এখানে শুধু দুর্গের প্রাচীর ছিল না, মানুষের নিয়মিত বসবাসও ছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছিল নীরবতাটা। এত বড় একটি দুর্গনগরীর ভিতরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে মনে হয়, কয়েকশো বছর আগে এই পথ দিয়েই হয়তো সৈন্যরা চলেছে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠেছে, রাজপরিবারের লোকজন যাতায়াত করেছে। কোথাও হয়তো বাজার বসেছে, কোথাও রান্নার ধোঁয়া উঠেছে। আজ সেই সবকিছু নেই। আছে শুধু পাথর, গাছপালা আর সময়ের হাতে ক্ষয়ে যাওয়া ইতিহাস। হাতিয়া পোল পেরিয়ে যখন আরও ভিতরে ঢুকলাম, তখন বুঝতে পারলাম, রোহতাসগড় আসলে কোনো একক দুর্গ নয়। এটি ছিল পাহাড়ের উপর গড়ে ওঠা একটি বিশাল দুর্গনগরী। রাজপ্রাসাদ, মহল, মন্দির, মসজিদ, জলাধার, প্রশাসনিক ভবন এবং বসতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে অনেকটা এলাকা জুড়ে। সরকারি রোহতাস জেলা প্রশাসনের তালিকাতেও হাতিয়া পোল, রাজভবন, কিলাদার মহল, পঞ্চ মহল, ফুল মহল, বারাদরি, রাজার প্রাসাদ, তখতপদশাহী, জেনানা প্রাসাদ, রানি মহল ও অন্যান্য স্থাপনার উল্লেখ রয়েছে। আমরা তখনও জানতাম না সামনে আরও কতটা পথ। শুধু মনে হচ্ছিল, এই পথের প্রতিটি বাঁকের পরেই হয়তো ইতিহাসের

আরেকটি দরজা খুলে যাবে। ১৬শতকে শের শাহের সময় দুর্গের নতুন গুরুত্ব শের শাহের আমলে রোহতাসগড় আরও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সময়টা ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ। শের শাহ সূরি মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। চুনার দুর্গ মুঘলদের হাতে চলে যাওয়ার পর শের শাহের এমন একটি নিরাপদ দুর্গের প্রয়োজন ছিল, যেখানে তাঁর পরিবার, ধনসম্পদ এবং সৈন্যদের নিরাপদে রাখা যায়। রোহতাসগড় তার জন্য আদর্শ ছিল। দুর্গটি প্রাকৃতিকভাবে এত শক্তিশালী ছিল যে সরাসরি আক্রমণ করে দখল করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তখন তিনি যুদ্ধের বদলে কৌশলের আশ্রয় নিলেন। রোহতাসগড়ের তৎকালীন শাসকের কাছে শের শাহ বার্তা পাঠালেন যে তিনি বাংলায় অভিযানে যাচ্ছেন। তাঁর পরিবারের নারী ও শিশু এবং কিছু মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে রাখার জন্য তিনি দুর্গের ভিতরে আশ্রয় চান। দুর্গের শাসক তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন। এরপর শুরু হল আসল কৌশল। শের শাহ একের পর এক পালকি পাঠাতে শুরু করলেন। প্রথম কয়েকটি পালকিতে সত্যিই নারী বা দাসী ছিল। দুর্গের প্রহরীরা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখল এবং বুঝল যে ভিতরে কোনো সৈন্য নেই। ফলে পরের পালকিগুলিকে আর তেমনভাবে পরীক্ষা করা হল না। কিন্তু সেই পরের পালকিগুলির ভিতরে ছিল সশস্ত্র আফগান সৈন্য। পালকিগুলি দুর্গের ভিতরে ঢোকার পর সৈন্যরা হঠাৎ বেরিয়ে এসে প্রহরীদের আক্রমণ করে। আকবরনামা-র বর্ণনায় বলা হয়েছে, শের খান এই কৌশলে সৈন্যদের দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন এবং তারা দুর্গের দখল নিয়ে নেয়।

শের শাহের পর রোহতাসগড় মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আকবরের আমলেও দুর্গটির গুরুত্ব ছিল। দুর্গের মধ্যে আজও বিভিন্ন সময়ের স্থাপত্যের চিহ্ন দেখা যায়—রাজপ্রাসাদ, কিলাদার মহল, পঞ্চমহল, হাতিয়াপোল, ফুলমহল, বারাদরি, রানি মহল, নানা জলাধার, মন্দির এবং মসজিদ। এগুলি প্রমাণ করে যে রোহতাসগড় একসময় শুধু সামরিক দুর্গ ছিল না; এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ দুর্গনগরী। দুর্গটির সবচেয়ে বড় শক্তি—তার অবস্থান রোহতাসগড়ের আসল বিস্ময় শুধু তার প্রাচীনত্ব নয়—তার ভৌগোলিক অবস্থান। পাহাড়ের মাথায় দুর্গটি এমনভাবে তৈরি ও সম্প্রসারিত হয়েছিল যে শত্রুর পক্ষে সরাসরি আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। দুর্গে ওঠার প্রধান পথগুলিও ছিল দুর্গম ও পাহারাযোগ্য। আজ যে মেধা ঘাটের প্রায় ২,০০০ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে মানুষ দুর্গে ওঠেন, সেই পথই আমাদের বুঝিয়ে দেয়—একসময় একজন আক্রমণকারীকে এই দুর্গ জয় করতে কতটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো।

মাতৃভাষার বন্দনা

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

সূর্যের প্রথম সোনালি রোদ্দুরের মতো মোহময় আমার ভাষা ।
ভরা পূর্ণিমার নরম জ্যোৎস্নার মতো আমার ভাষা ।
আমার জীবনের প্রথম সরব উচ্চারণ – মা ...
একদিন মায়ের হাত ধরেই পথ চলা শিখেছিলাম, বাংলা শব্দের হিরন্ময় আলোয় ।
আমার হাসি-কান্না, প্রেম-হতাশা, মান - অভিমান –
সবকিছুর সবচেয়ে আপন আশ্রয় এই ভাষা, বাংলা ।
চর্যাপদের শিকড়ে শিকড় ছড়িয়ে
দাঁড়িয়ে আছে আমার ভাষা সময়ের বুক –
শত শত বছরের স্মৃতি নিয়ে
কতো মহামানবের সৃজনে পুষ্ট,
তিলে তিলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বোধের অস্তিত্ব আমার ।
এই ভাষার জন্য - রক্ত ঝরেছে রাজপথে,
নীরব রাতে জেগে উঠেছে প্রতিবাদের আগুন ।
একুশ আমাদের স্মরণ করায় –
ভাষা শুধু শব্দ নয়, ভাষা মানে অধিকার ।
উনিশ আমাদের শেখায় – ভাষা মানে আত্মমর্যাদা ।
আমি তোমার কাছে ঋণী, মা আমার ।
যে ভাষায় তুমি আমায় মানুষ করেছো ।
আমি ঋণী আমার বাংলার কাছে, যে ভাষায় আমি মানুষ হয়ে উঠতে শিখেছি ।
আমরা এই মধুরতম ভাষা বাংলাতেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই -
শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ।
নিজস্ব ঐশ্বর্য ও মর্যাদায় বেঁচে থাকুক প্রতিটি ভাষা ।
প্রতিটি মাতৃভাষার মিলন মঞ্চে
মানুষে মানুষে গড়ে উঠুক - আলোকিত সেতু ।
আসুক মৈত্রী ও জাগরণের ভোর ।

হালিসহর আনন্দম

স্বপ্ন স্বাধীন

শুভ্রা ঘোষ

বিজয়া

অমিত সাহা

তোমাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা
আমার বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়।
যেদিন তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে
অজুহাতে,
আমার পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার,
প্রতিটি প্রহর গুনেছি প্রতীক্ষায়,
হয়তো তুমি আবার আসবে, না,
তুমি আর ফিরে আসোনি,
সেই না পাওয়ার দিনগুলো
আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এসেছিল।
একলা রাতে, আমার একলা রাতে স্বপ্নে
এসে ভিড় জমিয়েছিল কল্পনা,
তুমি আমার হয়েছিলে,
তোমার অবহেলা বা অনুমতি
কোনকিছুই আর সৃষ্টি করে নি প্রতিবন্ধকতা।
স্বপ্ন স্বাধীন, বাতাসে পাখনা মেলে উড়িয়ে
দিলাম আমার ভালোবাসা,
কী প্রয়োজন!
তুমি নাই বা এলো!!

তোমায় কিছু বলবো ভাবি
ফাল্গুনের শিমুল বনে আগুন লেগেছে
কৃষ্ণ চূড়া রাঙিয়ে নিয়েছে বসন্তকে
তোমায় কিছু বলবো ভাবি
গ্রিসের ক্ষীণ নদী টি ভরিয়ে নিয়েছে
তার বুকে মাঝে মাঝে বান ডাকে
ছলকে উঠতে চায় - পার ভাসিয়ে জল
তোমায় কিছু বলবো ভাবি
শরতের তুলোর মতো মেঘেগুলো
এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ায়
শিউলির সৌরভ নিয়ে আসে
শারদ উৎসবের গন্ধ
বিজয়া মিলনীতে অনেকের দেখা পাই
কিন্তু হেমন্তের সোঁদা মাটির গন্ধে
নিয়ে আসে নবান্ন উৎসব
বড় শীত পড়েছে আজ একা দাঁড়িয়ে তুমি?

হালিসহর আনন্দম

তুলি

পার্থ সারথি ভট্টাচার্য

আড়াল

শঙ্কর হালদার

হতাশা যখন গ্রাস করে,
তখন আমি ছবি আঁকি
আমার বন্ধুরা তখন
ষড়যন্ত্রের তাঁত বুনছে
আমার হাতের তুলিটা দিয়ে
আমি ছবি আঁকি
বর্তমান সব পরিস্থিতির ছবি
আঁকি।
আমার বন্ধুরা সব রাজতন্ত্রের তুলি হাতে
নিয়ে
দাসত্বের ছবি এঁকে যাচ্ছে
আমার তুলিতে নানা রকমের রঙ
লাগে
বন্ধুদের তুলিতে লাগে শুধু রক্তের
রঙ
আমার তুলি গণতন্ত্রী রূপ দেয়
মানুষের কথা বলে -
আমার বন্ধুদের তুলিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়
মেহনতি মানুষের মাঝে।

ভোর ঘরে একটা দরজা থাকা ভালো
সব দরজা খুলে দিলে
সেটা আর ঘর থাকে না---
একটা আড়াল না থাকলে
সুভাসের পায়ের চিহ্ন কোথায় এসে দাঁড়াবে।
জোনাকিরা বলেছিল আলো দাও
কেন দেবে-- কার জন্যে দেবে প্রশ্ন করো না
তোমায় যেটা মানায়
তাই তোমার যুদ্ধক্ষেত্রের শস্যভূমি
মরুভূমি হয়ো না
পাতার নকশায় কালীপ্রসন্ন শুয়ে থাকে---
শব্দ আর জাদুকর
সূর্য ওঠা আলোর মতো বড়ো মিষ্টি
আলো আর আড়ালের মাঝখানে দুপুর দাঁড়িয়ে আছে
চেউ না থাকলে কেউ সমুদ্রের কাছে যেত না।
একটা আড়াল রেখো
আড়াল আর কাঁটাতার যেন বিছানায় না শোয়।।

নীলাঞ্জনার মাঠ

অশোক কুমার পাণ্ডে

অনেকটা পথ হেঁটেছি একসাথে –

সময়ের ক্ষণে দুজনের পথ গেছে বেঁকে

তারপর আর দেখা হয়নি,

কথাও হয়নি শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস অহর্নিশ পুড়ছে ।

একটা সময়, কথার স্রোত গেছে বয়ে রোজ বিকেলে,

সেই নীলাঞ্জনার মাঠে তোমার চোখের আলোয় দেখেছি

স্বপ্ন সেই তুমিই গেলে চলে- এবাঁধন ছেড়ে ।

তোমার চোখে লুকোনো ছলনা বুঝিনি দেখেছি-

মায়াবী চোখে দুফোঁটা জল

তাতেই খুলেছিলাম - হৃদয়ের সিংহ দুয়ার

অথচ বিশ্বাস ভাঙার শব্দ জমে সেই হৃদয়-কূলে ।

অভিমান- ‘বেশ আছি, কাউকে নেই প্রয়োজন’

এসব তো মুখের কথা, মনের কথা নয়কো

অথচ বোকার মত আজও খুঁজে ফিরি সেই নীলাঞ্জনার মাঠ ।

নৈরাজ্যের বিভীষিকা

নায়েব আলি গায়েন

'জাত-পাত' নিয়ে করে বিভাজন, দেশময় হাহাকার!
সচেতন যত দেশবাসী আজি নীরব-নির্বিকার ।
সংবিধানের এমনি বিধান, গণতান্ত্রিক দেশ,
এক জাতি এক রাষ্ট্রের নামে 'সেকুলারিজম' শেষ ।
প্রজাতন্ত্রের সব কিছু প্রজা, প্রজারা নহে বালাই,
প্রজা হিতৈষী রাজার মুখোশে চলছে গণধোলাই ।
নেতা-আমলারা সৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী সরকার,
শোষণ-পীড়নে বিদেশির বাড়ি পঁচাশিরা ছারখার!
না হয় দেশেতে কল-কারখানা রুজি-রোজগার হীন!
দিনে দিনে বাড়ি বেকারের জ্বালা অনাহারে কাটে দিন!
পথে বসে কাঁদে চাকুরী প্রার্থী নাগরিক কাঙারি,
পরিয়াদী হলো দেশের শ্রমিক কেমনে মানতে পারি?
দেশের উন্নয়নের চিন্তা করে নাতো এরা কেউ,
ধর্মাবেগের মশাল দু'হাতে অগ্রগতির ঢেউ ।
দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী গরীবের কপাল ঘামে,
ভুখাদের কালো রাত্রিকে এরা কিনেছে অল্প দামে!
দেশের অর্থ লুট করে যারা নিয়েছে বিদেশে ঠাঁই,
আইনের চোখে সে অপরাধীর কেন গো বিচার নাই
গলি থেকে রাজপথ জুড়ে চলে নারী-শিশু ধর্ষণ,
ন্যায় সঙ্গত দাবী প্রতিবাদে চলে গুলি বর্ষণ!
প্রতিবাদী আজ 'দেশদ্রোহী' আইনের চোখে গুণ্ডা,
এ কোন্ রাজ্যের অধিবাসী? যেন সাঁওতাল-ভীল-মুণ্ডা!
যাহাদের সুখ শান্তির লাগি শহীদ দিয়েছে প্রান?
এই কি তাহার উচিত মূল্য? রক্ত-ঘামের দাম!!

ভারত মায়ের অনুভূতি ৮০ তম দিবসে

সজল কুমার গুহ

হিংসা অহংকার ভ্রষ্টাচারে আজ আমি ক্লান্ত,
অনেকেই আজ তোরা উশ্জ্বল অশান্ত।
সন্তান বলে ভাবতে তোদের পাই ভীষণ লজ্জা,
বীর ত্যাগী সন্তানেরা মোর নিয়েছে মৃত্যু শয্যা।
বৃটিশ শৃঙ্খল থেকে করতে আমায় মুক্ত,
ওরা সবাই মিলে করেছিল হাত আমার শক্ত।
দুঃখ যাতনা সহেছিল অশেষ - আনতে স্বাধীনতা,
বর্বর বৃটিশদের মানেনি কোনো বদান্যতা।
সুখ ওরা চায়নি মোটেই নিজের জন্য,
আমার মুক্তিই ছিল ওদের কাম্য।
ওদের কথা ভাবিস কি কখনো তোরা?
ওরাই যে ছিল সন্তান মোর সেরা।
বিপ্লবী শহিদদের ত্যাগ - গিয়েছিস তোরা ভুলি,
আত্মঅহংকারের আওড়াস শুধু বুলি।
শহিদদের কেউ কখনো বলিস জঙ্গী,
অকৃতজ্ঞতা, অমানবিকতা আজ নিত্য তোদের সঙ্গী।
নারী আজ হয়েছে অনেকের কাছে ভোগ্যপণ্য,
ওদের করে পাচার, করে নির্যাতন কেউ ভাবে ধন্য।
আমাকে আর করবি তোরা কতো ভাগাভাগি?
ভাগ না পেলেই, করিস মারামারি, রাগারাগি।
সর্বান্ত আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করেছিস ছাড়খার,
দূষণ-উষণয়নে আক্রান্ত আমি বারবার।
স্বাধীনতার ৮০ বছরে, তোদের ব্যবহারে আমি বড়ই দুঃখী,
এতো বৈভবেও পারলিনা আমায় করতে সুখী?
তবে, ভালো সন্তান এখনও আছে কিছু আমি জানি,
আনন্দে বুকটা যায় ভরে ওদের কৃতিত্ব যখন শুনি।
সবশেষে বলি, তোদের একটি দামী কথা:
'বৃত্তি প্রবৃত্তি' "সু" এর অধীন আনাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

এখনও ঘ্রাণ নিই
অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী

কোন যত্ন নেই আদর নেই, এমনকি দেখার লোকও নেই
তবু ফুটে যায় রজনী বেল আর ডালিয়া নানা বর্ণের
লাল সাদা গোলাপের সেই রূপ গেছে হারিয়ে
তবুও তারা ফোটে, শুধু ভালোবাসায়
কবেকার ভালোবাসা, শৈশবের, কৈশোরের----
পাঁচিলে বড় অশথের গাছ, দেওয়ালে ফাটল
তবু তার শিকড় ভাঙতে দেয়নি ৩৫ ইঞ্চির চেহারাকে
প্লাস্টার চটা বিবর্ণ মনের অন্ধকার নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার স্মৃতি।
তার ছোঁয়া নেই, তার যত্ন নেই, স্নেহ ভালোবাসা সবকিছু
দিগন্তের ওপারে - পাখিদের মৌনতা শুধে নিয়েছে আনন্দ
অন্ধকার নামে ঝুপ করে, সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে না তুলসীতলায়
দরজার চোকাটে জলছড়নো নেই, একে একে চলে গেছে পুরুষ
সখ্যতা হারিয়ে গেছে কবে! মন খারাপের ভিটে---
মায়া তবু জড়িয়ে রাখে দুরত্বকে, কিভাবে অতীত হয় বর্তমান?
বর্তমানও হয় যাবে অতীত
ভবিষ্যতে আরও বেশি অন্ধকার, অন্ধকারের সেই পোড়ো বাড়িটা
এখনও কাগজী লেবু জন্ম নেয় - একা একা
দূর থেকে ঘ্রাণ নিই বিষন্ন বেলায়
অযত্নে ফুটে থাকা বেঁচে থাকা, রজনীগন্ধার।

সকলের প্রিয় নেতাজী

ডাঃ অনিরুদ্ধ পাল

হে বীর নেতাজী তোমাকে দেখে মম শির হয় নত।
তুমি বিনা স্বাধীন ভারতবর্ষ নাহি দেখা যেত।
নেতাজী, তুমি মানতে না কোন শৃঙ্খল বাধা বন্ধন।
তোমার নীতি বজ্রকঠিন ভুলে যাওয়া যত ক্রন্দন।
আজাদ হিন্দের দায়িত্ব নিয়েছিলে দেশকে স্বাধীন করতে।
বীর সেনানীরা লড়ে গেল রক্ত ঝরাতে ঝরাতে।
যুদ্ধ করতে করতে আজাদ হিন্দ পৌঁছেছিল ভারত সীমান্তে।
প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে ভারত ভূমিতে।
তুমি চেয়েছিলে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড ভারতবর্ষ।
কিন্তু স্বাধীনতা পেয়েও আমরা হয়েছি পর্যুদস্ত।
তোমার সঙ্গে করেছে যারা বিশ্বাসঘাতকতা,
ইতিহাসে দেখি তাদের যতসব গল্প গাথা।
জানি তুমি আছ সবার উপরে সবার চোখের মণি,
জীবনের পথে তোমাকেই তাই আদর্শ বলে মানি।
হে নেতাজী, হে বীর সুভাষ, দুর্গমপথযাত্রী - তুমি ফিরে এসো,
জাগিয়ে মনের আশা - তোমার দেখানো পথেই তো মোরা গাবো।

হালিসহর আনন্দম

রক্তের ঋণ

রঞ্জন ভাওয়াল

এত রক্তের ঋণ কিভাবে পরিশোধ করবো?

যার হারিয়েছে সেই বোঝে--

নির্মম বর্বরতা অগ্নিসংযোগ হত্যাযজ্ঞ

ধর্ষণ- শিশু বৃদ্ধা যুবার রক্তে রঞ্জিত

সন্তান হারানোর মা- ছাড়া কে বুঝবে?

স্বাধীনতা ঠুনকো কিছু নয়- অর্জিত সম্পদ

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাজনৈতিক সামাজিক

সাংস্কৃতিক ঐক্যবদ্ধ ত্যাগের ধারাপাত!

এক নদীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মানচিত্র

গেরুয়া, সাদা আর সবুজের পতাকা - যেন বুকের পিরান

পরাদীন জাতি স্বাধীনতার মর্মার্থ বুঝে;

স্বাধীনতার রক্তের ঋণ - অপরিশোধ্য।

মধুরেণ সমাপন
কৌশিক মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টিটা কিছুতেই থামছিল না। পৌলমীরও সাগরের জন্য অপেক্ষার যেন কোনো শেষ ছিলনা। আজ সুখবরটা দেবে—ভাবছিল, দেখবে ও কতটা খুশি হবে, কতটা আদর করবে তাকে। আলমারি খুলতেই চোখে পড়ল ফুলশয্যার রাতের সেই বেনারসি। মনে পড়ে গেল তানিয়ার কথা—তাকে যা লাগছে! সাগর তোকে দেখলে পাগল হয়ে যাবে।” চারপাশের মেয়েদের হাসি, ননদ স্নিগ্ধার ঠাট্টা, পার্লামেন্টের মেয়েটির প্রশংসা—সবই যেন মুহূর্তে ফিরে এল। আর ফিরে এল অস্মিতার মুখটাও—স্নিগ্ধার কলেজের বন্ধু, “ডানাকাটা পরী।

ঠিক তখনই দরজার ঘন্টা। মনজ—সাগরের বন্ধু ও সহকর্মী। সে জানাল, সাগরকে এক সুন্দরী মেয়েকে বাইকের পেছনে বসিয়ে যেতে দেখেছে। পৌলমীর বুকটা হিম হয়ে গেল—তবে কি অস্মিতা?” সন্দেহ সত্যি হলো। সাগর সম্পর্কের কথা স্বীকার করল। পৌলমী তখন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তবু সাগর বিবাহবিচ্ছেদ চাইল। ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে বলল।

পৌলমী বুঝল, টাকায় বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষত সারানো যায়না। তাই একটু শুকনো হেসে দৃঢ় স্বরে বলল, “টাকা লাগবে না।” তোমার কিভাবে চলবে তাহলে?”

“অন্য সম্পর্কে জড়ানোর সময় তুমি তো ভাবোনি, সাগর! আমার কিচ্ছু লাগবে না। আপাতত মায়ের কাছে থাকব। আর দুটো প্রাইভেট স্কুলে সিভি দিয়ে রেখেছি। আশা করছি, খুব শিগগিরই যেকোনো একটা থেকে জবাব পাব। তোমরা ভালো থেকো।”

পৌলমী একাই মেয়েকে মানুষ করল। শিক্ষকতা, সংসার আর মেয়েকে ঘিরে কেটে গেল বিশ বছর। আজ তিতলির বিয়ে। পাত্র বহুজাতিক সংস্থার সেলস-এক্সিকিউটিভ, রক্ষণশীল পরিবারের একমাত্র ছেলে; বাবা নেই, মা-ই সংসারের কর্ত্রী। তিতলির ইচ্ছেতে মহিলা পুরোহিত বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন, সম্প্রদান করলেন পৌলমী। আশীর্বাদের ফুলে ভরে উঠল মঞ্চ। সবার পেছনে সাগর, পাশে হুইলচেয়ারে অস্মিতা। পৌলমী এবারও সাগরের দিকে ফিরল না। কিন্তু সবাইকে অবাধ করে নিজেই অস্মিতার হুইলচেয়ার ঠেলে সামনে নিয়ে এল। মেয়ে-জামাইকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে বলল, “ওঁর আশীর্বাদ নাও। অস্মিতা কাঁপা হাতে তাদের আশীর্বাদ করল। তারপর পৌলমীর হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, “আমায় ক্ষমা করো, যদি পার।” পৌলমী কিছু বলল না। শুধু হাতটা শক্ত করে ধরে রইল। কুড়ি বছর আগের যে অপেক্ষা তাকে ভেঙে দিয়েছিল, আজ সেই অপেক্ষার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে বুঝল—ক্ষমা কখনও পরাজয় নয়।

শিক্ষার সেকাল একাল

দীপঙ্কর মজুমদার

1857 সালে ১ম বারের মতো এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষা চালু হলেও পরে তা 1904 সালে ব্রিটিশ ভারতে, 1950 সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল 'মেট্রিকুলেশন' (মেট্রিক)। এই পরীক্ষা নিত সরাসরি CU. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। এরপর ছিল FA (Fast Arts) 2 বছরের জন্য পড়তে হতো। পরে ১৯০৯ - ১৯৫৭ সালের অর্দি নাম পরিবর্তন হয়ে হয় IA (Intermediate of Arts), ISC (Int. of Science) etc. পরবর্তীতে BA, BSC পড়া। এরপর ১৯৫১ - ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত 'মেট্রিক' পরীক্ষার নাম পরিবর্তিত হয়। 'স্কুল ফাইনাল' (School Final)। তবে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৫ সালে এক নতুন নিয়ম চালু হয়। অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল ও এরপর ২ IA, ISC যারা করবে না তারা (9+10+11) এই তিন বছরের old HS. (Higher Secondary) করতে পারে। কিন্তু সে সময় যেসব স্কুলে ক্লাস II চালু হয়নি, সে ক্ষেত্রে 1 বছরের Bridge Course PU তথা ফ্রী Pre University পড়তে হবে তাও আবার College (মহাবিদ্যালয়) এ গিয়ে। 1951 সালে WBBSE গঠিত হয় এবং স্কুল ফাইনাল ও old HS. পরীক্ষা এই সংস্থা নেওয়া শুরু করে। ১৯৭৪ সালে (9+10) নিয়ে স্কুল ফাইনালের নাম হয় 'মাধ্যমিক'। এই বছর প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। এবং ১৯৭৬ সালে ক্লাস (11+12) বছরের new H.S. পরীক্ষা চালু হয়। তবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত H.S. Course College এ এবং পরবর্তীতে School এ পড়ানো হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে WBCHSE সংস্থা গঠিত হয়। সে বছর থেকে ২ বছর H.S. এই সংস্থা পরিচালনা করে। এই বছর প্রথম (H.S.) নিউকোর্স পরীক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে প্রথম শুধুমাত্র ক্লাস XII নিয়ে (H.S.) পরীক্ষা চালু হয় বর্তমানেও এই নিয়ম সেমিস্টারে বিভাজিত হয়ে বহাল রয়েছে। বছরে একবারের পরিবর্তে দুবার হবে, প্রথমবার MCQ - Type এবং পরে 2/3 নাম্বার ভিত্তিক। তবে এই নিয়ম চালু হয়, গত ২০২৪ - ২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে। এক্ষেত্রে দুটি রেজাল্ট হবে। অর্থাৎ Class - XII (Sem. III and Sem. IV)। এতকিছুর পর শিক্ষার মেরুকরণ, প্রগতি, বিস্তার ও নতুন ভাবনা নিয়ে কিছু মতামত আশা করছি?

- 1) Syllabus সংক্ষিপ্ত 2) Commercial (বাণিজ্যিক সকল) শিক্ষা 3) Project Oriented শিক্ষা 4) বাস্তবমুখী শিক্ষা 5) পরীক্ষা পদ্ধতি ও নম্বর বিভাজন একমুখী 6) শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ।

শীত এলে
পাণ্ডু বিশ্বাস

হিমেল বাতাস বললো হেসে, আমরা সবে এখন এসে, দিচ্ছি নরম ছোঁয়া!
সবুর করো আর কিছু দিন, সবাই যখন নাচবে তা ধিন। দেখবে মুখে ধোঁয়া!
দুপুরে নয়, খুব সকালে, বিছানা ছেড়ে না তাকালে -- কি করে তা বুঝবে?
ভোরে উঠে ব্রাশ করে যেই, মুখ ধুয়েছ আর হাঁ করলেই ধোঁয়াটাই তো খুঁজবে!
শীতটা একটু জমলে পরে ভিন্ন মেজাজ ঘরে ঘরে। ব্যস্ত সবাই সাজে।
কে যে কোথায় ঘুরতে যাবে! কোথায় গিয়ে, কে কী খাবে খরচা হবে বাজে
এসব ভাবনা নয় তো সবার, বই মেলাতে গেলে ক'বার? যায় যারা তো গোনো।
জলসাগুলো, গানের আসর, কবিতা, বা বিয়ের বাসর, সবাই-ই তো শোনে।
বেদম শীতে ফিরছি বাড়ি, পাশ দিয়ে যায় দ্রুত গাড়ি। রাস্তা গুলো ফাঁকা।
কাঁপছি আমি, পাশের যাত্রি, গড়িয়ে চলে হিম-রাত্রি, মনে থাকবে আঁকা।
ঘুমিয়ে পাড়া, চুপ নিঃস্বপ্ন--সকাল হলো, আলসেমি ঘুম কন্ডলেতে মুড়ে।
জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই, রোদ উঠেছে তা দেখতে পাই, জানলা খুলে ঘুরে।
শীত তো এলো, শহরটা তো সেজেছে খুব। আলো এতো বাড়ির পাশে মেলা।
মিলন মেলা খুব আয়োজন, আমার কিন্তু টেকে না মন। আমার দুঃখ বেলা!
এই মেলাতেই হারিয়ে গেছে অবলম্বন আমার কাছে যে ছিল একমাত্র।
আমার ঈশ্বর, আমার ভ্রাতা, আমার আলো, জন্মদাতা। আমার দিবারাত্রি!
শীত এলে তাই কষ্ট বাড়ে, দুঃখ বোঝা আসে ঘাড়ে। কাতর হয়ে থাকি!
দুঃখ কথা, থাক তোলা থাক। শীত আসুক, আর যাক চলে যাক।
থাক না কিছু বাকি! থাক কিছুটা বাকি।

ভালোবাসা

ড: শ্রী ব্যাসদেব শঙ্করাচার্য্য

অংক কষে যদি ভালোবাসা হত,
সব গণিতের শিক্ষক সফল প্রেমিক প্রেমিকা হত।
ভালোবাসা যদি পারফেক্ট কেমিস্ট্রি হত,
সব কেমিস্ট্রির প্রফেসরের বিবাহিত জীবন মধুর হত।
ভালোবাসা যদি "আই লাভ ইউ" তে প্রমাণ পেতো,
তবে বিয়ের পর গোপন প্রেম স্বীকৃতি পেতো।
ভালোবাসার পরিণতি যদি বিবাহ হয়,
তবে কেন রাঁধা কৃষ্ণ প্রেমের প্রতীক রূপে পূজিত হয়?
যদি ভালোবাসা অভিযোগ, অভিমানের বুলি হয়,
তবে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য কি বিষ্ণুপ্রিয়া হত?
ভালোবাসা যদি কেবল মাত্র ভোগ বাসনা হত,
তবে কি শ্রী রামের অর্ধাঙ্গিনী মাতা সীতা হত?
ভালোবাসা কোন ছল বোঝেনা, বোঝেনা চপলতা,
ভালোবাসা তারে কয় যে জন সুদামারে পায় কাশরী।
ভালোবাসা তারে কয় যিনি নারদ মুনির প্রতিচ্ছবি,
ভালোবাসা এ নয় স্বপ্ন দিয়ে তাসের ঘর বাঁধবি।
ভালোবাসা অংক বোঝেনা, বোঝেনা কোন কেমিস্ট্রি,
বোঝে শুধু নিজেকে বিলিয়ে দিতে এটাই সত্যি।
শুনতে যদি পাও একতাড়াতে সজীব মনের সুর,
বাউল যদি হতে পারো ভালবাসার নামটি কর।
ভালোবাসা কখন হবে বোঝা ভারী ভার,
ভালোবাসা কেবল আমার তোমার নয়, সবার।
নামটি বড় স্বাধীন কিন্তু থাকে পরের অধীন,
দুঃখ,বেদনা,কষ্ট সবই পাবে যে এরে ভাবে আন।
ভালোবাসার বহুরূপ জ্বালায় এবং জ্বলে,
ভালোবাসার বহু নাম কলে, বলে, ছলে।
যদি ভালোবেসেছো চাইবে কম দেবে বেশি,
অংকে নয় ত্যাগের মন্ত্রে হবে বিশ্বাসী।
ভালোবাসা চায় অন্তরের প্রজ্বলিত শিখায় স্বীকৃতি...

তমসো মা জ্যোতির্গময়

অম্বর কান্তি কুমার

প্রকৃতির কাছে মানুষ লাভ করে সাম্য ও সমন্বয়ের শিক্ষা। প্রেয় থেকে শ্রেয় স্বভাবে উত্তরণের শিক্ষা। প্রকৃতি অকাতরে জল – আলো – বিশুদ্ধ বাতাস – খাদ্য দান করে, প্রতিদানে তাদের প্রতি যৎসামান্য যত্ন ও ভালোবাসা ব্যতীত আর কিছু চায়না। নানা সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি যেন ধ্যানমগ্ন – শান্ত সমাহিতা – নিঃসঙ্গ – একাকিনী। তাদের কর্মে ক্লান্তি ও বিষাদ নাই, আছে গতি ও ত্যাগের সংযত রূপ ও মাধুর্য। আর এই হল ভারতের সনাতন রূপ। আধ্যাত্মিক ধর্ম ও অন্তর্নিহিত শক্তি, যার বলে, জ্ঞান – কর্ম – প্রেমযোগে মানুষ মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভোগাতিশ্য, সুখস্পৃহা, উন্মাদনা, জ্ঞানের অহংকার, কর্মসর্বস্বতায় অস্থির ও ক্লান্তিকর জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, শান্তি থাকে না, আনন্দের সন্ধান মেলে না। সন্তোষ, সংযম শান্তি ও ক্ষমা মনুষ্যত্ব ও মানব সভ্যতার অনুষ্ঙ্গ, আনন্দের সোপান। ধর্মের সঙ্গে কর্ম, কর্মের সঙ্গে শান্তির যোগে আনন্দ উপলব্ধির জন্য ভারতবর্ষ একাকীত্ব ব্রত পালনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আবাল অন্যদিকে পুরাতন কে আশ্রয় করেই নূতন কে গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্বাস করতেন – “পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে”। পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের আবির্ভাব প্রকৃতির বুকে অনায়াসে ঘটে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে, এর জন্য কোন সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানব জীবনে নূতনকে বলিষ্ঠ ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হলে নিজের সাথে নিজেকে লড়াই করতে হয়, যে - সে লরাইতে জিততে পারে, সে পায় জীবনের স্পর্শ - চরম উৎকর্ষতার ছোঁয়া।

নূতন শুভ সুন্দর ভাবধারার স্পর্শই জীবনানন্দের উৎস, গতি বা চলমানতাই জীবনের ধর্ম। প্রাচীন ভারতের উদার উন্মুক্ত তপবনে প্রকৃতির মধ্যে ঋষিরা ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মিক স্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই দর্শনের কথা ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর বিপুল সৃষ্টির মধ্যে বলে গেছেন। কবিগুরু চিরকালীন নূতনের অগ্রদূত। তার মত মহর্ষীদের সৃষ্টিতে থাকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। তিনি

তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন - নিদ্রিত দেশবাসীকে জাগ্রত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় শিষ্য যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দও সদা জাগ্রত - সদা আনন্দ - সদা প্রেম - ভালোবাসার পথে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে অন্তরে ও বাইরে উদ্ভাসিত হলে প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম, এগিয়ে চলার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আসলে তিনিতো রবীন্দ্রনাথ, তিনিই বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছেন সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অন্তরে ও বাইরে যুগপৎ উদ্ভাসিত হতে। বিশ্বকবির ভাষায় “অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, - সেই তো তোমার আলো। সকল হৃদয় - বিরোধী মাঝে জাগ্রত যে ভালো - সেই তো তোমার ভালো”।

জ্যোতির্ময় পরমসত্তার রুদ্র আঘাতে যখন হৃদয়বীনার তার বাৎকৃত হয়, তখনই ঘটে আত্মজাগরণ, আর তার থেকেই ঘটে উত্তরণ। উপনিষদের মন্ত্রে বলা আছে, ‘রুদ্র যজ্ঞে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম’ - হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে জড়তা, ব্যর্থতা ও তোমার অপপ্রকাশ হইতে রক্ষা করো। জীবনে কেবল উচ্ছল সুখের আমোদ - প্রমদ নয়, পরমসত্তাকে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ নিবেদন করাই মানুষের ধর্ম। মানব জীবনের সুখ দুঃখ, আশা - নিরাশা প্রেম ভালোবাসা, স্নেহ - মমতা সব একত্রিত করে যে মূল্যবোধ তাই হচ্ছে মানবতাবাদ। ‘নান্বনমবমন্যেত’ - আত্মার শক্তিকে অবমাননা করা উচিত নয়। একথা যেমন সত্য তেমনি - অন্তরে মালিন্য মুক্ত হওয়ার জন্য শত্রুমিত্র ভেদ জ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া উচিত এবং নিজের অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করার মতো মূল্যবোধ অবশ্যই থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘নববর্ষের প্রার্থনাতে’ বলেছেন, আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে - ‘অসতো মা সদাগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর মা মৃতং গময়। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপূট করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। বলিতেছি অবিরাবীর্ম এধি হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অভিমান
ঝুমা সরকার

শূন্য গর্ভ
শোভা সান্যাল

জানো, তুমি না-থাকলে
দুপুরগুলো কেমন অন্যমনস্ক হয়ে
আবছায়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ হারায়
গাঢ় অসহায় অভিমানে
আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়
বিষন্ন রাগিনীর বেসুরো সুর।

শুধু তুমি নেই বলে
অনেকটা শূন্যস্থান জুড়ে
দুঃখ পোহায় এলোমেলো কবিতাগুলো
দিশাহারা শব্দেরা আক্ষেপের আগুনে পুড়ে
আশ্রয় খোঁজে জীবনের কাছে।

তোমার চলে যাওয়া পথে
অগোছালো স্মৃতির মানচিত্র
রোজ আঁচল বিছিয়ে বসে।
উঁকি দেয় আমার হেরে যাওয়ার গল্প
তবুও, আমি অপেক্ষা করতে ভালোবাসি।

এই বিশ্ব
জেনো একদিন হবে নিঃশ্ব,
প্রাণীরাও নিঃশেষ হবে অবশেষে
একথা বলছি ভালোবেসে।
মাটির তলার যত সম্পদ,
শেষ হয়ে গেলেই আসবে বিপদ!
মাটির ওপরে, আকাশে - বাতাসে,
দূষণ ছড়িয়ে দিলে, ধোঁয়া আর নিঃশ্বাসে
সাগরের জল যদি হয় বিষে ভরা,
জেনো, ধ্বংসটা ঘটে যাবে ত্বর।
শোনো, একদিন
শুধে যেতে হবে এই ঋণ।
ভালবেসো, এই ধরণীকে ভালবেসো,
ভালোবেসে দিয়ে যেও ভরে
ধ্বংস ডেকেছো, যাকিছু নিঃশ্বাস করে।
আগামী দিনের ভবিষ্যৎ
ফিরে পাক পৃথিবীর যত সম্পদ,
মুছে যাক অভিশাপ, নিঃশ্ব এ ধরণীর,
ঘুচে যাক আঁধার ভরা থাক আলো,
ঝরঝর আশীষ, আগামী দিনে
সবকিছু হোক আরও ভালো।।

ভালোবাসা এবং জিওমেট্রি

ডঃ সুদীপ্ত রঞ্জন সাহা

ভালোবাসার আকার কেমন?

হতে পারে ত্রিভুজের মতো।

এক নারী আর দুই পুরুষের সম্পর্ক,

তিন কোণায় পরে থাকে

তিনটি হৃদয়;

আর কোন সম্ভাবনা?

হতে পারে চতুর্ভুজ।

তিন পুরুষ আর এক নারীর সমীকরণ;

বেশ, আর কিছু?

হতে পারে রম্বস।

সমপ্রকৃতির চারটি হৃদয় -

সম্পর্কের টানে লাটুর মত ঘোরে।

গ্রিক ভাষায় রম্বস অর্থ

লাটুর মত ঘূর্ণন।

বেশ আর কিছু কি হতে পারে?

বৃত্তের চারপাশে ঘুরে

কেন্দ্রে ফিরে আসাও তো ভালোবাসা।

নতুন দিন

ড. সঞ্জয় প্রামানিক

পাহাড় ভাঙার মত শব্দ,

চারদিক থম্ থমে হয়ে গেল।

ছেউ-ছেলেটা ছুটে পালাল।

আর্তনাদ শোনা গেল -

'বাঁচাও'।

ছেউ-ছেলেটা আবার ছুটে এল -

'আমাদের বাঁচাও'।

কতগুলো লোকের কণ্ঠস্বর থেকে -

নারী-খাদকের গোঁ শোনা গেল।

ততক্ষণে লাল রঙের সূর্য -

পৃথিবীতে এনে দিয়েছে আরেকটি নতুন দিন।

আর রঙে মোড়া আরেকটি লাশ।

গতিহারা
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

সেদিন তোমায় দেখেছিলেম ভোরবেলায়। তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে কেগ পার্কে, তোমার বর কে সঙ্গে নিয়ে, আমি গেছিলাম মর্নিংওয়াকে। তোমার সঙ্গে দেখা হলো, ইশারায় বর কে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। সেই কবে ক্লাস ইলেভেনে হাইস্কুলে পড়া। তখন থেকে প্রেম। তুমি আমায় বলেছিলে আমি নাকি খুব মিষ্টি। আমি বলেছিলাম তুমি টক। সেই নিয়ে খুব হাসাহাসিও। তারপর কয়েক বছর পর তুমি বলেছিলে আমায় বিয়ে করো, আমার দেখাশোনা চলছে, আমি পারিনি। কারন আমার থেকে দু বছরের বড় দিদি বিবায়োগ্যা ছিল। আমি বলেছিলাম আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, দিদির বিয়ে হল কিন্তু তুমি আর অপেক্ষা করনি। আজ আমাদের বয়স হয়েছে কিন্তু সেই ফেলে আসা স্মৃতি ফিকে হয়ে যায়নি। তখন তো কোন মোবাইল ছিল না রোজই ক্লাসে দেখা হতো। একসঙ্গে গান গাইতাম, সিনেমায় যেতাম, কোন চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি। তখন জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা দিশাহারা। এখন দেখা হল কোন নম্বর দিলে না বরং যেতে বললে কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কি মুখ নিয়ে যাব বলতে পারো সুচন্দ্রা?

সব চলে
অনিমা গুছাইত

মাঝে মাঝেই তুমি আমাকে খোঁটা দিতে তুমি ছাড়া আমার একটি দিনও চলবে না। অথচ, তুমি দেখো তুমি ছাড়া আমার জীবন কেমন নদীর মত বাঁক পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তুমি ছাড়া আমার হাত চলছে, পা চলছে, মাথা চলছে, সময় চলছে, দিন চলছে, মাস চলছে বছর চলছে। সব চলে চালাতে জানলেই চলে কারো জন্য কিছু থেমে থাকে না। কেউ থাকলেও চলে না থাকলে চলে।

রঙহীনের কবিতা

কৌশিক গাঙ্গুলী

চারিদিকে অস্থিরতা,
চারিদিকে গুমোট অস্বস্তি,
পতাকার রং বদল হয়েছে,
ক্ষমতার রং বদল হয়েছে,
স্তাবকদের রং বদল হয়েছে,
কিন্তু আমার মতো মানুষেরা যারা,
গিরগিটির মতন নয়
তাদের অবস্থা একই আছে ।
আগের মতনই ম্যাডমেরে, ফ্যাকাশে ।
সেই আগের মতনই খাদ্যের সন্ধানে,
সেই আগের মতনই হেঁটে যায় কংক্রিটের জঙ্গলে,
চারধারে মানুষ রুপী হয়নারা শিকারের সন্ধানে অনেকদিন ধরে ।
আমার কোনো আশ্রয় নেই, আমার কোনো নিরাপত্তা নেই,
যা আছে, তা অনিশ্চিত জীবন,
যাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে যায়, ভাগ্যবান ভন্ডদের দল,
অট্টোহাসিতে ফেটে পরে শয়তানরা ।
অসহায় বিধাতা কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
আর আমি ছাতাহীন, দলহীন, নিরাপত্তাহীন একজন শব্দশ্রমিক,
যে নিজের দুর্ভাগ্যের সাথে লড়াই চালায় তেপান্তরে বসে ।
গাছহীন - জলাশয়হীন- মানুষহীন একটা দ্বীপ,
স্বপ্নে আমাকে ডাকে, বলে চলো নির্বাসনে ।
সঙ্গে খাতা, পেন নিতে ভুলো না ।
ওখানে লিখবে নিজের রক্ত দিয়ে অক্ষরমালা, যাতে মিশে থাকবে কান্না ।
খুব জোর কালবৈশাখী আসছে ।
একটা পাগলপারা বৃষ্টির পূর্বাভাস ।

কবি রাধামাধব মিত্র ছিলেন যুগ সন্ধিক্ষণের কবি

ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য, ৮ বছর করেছিলেন সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনাও
স্বপন কুমার দাস

রাধা মাধব মিত্র ছিলেন উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার এবং সাংবাদিক, যিনি বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র সংবাদ প্রভাকর-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৫৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর, পরবর্তী সময়ে কবি রাধামাধব মিত্র এই বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংবাদপত্রটি পরিচালনা করেন। রাধামাধব কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সংবাদ প্রভাকর মাসিক সংস্করণ, গুরুত্ব ধারা বজায় রেখে আট বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রসার্ণব, সুধাকর, সুজন রঞ্জন, বঙ্গরঙ্গ, দ্বিজরাজ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সাময়িক পত্রও তিনি সম্পাদনা করেন। কবি হিসেবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল পাঁচ খণ্ডে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাবলী', যার পঞ্চম ভাগটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার হিসেবে তিনি উনিশ শতকের সমাজভাবনা ও বিধবা বিবাহ কেন্দ্রিক সংকটের পটভূমিতে 'বিধবা মনোরঞ্জন' নামক একটি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। রাধামাধব মিত্রের কবি হৃদয়ের অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত নাটক 'বিধবা মনোরঞ্জন'-এ। এই নাটকের সংলাপগুলো তিনি সম্পূর্ণ গদ্যে না রেখে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত আকারে তৈরি করেছিলেন। নাটকের পদ্য সংলাপগুলোতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যবাহী পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেন।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'তোমার কথা' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেখানে হুগলি জেলার প্রাচীন জনপদ বন্দিপুরের ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে বিধবা বিষম বিপদ (১৮৫৬) নামক নাটকটিও খ্যাতি পেয়েছিল। বিধবাদের সামাজিক ও মানসিক যন্ত্রণা এবং সমকালীন সমাজব্যবস্থার কুফল নিয়ে রচিত একটি বাস্তবধর্মী নাটক। তিনি হুগলি

হালিসহর আনন্দম

জেলার হরিপাল অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যশালী জনপদ জেজুর গ্রামের মিত্র বংশের সন্তান ছিলেন। জেজুর গ্রামের বিখ্যাত কবি রাধামাধব মিত্র বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে কাব্য সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য অঙ্গনেও তার বিশেষ পরিচিতি ছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি “বিধবা মনোরঞ্জন” নামক নাটক রচনা করেন। এছাড়া ১৮৭৩ সালে পাঁচ খণ্ডে তার ‘কবিতাবলী’ প্রকাশিত হয়। হুগলি জেলার ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাতেও (যেমন সুধীরকুমার মিত্রের হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ গ্রন্থ) তাঁর কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে কবিতার সুবর্ণ যুগে অজস্র কবিতা ও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন।

তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে কবিতাবলী (পাঁচ খণ্ড), বোধেন্দুদয়, স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ, বিধবা মনোরঞ্জন নাটক, বণিতামরণ খেদের কারণ, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্ব, শারদীয় মহোৎসব, ভাবলহরী, তোমার কথা প্রভৃতি উল্লেখ্য। তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত নাটকও গুণীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তাঁর চার পংক্তি কবিতা উল্লিখিত হল সাহিত্য প্রসঙ্গ থেকে—

“পরোক্ষে লোকের নিন্দা যে মানব করে।

লোকের অনিষ্ট চেষ্টা, করে, করে করে।।

অধম তাহার মত কেহ নাই আর।

অত্যন্ত জঘন্য হয়, স্বভাব তাহার।।”

আবার হুগলির প্রাচীন জনপদ বন্দিপুরের কেনো নাম হলো সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি করেছিলেন শিলস্ ফ্রি কলেজের হেড মাস্টার এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক কবি রাধামাধব মিত্র তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে কাব্যের মাধ্যমে। তিনি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে “তোমার কথা” নামক একটা গ্রন্থে কবিতার মাধ্যমে বন্দিপুরের নামের মাহাত্ম্য উল্লেখ করেছিলেন—

“সমীপস্থ গ্রামের অভিমান,

তাতে রাজধানী ছিল, সপ্রমাণ।

“বন্দীপুর” কারাগার বুঝা যায় ভাবে—

“হাতশেওলা” হাতিশাল লোকে অনুভবে।”

ডক্টর সুকুমার সেন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭)
কবি রাধা-মাধব সম্বন্ধে যাহা লিখেছিলেন তা তুলে ধরা হল—

“জেজুর নিবাসী রাধামাধব মিত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। রাধামাধব কিছু কাল মাসিক প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাধামাধব শীলস্ ফ্রি কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার কবিতা গ্রন্থের মধ্যে ‘বোধেন্দুদয়’ (১৮৬৩) এবং পাঁচখণ্ড ‘কবিতাবলী’ (১২৬৮-৭৩) পাঠ্য পুস্তক হিসাবে লেখা হইয়াছিল। অলোকনাথ ন্যায়ভূষণের সহযোগিতায় রাধামাধব আরব্য উপন্যাসের গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭৬)। প্রণয়ঘটিত আখ্যায়িকা কাব্য। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ হইতেছে বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত ‘স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ’ (১৮৬৩), ‘বিধবা মনোরঞ্জন নাটক’ (১৮৫৬-বিস ১৮৭৭)। রাধামাধব মিত্র দীর্ঘজীবী ছিলেন (১৮২৫-১৯২১)।” সুকুমার বাবু রাধামাধবের কবিতাবলী পাঁচখণ্ডের প্রকাশ কাল সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা নিয়ে অবশ্য পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক সুধীর কুমার মিত্র দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন। সুধীর মিত্রের মতে তাঁর (রাধামাধবের) ‘কবিতাবলী’ ২য় ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ) একখণ্ড আমার নিকট আছে, উহার ভূমিকা হইতে ২য় ভাগের প্রকাশকাল ‘২৭শে শ্রাবণ ১২৬৮’ বলিয়া লেখা আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা ১২৬৮ সাল ইংরেজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইবে। প্রথম ভাগ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। রাধামাধব মিত্রের কবিতা ও নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন এবং ঐতিহ্যবাহী হিন্দু-অলংকারের নিপুণ ব্যবহার। আবার তিনি কবিতার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক স্থানের কথা তুলে ধরেছেন তাও আমাদের পরম প্রাপ্তি।

শারদীয়ার পত্র

মনীষা পাত্র

পথ চলতে ভোরের শিশিরে ভেজে দুই পা
কিছু বলতে শিউলির গন্ধে ভাসে সর্ব গা
কাশের বনে দোলা দিয়ে যায় উত্তুরে হাওয়া
ওরা কজনে যাচ্ছে পথে ওইয়ে দূরে ঢাকি বওয়া।
সন্ধ্যাবেলা এ পাড়াতেও বাজবে ঢাকের বাজনা
মনের ভেলা ভাসিয়ে দিলাম, যা কেনো তুই যাস না!
পদ্ম পাতায় আঁচড় কাটি আকিবুকি বুঝবে কে?
পদ্ম কাটায় রঙে লেখা পত্রখানি পড়বেই বা কে?
ভোরের আলো গা ভেজালো, দেখছি আকাশ চেয়ে,
পেজা তুলো যাচ্ছে উড়ে আমার পত্রখানি নিয়ে
পত্রে আছে মা আমার তুমি এসো হাসিমুখে
তোমার কাছে প্রার্থনা মোর, এ বিশ্বসংসার রেখো সুখে।
আর্তি আরও তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে,
যেন ওরাও ভালো থাকে যারা ব্যস্ত ঘর পোড়াতে।
তুমি ওদের বুদ্ধি দাও, শুভত্ব দাও, দাও সুমতি
তুমি যাদের প্রলয়ে নিয়ে গেছ, তাদের প্রিয়জনে করো গতি।।

বাবুঘাট, বাবুরোড, ইডেন গার্ডেন

ডা: দুলাল কৃষ্ণ দাস

বাবু রাজেন্দ্র দাসের নামানুসারেই ঘাটটির নাম হয়েছিল 'বাবুঘাট'। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রানী রাসমণির পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাবামায়ের মৃত্যুতে মেয়েদের কিছু পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। সেই কাজেই রানী রাসমণিকে গঙ্গা ঘাটে যেতে হয়েছিল। বাবুঘাট এলাকায় তখন গঙ্গা ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাই অতি কষ্টে চরম দুরাবস্থায় বাবার ক্রিয়াকর্ম সারতে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সেই সব কাজে কী রকম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সেটাও হৃদয় দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের সঙ্কট মোচনের জন্য বাড়িতে ফিরে স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গঙ্গায় একটা ঘাট তৈরি করে দিতে। স্ত্রীর অনুরোধে রাজচন্দ্র এব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু সরকারি অনুমতি না মেলায় কাজ শুরু করতে পারেননি। তখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩ – ১৮২৮)। তিনি জনহিতকর কাজে তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না। তাই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত কাজ শুরু করা যায়নি। এরপর বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক (১৮২৫ – ৩৫)। তাঁর অনুমতি নিয়ে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বাবুঘাটের কাজ শুরু হয়। শেষ হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। বেন্টিন্‌ক সাহেবই সেটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু বর্তমানে এর ঠিক বুকুর উপর দিয়ে চক্ররেল চালিয়ে রেল কোম্পানি নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কাজ করেছেন। ফলে ২০০ বছরের পুরানো এই ঐতিহাসিক হেরিটেজ ভবন এবং ঘাটটির আজ অবলুপ্তির সূচনা হয়েছে।

বাবুঘাট নির্মাণের পর জানবাজার থেকে বাবুঘাট যাতায়াতের জন্য একটি রাস্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইডেন গার্ডেন সহ এই এলাকাটা তখন গোবিন্দপুর মৌজার মধ্যে ছিল এবং রাজচন্দ্রের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত তিনি একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা তৈরি করেন। রাস্তাটি ১০০ ফুট চওড়া ছিল এবং নামকরণ করা হয়েছিল 'বাবু রাজচন্দ্র দাস রোড'। কিন্তু পরিতাপের বিষয় নিজের টাকায়, নিজের জায়গায় রাস্তা করেও নিজের নামে তা ধরে রাখতে পারেননি। অবশেষে ১৯৬০ সাল থেকে তারই কিছু অংশ এখন 'রানী রাসমণি এভিনিউ' নামে পরিচিত। অনেকে ভুল করে একে 'রানি রাসমণি রোড' বলেন। 'রানী রাসমণি রোড' আসলে জানবাজারের কাছে একটি ছোট রাস্তার নাম।

ইডেন গার্ডেন

আজকের ইডেন গার্ডেনের রচয়িতা এবং মূল মালিক ছিলেন রাজচন্দ্র। বাবুঘাট নির্মাণের পরেই রাজেন্দ্র দাস বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি মনোরম উদ্যানের পরিকল্পনা করেন। সেই মতো কাজও শুরু হয়। চলছিলও তার মৃত্যুর

আগ পর্যন্ত (১৮৩৬)। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড অকল্যান্ড ইডেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। জানা যায় এদেশে এসে প্রথমেই তিনি রাজচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। পরে উভয় পরিবারের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গে আসেন তার দুই ছোট বোন। এমিলি ইডেন এবং ফেসি ইডেন। ইডেন ছিল তাঁদের পারিবারিক পদবি। বোনেরা খুব প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। লাটভবনেই (রাজভবন) তাঁরা থাকতেন। লাটভবন সংলগ্ন ওই বাগানটি ইডেন ভগিনীদ্বয়ের চিত্ত বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রাণী রাসমনির তৃতীয় কন্যা করুণাময়ী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ইডেন পরিবার তাঁর চিকিৎসার কাজে খুব সাহায্য করেছিলেন। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রানী রাসমণি ইডেন ভগিনীদ্বয়কে বাগানটি ব্যবহারের জন্য দান করেছিলেন। শোনা যায়, কথা ছিল তারা দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বাগানটি ফেরত দিয়ে যাবেন। হয়ত এমিলি ইডেন বাগানটির আরো কিছু উন্নতি সাধন করে থাকতে পারেন। কেন না তিনি বাগান করতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁরা কয়েক বছর এখানে ছিলেন। তারপর তাঁরা দেশে ফিরে গেলে (১৮৪২) বাগানটির আর তেমন কোন পরিচর্যা হয়নি।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন (১৮৪৮ - ৫৬)। তিনি এসে উদ্যানটির আধুনিকীকরণ করেন এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এর নামকরণ করেন 'ইডেন গার্ডেন'। সেই থেকেই একে আমরা ইডেন গার্ডেন বলে চিনি। নাম ইডেন গার্ডেন হলেও এর নির্মাণ শৈলীতে হিন্দুদের মঙ্গলিক চিন্তাবলি এখনো বর্তমান। যার থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না এর নির্মাতা কোন হিন্দু ছিলেন। আমাদের দুঃখ এই যে এসবে আজ আর রাসমণি বা রাজচন্দ্রের কোন নামগন্ধ নেই। কিছুদিন আগে ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত রানি রাসমনির জন্ম জয়ন্তীতে দাবি উঠেছিল 'ইডেন গার্ডেন' এর নাম রানি রাসমণির নামে ফিরিয়ে দেও। সেই মঞ্চ থেকে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 'ইডেন গার্ডেনের' নাম আন্তর্জাতিকভাবে যে স্তরে পৌঁছে গেছে তাতে করে তার নাম পাল্টে দেওয়া অনেক অসুবিধা জনক। তবু প্রশ্ন থেকে যায় একটা দেশের রাজধানীর নাম যদি পাল্টানো যায়, তাহলে একটা স্টেডিয়ামের নাম পাল্টাতে কতটুকু অসুবিধা হবে? স্টেডিয়ামের কথা মেনে নিও বলা যায় - উদ্যানের নামটা তো রানি রাসমণির নামে করা যেতেই পারে। আসলে সমস্যাটা আভিজাত্যের। যেমন 'ধর্মতলাকে' ধর্মতলার পরিবর্তে 'এসপ্লানেড' বলতে বেশি গর্ব বোধ করি।

তবু সান্তনা কার্জন পার্কের একটি অংশ 'লোকমাতা রানী রাসমণি উদ্যান' নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেখানে দক্ষিণেশ্বরের 'লোকমাতা রানী রাসমণি ফাউন্ডেশনের' উদ্যোগে রানি রাসমণির একটি মূর্তি বসানো এবং প্রতিবছর ১১ আশ্বিন রানি রাসমণির ভক্তরা সেখানে তাঁর জন্মদিন পালনে মিলিত হয়ে থাকেন।

কথা কও হে অতীত

তন্ময় ভট্টাচার্য্য

হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটেতে অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন কালীপূজোর সময় প্রাণী হত্যা করে কোন বলি হয় না। কিন্তু কেন? কি ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে এর পেছনে? ইতিহাস বা স্থানীয় জনশ্রুতিই বা কি বলে? ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে একটা মালা গাথার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিচের এই লেখাটি। লেখাটি তথ্যভিত্তিক ও জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। আগ্রহী পাঠকরা, পড়ে দেখতে পারেন, আশা করি ভালো লাগবে। ইংরাজি ১৮৮২ সাল। ব্রিটিশ অধীন ভারতবর্ষের এক ছোট জনপদ হালিশহর। তৎকালীন হালিশহরের কিছু সুসন্তান ১৮৮২ সালের এক পূর্ণিমা রাতে প্রতিষ্ঠা করল হালিশহর পূর্ণিমা ব্রত সমিতি। এই সমিতির কাজই ছিল নানারকম দেশহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করা। ১৮৮৩ সালে তৎকালীন হালিশহর হিতৈষিনী সভার (স্থাপিত : ১৮৫৪ সাল, বর্তমানে যেটি হালিশহর গুডউইল ফেটারনিটি নামে পরিচিত) এক অধিবেশনে সমিতির সদস্যরা ঠিক করলেন ইতিহাসের স্বার্থে রামপ্রসাদ ভিটা বা প্রসাদপীঠ পুনরাবিষ্কার হওয়া একান্তই প্রয়োজন। অভিভাবকদের নিষেধ উপেক্ষা করেও তারা রামপ্রসাদের সাধনপীঠ ও পঞ্চাবটি আবিষ্কার করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। শিয়াল ও সাপ তাড়িয়ে রামপ্রসাদ ভিটের জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়।

১৮৮৫ সালে ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস বসু, জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রমুখ যুবকেরা স্থির করেন শ্যামাপূজার নিশিরাতে রামপ্রসাদ ভিটেতে নতুন করে কালীপূজো করবেন। আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় রুখে দাঁড়ান হালিশহরের বয়স্ক মানুষেরা। কিন্তু তাদের অদম্য জেদের কাছে হার মানে সকল প্রতিবন্ধকতা। এবার সমস্যা হল পূজোর জন্য পুরোহিত খুঁজে পাওয়া। হালিশহর, ভাটপাড়া এমনকি সুদূর নবদ্বীপের কোন পন্ডিতরাও রাজি হলেন না রামপ্রসাদ ভিটেতে মায়ের পূজো করবার জন্য। তখন যুবকেরা স্থির করলেন রামপ্রসাদের ভিটায় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে তারা নিজেরাই পুঁথির মন্ত্রে পূজো না করে প্রাণের মন্ত্রে মায়ের পূজো করবেন। পূজোর সমস্ত আয়োজন হলো। প্রসাদের পঞ্চাবটি তলে নারকেল পাতার

ঘরে প্রতিমা স্থাপন করা হলো। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! ঐদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু হলো প্রবল ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দুর্যোগ। ঝড়ে উড়ে গেল নারকোল পাতার ঘর, বৃষ্টিতে ভিজে গেল প্রতিমা, পূজোর সমস্ত আয়োজন লন্ডলন্ড হয়ে গেল। প্রতিমা নিয়ে সকলে আশ্রয় নিলেন ভিটের পাশেই হরিশ বাগদির চালা ঘরে। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত চলল সেই ঝড় বৃষ্টি। বৃষ্টি থামলে গভীর রাতে নতুন করে শুরু হলো পূজার আয়োজন। রাত আন্দাজ দু'টোর পর শুরু হলো পূজো। পুরোহিতের আসনে বসলেন সাহসী যুবক হরিনাথ ভট্টাচার্য। মায়ের কি অপূর্ব লীলা! পূজোর শুরুতেই প্রতিমার বেষ্টনী দিতে গিয়ে দেখা গেল সুতোর লাটাই নেই। কোথা থেকে এক জনৈকা স্ত্রীলোক এসে লাটাই দিয়ে গেলেন। বিষয়টি কেউই লক্ষ্য করল না। আবার প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেল দর্পণ আর বরণডালা নেই। আবার সেই স্ত্রীলোক এসে দর্পণ ও বরণডালা জুগিয়ে দিয়ে গেল। এবারও কেউ লক্ষ্য করলেন না। কিছু পরে আবারও দেখা গেল পূজোর জন্য তিল নেই। তৃতীয় বারের জন্য যখন সেই স্ত্রীলোক এসে তিল জুগিয়ে দিয়ে গেলেন পুরোহিত হরিনাথ ভট্টাচার্য গভীর রাতের অস্পষ্ট আলোয় ঘোমটা পড়া সেই স্ত্রীলোককে দেখে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে কোনো রকমে তিনি আবার পূজোয় বসলেন। এবার হবে বলিদান। বলির জন্য গাছের ডালে বাধা ছিল এক ছাগ শিশু। কিন্তু কি আশ্চর্য! গাছের ডালে বুলছে ছাগ শিশুর গলার দড়িটি শুধু! অনেক খুঁজেও আশেপাশে কোথাও সেই ছাগ শিশুকে পাওয়া গেল না। হরিনাথ ভট্টাচার্য বুঝলেন সকলি মা জগদিশ্বরীর কৃপা! তিনি চান না অকারণ প্রাণী হত্যা। তাই ছাগ শিশুকে তিনিই মুক্তি দিয়েছেন। এরপরে নির্বিঘ্নেই পূজো সমাপ্ত হলো। ১৮৮৫ সালের সেই অতিপ্রাকৃত অলৌকিক রাতের থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত রামপ্রসাদ ভিটায় মায়ের পূজো হয় সন্ধ্যায় নয়, নিশীথ রাতে, আর হয়না কোন প্রাণী বলিদান।

মেঘ ছাগল মহিষাদি কাজ কী রে তোর বলিদানে।

তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দেও ষড় রিপুগণে।

দেবী দুর্গা – অন্য রূপে অন্য নামে

শুভ্রাংশু মিত্র

সাল ১৭৫৫ বর্তমান হালিসহর ছিল তন্ত্রসাধনার একসিদ্ধ পীঠ। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের প্রভাবে তৎকালীন সময় ছিল তন্ত্রসাধনার এক অন্যতম পীঠস্থান। সেই সময় বিরাচারী তান্ত্রিকেরা প্রায়শই আসতেন হালিসহরে। ওই সময় পরপর দু-তিন বছর অল্প বৃষ্টি তথা অনাবৃষ্টি চলতে থাকে। যখন সাধক কবি গান লিখছেন

“অন্য দে মা অন্য দে “

“মন রে কৃষিকাজ জানো না” ইত্যাদি

সেই সময় বহু তান্ত্রিকের মধ্যে একজন পরামর্শ দেন প্রকৃতির এই রুদ্ধরোশ থেকে মুক্তির জন্য ভৈরবীতন্ত্রে বর্ণিত পঞ্চদুর্গার অন্যতম দেবী “রুদ্ধভৈরবীর” আরাধনা করতে। তাঁরই পরামর্শক্রমে ওই বছরই হালিসহরে ‘রুদ্ধ ভৈরবী তলায়’ শুরু হয় “রুদ্ধভৈরবীর” আরাধনা। এরপর কয়েক বছর পরেই আসে ৭৬ এর মন্বন্তর। বঙ্গাব্দ (১১৭৬)।

শোনা যায় তখন এই বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি চরমতম অবস্থায় পৌঁছায় কিন্তু এই অঞ্চল সেই অনাবৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পায়। এই ঘটনার প্রায় শতবর্ষ বাদে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত আনন্দমঠে সন্তান সম্প্রদায় ‘দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের’ জন্য নিজেদের আত্মিক শক্তি জাগানোর জন্য হালিসহরে আসতেন। এবং তাঁদের আনুকূল্যে এই দেবী পূজার প্রসার ও প্রচার লাভ করে। কিন্তু কালের নিয়মে অন্যান্য স্থানে এই পূজার প্রচলন ক্রমশ হ্রাস পেলেও আজও এই স্থানে প্রতিবছর ‘অরণ্য ষষ্ঠী’ ‘জামাইষষ্ঠী’ থেকে দশমী’ পর্যন্ত ‘রুদ্ধভৈরবী পূজা’ সারম্বরে পালিত হয়।

দশভূজা দেবী শিবের নাভি পদ্মের উপর উপবিষ্টা। দেবীর দশ হাতে ত্রিশূল, খর্গ, ডমরু, তীর, ধনুক, জপমালা, পাস, গদা, অঙ্কুশ, এবং পুস্তক শোভা পায়।

উদিত সূর্যের লাল আভার মত দেবীর গায়ের রং। দুপাশে দুজন সখি। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য - অষ্টমীর দিন পাঠ হয় ‘রুদ্ধ চণ্ডী’ নববীতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ১৩৮ টি নীল অপরাজিতা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। তন্ত্র মতে পূজা হলেও এই পূজায় কোন বলি প্রথা নেই সমস্ত পুজো হয় বিরাচারী তান্ত্রিক মতে। এই পূজা জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের নামেই সংকল্প করা হয়ে থাকে। প্রয়াত শিবকুমার ভট্টাচার্য এই পূজার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন এবং সেই মতো আজও বর্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় এই দেবীর আরাধনা নিষ্ঠা সহকারে করে চলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বহু মানুষ এই পূজায় মানত করে তাঁদের কাম্যকাজ ফল লাভ করেছেন।

আগমনীর প্রাক্কালে

ভাস্কর মজুমদার

মায়ের আগমন আর কটা দিন পরে, প্রতীক্ষার প্রহর গোনা
আশ্বিনের দ্বারপ্রান্তে তবু প্রকৃতি আজি উদাসী, আনমনা।
মাঠে মাঠে কাশের দোলা সেরকম লাগেনি এখনো
ঘাসফুলের নরম তোলা ফোটেনি তো এখনো।
আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা, শ্রাবণের মতো ধারা
বৃষ্টি যেন ছাড়ে না পিছু, অবিরল, বরবর বরা।
শরতের নীলাকাশ কোথা, কোথা সেই শুভ্র মেঘের ভেলা
এ কেমন খেলা তব প্রকৃতির, এ কেমন অপরূপ নীলা, খেলা!
কাদা-জলে পথ ঘাট ভরা, মাঠ প্যাচপ্যাচে স্যাঁতসেঁতে
তবু হৃদয় কেন নাচে, কোন অজানা আনন্দেতে?
বাতাসে ভাসে ঢাকের আওয়াজ, দূর হতে ভেসে আসা
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠে জাগে মনে নতুন আশা।
কুমোর পাড়ায় ব্যস্ততা, প্রতিমায় পড়ছে মাটির প্রলেপ
তুলি হাতে শিল্পী আঁকছে চোখ, দিচ্ছে শেষ রঙের প্রক্ষেপ।
প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে বাঁশের খুঁটি, চলছে জোর কদমে কাজ
বৃষ্টি ভিজিয়ে দিলেও থামে না, শিল্পীর হাতে সাজে সাজ।
তবু পুজোর গন্ধে মন আজি মাতোয়ারা, উতলা, বিভোর
শিউলির গন্ধ না পেলোও, মন খুঁজে ফেরে আগমনীর ভোর।
মা আসছেন, এই আনন্দেই সব বাধা হয় যে জয়
অবিরাম বর্ষণেও তাই মনে জাগে না কোনো ভয়।
মা আসবে, ধুয়ে যাবে যত গ্লানি, যত জরা, যত কালো
মায়ের আলোয় ভরে উঠবে এই ধরা, হবে যে আলো।
প্রকৃতির এই খেলালীপনা, এও যে মায়েরই এক খেলা
মা আসছেন, তাই তো আজি বসেছে খুশির মেলা।

মুক্তি

মিলন কুমার ঘোষ

সুখসাচ্ছন্দ্যের শয়্যা দেবো

লাল পরি, নীল পরিরা স্বপ্ন দেখালে

কনে দেখা মেঘের দেশে শয়্যা বিছালে

হায়! সে যে ভীষ্মের শরশয়্যা

বুববো কেমনে!

রামধনু রঙ মেখে গোলাম হংস বলাকার কাছে

সুখ পাওয়া যাবে?

শ্বেতশুভ্র হাসি হেসে বললে

সুখ তো সব বিলিয়ে দিয়েছি

দুঃখ আছে নেবে?

যতন করে দেবে?

আহা! এত সরল এত পবিত্র কথা

এত আপন করে কেউ তো বলে নি আগে।

দাও দাও যত পারো দুঃখ দাও

নেব অঞ্জলি ভরে।

সুখের শর শয়্যার কাঁটা খুলে নাও

দুঃখ ভেলায় সাগরে ভাসিয়ে দাও

ভাসতে ভাসতে আমি ঠিক পৌঁছে যাবো

মুক্তির ত্রিবেণী সঙ্গমে

একটু অন্য ভাবনা

সুবোধ দেবনাথ

লিখতে চাই অনেক কিন্তু ভাবতে পারি কই!

লিখতে লিখতে ক্লান্ত এখন শেষ হয়নি বই

তেত্রিশ বছর লিখছি আমি কলম-কালি বেশ

হাজার হাজার লেখা বাকি হয় নি আজও শেষ।

ভাবতে ভাবতে বেলাশেষে দেখি কয়েক পাতা বাকি

অন্ধকারেও তুলি নিয়ে স্বপনে ছবি আঁকি।

নেপাল জুড়ে কান্না এখন কারণ নাকি চীন

পাশের প্রতি অত্যাচার বাড়ছে দিন দিন।

ধর্ম কর্ম করে কি হবে? প্রাণ যদি যায়

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

আমরা সবাই নীরব থাকি কারণ আছি ভালো

কত শত ভবিষ্যৎ! জ্বলতো বহু আলো।

ভোটের দামামা বাজেনি এখনও পড়ে আছে কতো লাশ

অন্যের প্রাণ নিয়ে যারা মেটায় আর্তি-আশ।

ওদের আছে ডি.এফ - ছাব্বিশ এবং দাদাগিরি

পরমাণু বোমারু হস্তিভি দেখায় নীচের সিঁড়ি।

একুশ শতকেও দুর্ঘটনা! অভয়া হাথরস হয়

দিল্লী বাসে একা মেয়ে সাতচল্লিশ এর ভয়।

কেউ ভালো নেই, আমি- তুমি চাই সকলের মঙ্গল

কৈলাশে পুণ্য হবে জানি, আগেই যোড়গোল।

কোশি জলে পড়লো পুণ্যার্থী শত শত লাশ ভাসে

একটু পরেই হাফাকার বাতাসে গন্ধ আসে।

ভালো নেই রাস্তা নদী, ভালো নেই সকল গাছ

মৎস্যন্যায় চলছে এখনো মরছে অনেক মাছ

অরণ্য সপ্তাহ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ সবই আমরা জানি

হেলমেট পরো, জীবন বাঁচাও, ট্রাফিক নিয়ম মানি?

বিদ্যালয়ে মাঠে একটি গাছ লাগাও মায়ের নামে বৃক্ষরোপণ

অসাধারণ উদ্যোগ প্রাণ থেকে প্রাণে

কলুষ মুক্ত পৃথিবী গড়তে নিজের বিবেক জাগাও

দাবদাহে ভালো থাকতে প্রচুর গাছ লাগাও।

ভালো থাক কাশ্মীর ভালো থাকুক নেপাল

ভরতবর্ষ ভালো থাকো, রহিম এবং গোপাল।

হালিসহর আনন্দম

পদক্ষেপ

ড.সীমা রায়

তুমি হবে ছায়াঘেরা নদী পাড়ের বৃক্ষ!
যে দাঁড়িয়ে থাকে যুগের পর যুগ—নিশ্চল, অপেক্ষায়।
আমি বয়ে যাব তোমার পাশ দিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে-
মাটি আর ঘাসে সমৃদ্ধ করে আমার দুইপাশ,
আর আমি নীরবে দেখে যাব তোমার রূপের প্রাক-উচ্ছ্বাস।
আমি নদী হতে চাই-তুমি হইয়ো নদী পাড়ের বনস্পতি,
দেখা হবে অবশেষ তোমার ছায়ায় নেব বিশ্রাম
জোয়ারের সময় স্পর্শ করব তোমার বলিষ্ঠ মূল।
ভাটার দিনে যখন আমার জল সরে যাবে দূরে,
তোমার শিকড় আঁকড়ে ধরবে মাটির গভীর তলদেশ,
যেন কোনো ঝড় আমাদের সম্পর্কের দূরত্ব বাড়াতে না পারে।
তারপর আবার যখন জোয়ার আসবে গর্জে,
আমি ছুটে এসে ভাসিয়ে দেব তোমার আপন কাণ্ড।
জলের স্পর্শে জেগে উঠবে তোমার ঘুমন্ত শাখা-প্রশাখা।
শরতে তোমার পাতার খসখস ধ্বনি হবে আমার গান,
গ্রীষ্মে তোমার নিবিড় ছায়া হবে আমার শীতল বিছানা।
আমি সাগরের দিকে বয়ে যাব, তাতে দুঃখ নেই,
কারণ আমি জানি-আমার প্রতিটা ডেউয়ের স্মৃতিতে তুমিই একমাত্র আশ্রয়।
মৃত্যু বা বিলীন হওয়ার দিন যদি আসে,
তবে যেন তোমার ঝরে পড়া শেষ পাতাটি ভেসে যায় আমারই স্রোতে!

হালিসহর আনন্দম

আষাঢ়

গোপা দেবনাথ

কে হও তুমি

কৌশিক মন্ডল

আষাঢ়ের থৈ থৈ জল, করে কল্ কল্
দুর্গতিতে নাজেহাল বেহাল শহর
বিকল যানবাহন বন্ধ চলাচল
তরী তাই বয়ে চলে রাস্তার উপর।
আকাশের মুখ ভার, বোঝা বড় দায়
রিমঝিম্ রিমঝিম্ জলে একাকার
ব্যাঙেরা একটানা সুর করে গায়
নিশিদিন ঘরে বসে ভাবনায় ভার।
আগামীতে কি যে হবে ভেবে দেখো তাই
আশার আলোতে ভরে যেন স্বপ্নলোক,
মহাকাল প্রতীক্ষায়, আমি যাহা চাই,
যদি যেতে হয় তবে কোরো নাকো শোক।
নীতি নীতি পল্ যায় মন নাই কাজে
ঘোমটায় মুখ ঢাকা নববধূ লাজে।

একটু ভালো থাকার আশায়
যতবার তোমাকে ছুঁতে গেছি,
ততবার দাঁত নখ দিয়ে থিমচে
আমার সমস্ত শরীর মনকে করেছে রক্তাক্ত।
তবুও সব আঘাত নিঃশব্দে বুকে চেপে
তোমার কাঁধে রেখেছি হাত।
তোমার খুতনিতে রেখেছি ঠোঁট।
কারণ তোমার মায়াবী শরীরের গন্ধ..
তোমার মুখের আঁজলা আঁজলা হাসি..
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত গর্জন..
কাজল লতার মত দু'চোখ..
মেঘলা আকাশের মত ডাক..
সূর্যের মতো তেজ..
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
আমাকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে।
জানি না তুমি আমার কে হও?
হয়তো কোন হিজলময়ী নারী
কিংবা নারীরূপে প্রেমিকা!

কিশোর বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

ড.অমৃতলাল বিশ্বাস

"টুকরো টুকরো করে ছেড়ো তোমার অন্যায় আর ভীৰুতার কলঙ্কিত কাহিনী। শোষণ আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।" ব্রিটিশ রাজ এবং সামাজিক অভিঘাতের বিরুদ্ধে একই রকম বিদ্রোহী অবস্থানের জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে তরুণ নজরুল এবং কিশোর বিদ্রোহী কবি নামে ডাকা হতো। কবির পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন কলকাতার সুনীতা দেবীর সঙ্গে। সুকান্ত নবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুনীতা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান। ১৯২৬ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় মাতুলালয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মৃত্যু দারিদ্রের করাল গ্রাসে, যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা লেখার প্রেক্ষাপট ছিল তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তর এবং পরাধীনতার অনুশোচনা। অভাবে তাড়না, ক্ষুধার জ্বালা এবং দারিদ্রের ভয়াবহতা কবিকে অষ্টোপাসের মত গ্রাস করে। সেই গ্রাস থেকে কবি মুক্তি না পেলেও তাঁর লেখনীর আলোকবর্তিকার আভায় হতাশার আঁধারে নিমজ্জিত মানুষ খুঁজে পায় মুক্তির পথ।

সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় প্রবল প্রতিবাদ পাঠক মহলে অনুপ্রেরণার জোয়ার আনে। যে জোয়ারে পৌঁছে দেয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি প্রতিভার তরীখানি নিরাপদ কিনারে। কবির উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল-- 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'মিঠে কড়া' (১৯৫১), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'ঘুম নেই' (১৯৫৪), 'হরতাল' (১৯৬২), 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫)।

অফুরন্ত মেধা আর মননের জোরে স্বল্পকালীন জীবনে কবি সুকান্ত বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবির পরিণত ভাবনায় তার বয়সের থেকেও কয়েক যোজন এগিয়ে ছিলেন। তাঁর কবিতা প্রকৃতপক্ষে গণআন্দোলনের সংগ্রামী মানুষের চিন্তাচেতনার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতায় বিলীন। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য "ছাড়পত্র" কবিতায় লিখেছেন-----

"চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, / প্রাণপনে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল / এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি / নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

অষ্টমী

শ্রীমন্ত দাস

শিউলি ফুলের পশরা নিয়ে

অষ্টমী তুই চললি কোথা?

বেরোবি না ঘুরতে মেলায়

বাঁধবি না আজ রঙীন ফিতা?

জানিস না তুই অষ্টমী আজ?

মহামায়ার বড় পূজা, ষষ্ঠী যাবে সপ্তমী ও

দেখবে ঠাকুর করবে মজা।

নাগর দোলায় দুলবে তারা বেলুন পুতুল সবই নেবে,

ঢুকবে তারা সার্কাসেতে মস্তি করে ফুচকা খাবে।

বললো কেঁদে তারা গরীব, ফুল বেচে কিনবে খাবার,

পথ্য কেনার পয়সা পায় নি, আবার জ্বরটা ফিরছে বাবার।

মা নেই তার, গত সনে অতিমারী নিয়ে গেছে,

বাবা মেয়ে দুটি প্রাণী কোনক্রমেই বেঁচে আছে।

বাঁচিয়ে শিউলি ফেরার সময় দেবে পায়ে পুষ্পাঞ্জলি,

বলবে- "মা গো বাঁচালি যদি তবে কেন দুঃখ দিলি"?

লোভ লালসার পরিণতি

চন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আমাদের রক্ত - মাংস শরীরে সাধারণ মানুষ মাত্রই স্বার্থ, লোভ, লালসা, থেকেই যায়। এর জন্য ধন-সম্পত্তির ভোগ লালসায় মত্ত হয়ে সৌন্দর্যের মোহে অন্ধ তার পিছনে সর্বদা ছুটে বেড়াই। এটাই মানুষের চারিত্রিক ধর্ম। এই বিষয়ে একটা ছোট গল্পের মাধ্যমে আলোকপাত করলাম।

একদিন এক কৃষক তার নিজের জমিতে যখন লাঙল দিয়ে জমি কৃষণ করতে ব্যস্ত। ঠিক সেই সময় এক লাভণ্যময়ী নারী বলতে যেটা বোঝায় সেই রূপ দেখে কোন মানুষ চোখ সরাতে পারবে না। এতটাই সুন্দর, দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গের থেকে কোন অঙ্গরা মর্তে উপস্থিত হয়েছে। এই রূপে যে কোন বয়সের পুরুষরাই তাকে কাছে পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে।

সেই সুন্দরী কৃষকের সামনে বলল- আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই। কৃষক তার রূপের মোহে অন্ধ হয়ে তক্ষণাৎ সম্মতি জানায় এবং এই বিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করতে উদ্যত হলো। সুন্দরী তখন মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে। পুরোহিতও ঐ নারীর রূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে সে কৃষককে সরিয়ে দিয়ে নিজেই বিবাহ করতে চাইল। এদিকে কৃষক-পুরোহিতের কথা শুনে সে এই সুন্দরীকে ছাড়তে নারাজ। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। যেটা পরবর্তী সময়ে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়ে ওঠে।

সুন্দরী নারী এই কাণ্ড দেখে তাদের নিয়ে এর সুবিচারের জন্য বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয় এবং তার কাছে এর সুবিচারের প্রার্থনা করে।

বাদশাহ তাদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ সুন্দরীর কাছ থেকে শুনে সেও রূপ মোহিত হয়ে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই বিয়ে করতে চাইল। এতে কৃষক ও

পুরোহিত দুজনেই রাগান্বিত হয়ে বাদশাহের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে। বাদশাহ তাদের দুজনকে তাচ্ছিল্যের ভাব সরিয়ে বলে আমি এই রাজ্যের বাদশাহ অতএব আমি যা চাইব, সেটাই এখানে হবে। তিনজনেই যখন এই সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাইছে, তখন এই সুন্দরী নারী কোন উপায় না পেয়ে বলে- আমার একটা শর্ত আছে। শর্তটা হ'ল- আমি এখান থেকে দৌড়াতে শুরু করব- যে আমাকে ধরতে পারবে, তাকেই আমি বরমাল্য পরাব।

কৃষক, পুরোহিত, বাদশাহ তিনজনেই সুন্দরীর শর্তে রাজী হয়ে দৌড়াতে শুরু করল। এদিকে এই সুন্দরী এতটাই দ্রুত দৌড়াচ্ছে যে, তাকে ধরা তাদের সাধ্যের বাইরে। তবে কেউই চায় না এই প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করতে।

কিছুক্ষণ এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে প্রথমে কৃষক হাঁফিয়ে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে যায়। পরক্ষণে পুরোহিতেরও এই এক ই অবস্থা ঘটে। শুধুমাত্র প্রতিযোগী হিসেবে বাদশাহ থেকে যায়। বাদশাহ তখন বলে - হে সুন্দরী এবার এবার তো তোমাকে বিয়ে করার জন্য আর কোন প্রতিযোগী রইল না। তাহলে এসো আমরা দুজনে বিয়ে করি, সুন্দরী বলল- না। এত সহজে আমি ধরা দেব না। এই বলে আবার সে দ্রুত ছুটতে থাকে। বাদশাহ ও তার পিছনে ছুটতে থাকে। অনেকক্ষণ পর ছুটতে না পেরে হাঁফিয়ে গিয়ে বলল - সুন্দরী আমি আর তোমাকে ধরতে পারব না। তুমি তোমার অভিপ্রায়টা আমাকে জানাও।

তখন এই রূপমোহিনী সুন্দরী বলে - আমি হচ্ছি তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই ধন সম্পত্তি, যার লোভে ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে লালসায় ছুটে চলেছ। স্বার্থ লোভ, লালসায় অন্ধ হয়ে যারাই আমার স্পর্শ পেতে চায়, তাদেরই এই অবস্থা ঘটবে। অতএব লালসায় মত্ত হয়ে ছুটে না বেড়িয়ে নিজের যতটুকু যা আছে সেই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আঁচড়ে ক্ষত হৃদয়

সুজিত বালা

হৃদয়টা স্মৃতির আঁচড়ে ক্ষত
সাত রঙের টানে আক্রান্ত
দোষ ত্রুটি নিজের মনে করে
মুচকি হেসে সয়েছি আঘাত।
প্রতিবাদ প্রতিরোধ করিনি কখনো
যদি চলে যায় আমাকে ছেড়ে
লাল রঙের আঘাত গোলাপের পাপড়ি
মনে করে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলাম।
তবুও যখন চলে গেলে
সাত রঙের দাগ গুলো
কেনো মুছে দিয়ে গেলে না?
সাদা বোর্ডে অন্য কেউ তো দাগ কাটতে পারতো।

একটা শব্দ

সুভাষ চন্দ্র বসু

একটা শব্দ কেড়ে নিল সব রঙিন স্বপ্ন।
একটা শব্দ দাঁড় করিয়ে দিল আসামীর কাঠগড়ায়।
একটা শব্দ লক্ষ লক্ষ প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে,
উত্তরের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল।
একটা শব্দ দূরত্ব তৈরি করল লক্ষ কোটি আলোকবর্ষের।
একটা শব্দ, বাস্তবকে উপলব্ধি করার আগেই,
সত্যকে গলা ধাক্কা দিয়ে মিথ্যাকে কোলে তুলে প্রলয় নৃত্য শুরু করল
একটা শব্দ কত রঙিন স্বপ্ন, কত আলো, কত আকাঙ্ক্ষাকে,
দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করে দিল!

পার্কস্ট্রীটের মা
আশিস্ ভট্টাচার্য্য

শিশুটি জানেনা তার মায়ের শরীরে কত তরল সুধা আছে?
জানে না সে অনাথিনীর আঁচলে কত ছিদ্র
বিবর্ণ পোশাকের আড়ালে তবু চায় বাঁচার তরল সুধা
কোলাহলের শিখায় জাগে সুধাভরা আহার।
নির্বাক পথচারী হেঁটে যায় বিবর্ণ বাহার দেখে
লোনাধরা জীবন জানে না চৌরাস্তার ভীড়
সংসার আগলে এগিয়ে যায় জীবন
সূর্যের আলোর নীচে, তারাভরা জ্যোৎস্নার কোলে
শিশুর তরলসুধা ফুটে ওঠে ব্যস্ত শহর মাঝে।
একদিন সব ছিল ঘর ও দুয়ার, বাঁধানো উঠোন
অতল নিকষে গেছে সোনার সংসার
জেগে আছে হাড়মাস ফুটপাতের ঘর
বিবর্ণ রাত বিমানো শরীর খোঁজে দিনের আহার।

সত্যি কথার মার নেই

গৌতম ভৌমিক

সবার কাছেই আমি খারাপ, কেন? আমি মুখের উপর সত্যি কথা বলতে পারি। সবার ভুলটা ধরতে পারি। নিজের ভুলটা সবার সামনে স্বীকার করতে পারি। ছোটদের থেকেও শিখতে পারি। ওদের সাথে মিশতে পারি। বসের মুখের উপর না বলতে পারি। চায়ের ঠেকে আড্ডায় বসতে পারি না। ওখানকার ভুলে ভরা আলোচনা নিতে পারি না। আমার রুচিতে বাধে। সুন্দর কে সবার সামনে সুন্দর বলতে পারি। কাউকে ভালো বলবার আগে পাঁচবার ভাবতে বসি, তাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করি, তারপর সিদ্ধান্তে আসি। একটা স্ট্যান্ড নিয়ে বাঁচতে পারি। একটা প্রিন্সিপাল নিয়ে চলতে পারি।

আমার ৫৫ বছরের যাপনে, জীবন আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সাময়িক ভালো যা সম্ভার হাততালির সমান। তাঁর চেয়ে সত্যি বলো, সত্যি কথার মার নেই। ৯৫% লোকের খারাপ লাগবে কিন্তু ৫% মানুষ বুঝবে। ঐ মানুষগুলোই তোমার এ্যাসেট। বাকিরা লায়াবিলিটিস, কোনদিনও তোমার সঙ্গে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না, বরঞ্চ কিছু লোক ওখান থেকে স্ট্রংলি বাউন্স ব্যাক করতে পারে, যারা তোমার ফিল্ডড এ্যাসেট হিসেবে থেকে যাবে সম্পূর্ণ জীবনের ব্যালান্স শিটে।

সহজ একটা প্রশ্ন - কেমন আছো?

সহজ উত্তর - ভালো।

কিন্তু এর অন্য উত্তরগুলো একবার খুঁজি।

কেমন আছো?

উত্তর - কেন এই চলছে ভালো না তুমি জানো না বলে অন্য কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথার জ্বাল বোনা আমার খবর ছাঁড়ো, রায় দার কেস টা শুনেছো। ইত্যাদি, আরো বহু উত্তর আছে।

কেন শুধুই কুশল বিনিময়ের সমস্যা কোথায়? কাকে বোঝাবেন। অনেক টা ঐ আপনার নাম কি? আমার তো কয়লার দোকান নেই গোছের। আমার বস আমাকে জিঙ্কস করতে দাদা আজকে আপনার কতো টাকার ব্যবসা হবে? আমি বলতাম সত্যি কথা যেমন এখন হাতে কিছু নেই, বা যেটা আছে সেটাই, কিন্তু তাতে আমাকে অনেক কিছু শুনতে হতো। যারা সকাল সকাল মিথ্যা বলতো, যেমন

একটা কোনো কাল্পনিক ফিগার, হাত খালি অথচ বলছে বিশ লাখ। এক ঘন্টা পর বিশ লাখ আসছে। দু ঘন্টা পর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট উঠছে ব্যাঙ্ক থেকে। তিন ঘন্টা পর ব্যাঙ্কে আমার এক্সিকিউটিভ দাঁড়িয়ে আছে, লিঙ্ক নেই, কি করবে? চার ঘন্টা পর এসব ন্যাশনাল ব্যাংক ফালতু, সারাদিন লিঙ্ক থাকে না, কাষ্টমার রেগে আগুন, একদিনের রান্না হয়ে যেতে পারে এতো "আগুন"। শেষমেষ কাষ্টমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেনজ করবে বলছে, উনি আউট অফ স্টেশন আছেন, নেক্সট উইকে ফিরেই আমার কাজ টা করবেন আর আমার বিশ লাখ না না বস ওটা চল্লিশ লাখ হবে।

ঐ ম্যানেজার বসকে বল্লো আপনার চিন্তা করতে হবে না আমি নিজে ঐ ফাইলটা দেখে নিচ্ছি। ব্যাস আর কি। সন্ধ্যাবেলা বাতি নিভল যোর তমশায়। আবার বস আমাকে নিয়ে পড়লেন। ওঁর কাছে তো আজকের দিনে চল্লিশ আছে, বাকি মাসে আরো চল্লিশ টেনেই দেবে, কি পার্থ দা তাই তো। পার্থ দা না, না, অনুপ কপাল সাথ দিলে ওটা এক কোটি হয়ে যাবে। আরো কিছু ফাইল আছে যার থেকে ৪০% ও যদি ম্যাচিউর হয়।

অনুপ সুপার পার্থ দা। এইখানেই তো তোমার সাথে অন্য ম্যানেজারের ফারাক, তুমি সাত দিনের পরের বিজনেস ও দেখতে পাও কিন্তু কেউ কেউ আছে সকালে বলবে "হাতে কিছু নেই" মাহুএন্ড পার্থ দা ৭৫ লাখ। অমৃত ৫০ লাখ সূরজ। ৩৫ লাখ গৌতম দা ৮৫ লাখ।

সারা মাস কথা শোনা কিন্তু ঐদিন কিছু দূর্লভ মূহূর্তের সাক্ষী থাকা। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। এই মাসের বিজনেস কমিটমেন্ট পার্থ দা ২ কোটি, অমৃত ২ কোটি, সূরজ ১ কোটি, গৌতম দা ছোড় দো। দাদা মেরা ট্রান্সপ কার্ড হয়, ও ঠিক মাসের শেষে বাজি মারবে। লেটস সেলিব্রেট টুডে।

একটা মানুষ সত্যি অপছন্দ করে, মুখের উপর তো একদম শুনতে পারে না। বিশেষত মানুষ মুখের উপর না একদম শুনতে পছন্দ করে না। কিন্তু আমি কি করব? আমি যে এটাই আবার পছন্দ করি। "গীতা" না ছুঁয়ে "যাহা বলিব সত্য বলিব"। "গীতা" ছুঁয়ে হয়তো মিথ্যা বলতেও পারি, ঐ একটাই কারণ স্রোতের বিপরীতে হাঁটব। গীতা ছুঁয়ে ও যে মিথ্যা বলা যায় তার প্রমাণ, যদিও আজকের আধুনিক সমাজে এইটাই ঠিকঠাক প্র্যাকটিস।

হালিসহর আনন্দম

বসের অপছন্দের মানুষ হয়েও পরবর্তীকালে ওঁর ছেলের জন্মদিনের অফিসের কে কে নিয়ন্ত্রণ পাবেন সেই লিষ্ট আমাকেই ফাইনাল করতে হচ্ছে এমন অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমার কর্মজীবনে। অনেক উঠানামা। অনেক ভাঙাগড়া। অনেক হিসেব নিকেশ দেখলাম এই জীবদ্দশায়। কিন্তু আজো ও আমি বলতে পারি যে "সত্যি কথার কোন জবাব নেই"। আজকে জীবনের এই সায়াহ্নে এসে বুঝতে পারছি আমি কতো সৌভাগ্যবান। টাকা ছাড়াও একটা জায়গায় পৌঁছান যায়। মিথ্যা ছাড়াও একটা জায়গায় পৌঁছান যায়। মুখের উপর না বলেও একটা জায়গায় পৌঁছান যায়। সন্মান পাওয়া যায়। ক্ষতি পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা পাওয়া যায়।

অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। আসমুদ্র হিমালয়ের পরিচিতি পাওয়া যায়। খালি হাতে এসেও ভর্তি হাতে যাওয়া যায়। সত্যি বলেই মানুষের মনে ঠাঁই পাওয়া যায়। সস্তার হাততালি ছেড়ে, কাল্পনিক ভালোবাসায় না ভেসেও নিজের জায়গা করে নেওয়া যায়।

"কাকে দেব দোষ বন্ধু, কাকে দেব দোষ।

বৃথাই করো লক্ষ্যবাহু, বৃথা করো রোষ।

যারা শুধু মরে কিন্তু দেয় নাকো প্রাণ।

কেউ কখনো তাঁদের করেনি সন্মান।

যতোই কাগজে কাঁদি, যতো দিই গালি।

শুধুই হৃদয় জুড়ে কলঙ্কের কালি।

যে তোমাকে রোজ রোজ করে অপমান।

একদিন সেই তোমাকে করবে সন্মান।"

স্মৃতিলেখা

নূপুর গাঙ্গুলী

নজরুল তুমি বিদ্রোহী কবি, আমাদের দুখুমিএগ
দেশদ্রোহীদের ঘায়েল করতে কঠিন তোমার হিয়া।
শিশুকাল থেকে সহ্য করেছে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা.....
সাধে কি তোমায় পড়ায় কবি, প্রণম্য বরণমালা?
সন্তানশোক সহ্য করা কি শুধুই মুখের কথা?
অনুভব কেউ কি করেছে, তোমার নিদারুণ নীরবতা?
অল্প বয়সেই চির ঘুমের দেশে তোমার আদরের বুলবুল.....
পুত্রহারা পিতা তুমি, তবু লিখে গেছ অবিরাম, বিলকুল.....
বোঝেনিতে তারা সন্তানহারা পিতার মর্ম-ব্যথা--
লিখিয়ে নিয়েছে স্তব্ধ পিতার কান্না জড়ানো কথা....
ক্ষমা করো নিজগুণে কবি, নির্দয় অমানবের মূর্খামি;
কষ্ট তুমি পেয়ো নাকো নজরুল, তুমি আমাদের অন্তর্যামী।

আধুনিক গানের কথা

স্বপন মজুমদার

মন মৌ গুনগুন সুরে, উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়,
একটিও ফুল নেই বাগিচায়, ব্যর্থ মধু আহরণে উড়ছে হতাশায়।
একবুক নিরাশা নিয়ে ফিরছে ঘরে, শব্দহীন, সুরহীন, উদাসী মন করে।
কেউবা ঠিক পথে কেউবা বিপথে পথ হারায়।
ব্যর্থ মধু আহরণে উড়ছে হতাশায়।
ঘোর বিপদ সামনে কারা যেন জ্বলেছে আগুন
তাদের ফেরার পথ জেনে।
বহু সাথী পুড়ে মরেছে বহু আহত অসহায়
ব্যর্থ মধু আহরণে উড়ছে হতাশায়।

হালিসহর আনন্দম

ঝরে যাওয়া প্রেম
হিমাংশু ভূষণ বালো

আগমনী
প্রদীপ নারায়ণ পাণ্ডে

মনের ঘরে থরে থরে সাজানো অতীত কথা
শুধু বসে বসে বোবার মত ভার বহনে ভাবনা
মরা নদীর জায়গাতে জায়গাতে চর জেগেছে
চরাতে পাখিরা বাস্ত তোড়জোড়ে
পরন্তু আলোতে নদীর জল, সিঁদুর গোলা
অনেকে দৃশ্যটা দেখলেন না
কলমিলতা, ডাঙ্ক কেশবতী কন্যারা আড়ালে
ঝরে যাওয়া প্রেম, মলিনতা
ঘিরেছিল ম্লান আলোছায়াতে
মাধবীরা প্রত্যয়ে দৃণ্ডপায়ে হাঁটছে
বুড়ো হাঁসটা আশ্রয় ডানা ঝাপটানছে
হাওয়া নামছে সামান্যই
বৃষ্টির দমকে গুমসানি গরম গেল উভে
একরাশ ধুলোবালি আর শুকনোপাতা
দরজায় ঝাপটা মারছে
নিজস্ব আঁচে ওরা পরস্পরে
বেঁচে থাকে আজও।

ভোর বেলা পঙ্কী বালার শিউলি তোলা
নদীর ধারে থাকে থাকে কাশের দোলা।
নীল আকাশে, মাঝে মাঝে পেঁজাতুলা,
ভেসে চলে এদিক সেদিক মেঘের ভেলা
মনের ভিতর শিহরনের আনাগোনা,
উঁচু উঁচু মন যে আমার আনমনা।
শিশিরে ভেজা মেঠো পথে পথ চলা,
আসবে দেবী মনের ভিতর দেয় দোলা।
তোমার ছবি মনে মনে বসে আঁকি,
এই বুঝি, ঢাকে কাঠি, পাড়ল ঢাকী।
ম্লিষ্ট তরু কল্প মাঝে রূপের জাদু,
আগমনীর বার্তা যে ভাই, বলে সাধু।
দেবী আসবে ধরাধামে সকল সনে,
কেটে যাবে অজ্ঞানতা অন্ধজনে।
দুঃখ ঘুচে সুখ আসবে ঘরে ঘরে,
প্রচারিত দেবী মাহাত্ম্য চরাচরে।
পাপ নাশ ধর্ম রক্ষা হবে ভাই,
কায় মনে দেবী বন্দনা করব তাই।

লাল রক্ত

মনীষা রায়

ছোট্ট একটি স্বস্তির সংসার বস্তিতে মিনুদের। মিনু হলো অনু-বিনুর মা। দুটো বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে। পাঁচ বছর ধরে স্বামী নিরুদ্দেশ। তার বিশ্বাস ভগবান একদিন তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে। অনু আর বিনু এক বছরের ছোট বড়ো। দুজনের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া লেগে থাকলেও এক মুহূর্তের জন্যও কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাতে মায়ের অনেকটাই সুবিধা হয়, কাজে গেলে ভাই-বোন দুজন দুজনকে দেখে রাখে।

একদিন মায়ের দেরি হচ্ছে দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছিল দুজন। আসলে কষ্টটা যে খিদের! মা দুই বাড়ি কাজ করে যে জলখাবার পায়, সেটাই তিনজন ভাগ করে খায়। মা আসছে না দেখে অনু-বিনু বেরিয়ে পড়ল মায়ের খোঁজে। কিছুদূর যেতেই দেখে রাস্তার ধারে বসে মা কাঁদছে আর ধুলোমাখা রুটিগুলো ছেঁড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছেছে। হোঁচট খেয়ে উল্টে যাওয়া পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে রক্ত ঝরছে। মাকে এই অবস্থায় দেখে অনু ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা শুকনো পাতা দিয়ে মায়ের পায়ের আঙুলের রক্ত মুছতে থাকে। বিনু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়ের পায়ের দিকে আর বলে ওঠে ""দিদি লাল রক্ত""। বাড়িতে ফিরে ছেঁড়া গামছার কোণা থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে কাজে যেতে থাকে মিনু।

একদিন কাজে যাবার পথে মিনু দেখে একজন ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরা লোক প্রত্যেক বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে আর সবাই পাগল বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজ চলে যাবার ভয়ে সে সময় মত কাজে পৌঁছবে বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে পা চালাতে থাকে।

কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখে অনু-বিনু ফিসফিস করে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে। মিনু জিজ্ঞেস করতে অনু বলল ""ভাই বলছে ও পাগল দেখেছে""। মিনু বলে ""কাউকে পাগল বলে কষ্ট দিলে ভগবান রাগ করেন - মনে থাকবে?"" ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় দুজন। কিছুক্ষণ পর অনুর চিংকারে মিনু বাইরে বেরিয়ে এলো। মুখ খুবড়ে পড়ে থাকা মানুষটিকে জল খাওয়াবে বলে তার মুখটা ফেরাতেই চিংকার করে উঠল মিনু - ""তুমি? অনু একটু জল আনতো মা। বিনু এদিকে আয়, তোদের বাবা!"" ওদের বাবার তখন কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। বিনু বলল ""দিদি লাল রক্ত!""

মল্লিকা পুরনো বই-খাতার দোকানে গিয়ে লাল ভেলভেট - এ মোড়া খাতাটা যখন তাক - এ দেখতে পায়, তখন প্রথম দেখাতেই ওর ওটা খুব পছন্দ হয়ে যায়। মায়ের কাছে বায়না করে ওটা কিনে দিতে। দোকানদারের সাথে অনেক দর দাম করার পর মল্লিকা খাতাটা ২০০ টাকায় পেল।

বাড়ি ফিরে মল্লিকার আনন্দ আর ধরে না। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া এক অমূল্য উপহার। মল্লিকা খাতাটার পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। প্রথমে কয়েকটা পাতায় কিছু অভিনব আঁকার সাথে লাল কালি দিয়ে কবিতা লেখা ছিল। মল্লিকা ওই গুলো দেখতে দেখতে যেন অন্য দুনিয়ায় হারিয়ে গেল। আচমকাই মনে হল, ওকে যেন খাতার পাতার ভেতর দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ ডাকে যেন এক অমোঘ টান আছে। মল্লিকা হঠাৎই খাতাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যেতে লাগল।

ছাদে পৌঁছে মল্লিকার মনে হল চাঁদের আলোর বাঁধ ভেঙেছে, উপচে পড়ছে আলো আঁধারে কে যেন ওর কাছে এগিয়ে আসছে আর ফিসফিস করে ওর কানে বলছে, ""চলে আয়, তোর জন্য আর কত অপেক্ষা করব?" মল্লিকা আশ্তে আশ্তে ছাদের কার্নিশের প্রায় কাছে চলে গিয়েছিল, ওর মনে হল কে যেন ওর কানের কাছে ফিসফিস করে আবার বলছে, ""কী রে হাতটা ধর, এগিয়ে আয়।"

আচমকাই মায়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল। মা বলল, ""কী রে এমন করছিল কেন? এফুনি বিপত্তি ঘটে যেত তো।" মল্লিকা মায়ের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন ওর কিছুই মনে নেই।

পরের দিন আবার খাতাটা হাতে নিতেই আচমকাই আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। ওর মা খাতাটা লুকিয়ে ফেলতে, মল্লিকা -এর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করল। ও যেন কাকে খুঁজছে। এরপর একজন প্যারানরমাল বিশেষজ্ঞ-এর মতামত নিয়ে, খাতাটাকে পুড়িয়ে ফেলে বাড়িতে একটা যজ্ঞ-এর আয়োজন করা হল। তারপর সবকিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

দুর্গাস্তুতি

সুনীল রঞ্জন পাণ্ডে

একাকীত্ব

আলোকা বণিক

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।
যেই মাতা সর্বজীবের আছে অবস্থিত
নত শিরে তাকে প্রণাম করি সতত।
ওহে মা দুর্গাদেবী! তুমি থাক কৈলাসে
সন্তান সাথে এসেছ মা, মর্ত্যলোকে।
সঙ্গে আছে তোমার সন্তান চারিজনে
বাবা শিবও তো করছেন আগমন।
অসুর বিনাশকারী দুর্গতিনাশিনী
এরূপ দেখলেই তুমি শ্রীমূর্তি ধরি।
ভক্তি শক্তিহীন, অতি অভাজন মোরা
করতে চেয়েও পারিনা করতে পূজা।
ভজন সাধন হীন, মোরা মূঢ় মতি
ভক্তি শক্তি দাও, তব করতে প্রণতি।
নিজগুণে কর দয়া হয়ে সুসদয়
তব কৃপাশীলে পূর্ণ হোক এ হৃদয়।
মোদের মধ্যে আছে যত অশুভ ভক্তি
বিনাশ করে তা, করে লও সুপ্রবৃত্তি।
ফেলে মা যাবে তুমি, কাঁদায়ে সকলেরে
এক বছর পরে তুমি, আসবে ফিরে।
থাকব কি ভাবে তাই ভাবি ব্যথা লাগে
"স্মরিতে যেন পারি" প্রার্থনা তব পদে।

একাকীত্ব বড়ো কঠিন বাস্তব
জীবনের কর্ম ব্যস্ততায়-
সঙ্গী পাওয়া বড়ই দুর্লভ।
আর সঙ্গীর একান্ত আন্তরিকতা না পেলে---?
সন্দেহের বীজ বৃদ্ধি,
ভালোবাসার দূরত্ব দুর্বলতা
আপনজনকেও বানায় পর।
একান্ত আপনকেও মনে হয়
পঞ্চমিহের গড়পড়তা।
ভাবা যায়, একাকীত্বের নাগপাশে
আমরা যে বড্ড জড়িয়ে গেছি,
উন্নয়নের স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে
আপনাকেও পরোয়া করেছি
তাতেই তো আরও একা হয়ে পড়েছি।
সেই সুযোগ এর সং ব্যবহার সুযোগ সন্ধানীদের।
তবে কলমের সাথে বন্ধুত্ব করলে
একাকীত্বের আঁধার যায় মিলিয়ে।।

মাতৃ বিক্রি
জগদীশ মণ্ডল

ভোরের বেলা বাবুর বাড়ি
যেতে হবে মাকে,
ক'দিন ধরে মিনার জ্বর
দেখবে কে আর তাকে।
খেতে ভীষণ কষ্ট জ্বরে
হাত পা ফাঁকে ফাঁকে,
কাঁপে ভীষণ দেখে না কেউ
একাই পড়ে থাকে।
তিন বেলাতে বাবুর ছেলের
মুখে তুলে দেয় ভাত,
নিজের মেয়ে কষ্টে কাঁদে
জাগে তো অনেক রাত।
অন্য মায়ের ছেলেকে সে
পরায় জমা জুতোটাই,
নিজের মেয়ের করবে আদর
সেই সময়টি আর নাই।
মা'র মমতা বিক্রি হলো
পেটে খিদের জ্বালা,
সম্মান বাঁধা ধনীর ঘরে
খুলবে কে তার তালা!

বর্ষা রানী

উত্তম ব্যানার্জী

এসো গো হাসিয়া বর্ষা রানী এসো অপরূপ সাজে,
তুমি না আসায় কৃষকের বুকে বড় ব্যথা যে গো বাজে।
এসো গো বর্ষা নীলাম্বরী শাড়ি পরে
ঐ শাড়িতে মানায় তোমায় বেশ,
গোধূলী তোমার সিঁথির সিঁদুর মেঘরাশি কালো কেশ।
এসো গো বর্ষা যৌবন মদমত্তা ঝড় অবিরাম বেগে,
তোমারই চেতনায় তোমারই পরশে সবুজেরা উঠবে জেগে।
এসো গো বর্ষা শ্যামঙ্গিনী সুন্দরী কণ্ঠে বিজুলী মালা,
দাও গো জুড়ায়ে বারি ধারা দিয়ে প্রচণ্ড প্রখর জ্বালা।
এসো গো বর্ষা রূপসী এলোকেশী এসো রিমঝিম করি,
পরগো জড়িয়া পাগলিনী রূপে সারাদিন সারারাত ধরি।
এসো গো বর্ষা নদী নালা বিলে তুমি যে ভরসা সতত সরসা,
অপরূপ সাজে সেজে ওঠো তুমি ভুবন মোহিনী বর্ষা।।

হালিসহর আনন্দম

মা
অঙ্কনা নন্দী

এখন আমি
সুপদ বিশ্বাস

যাচ্ছিলাম পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে।
দেখি তাকিয়ে পাশে,
একটি মেয়ে আরামে ধুলোয় বসে আছে।
নেইকো মুখে ভয় ডর নেইকো পিপাসা।
ছোট তার মুখখানিতে ভরা ভালোবাসা।
হাসিতে ঝলমল, যেন রৌদ্র ভেজা সকাল।
কাছে গিয়ে দেখি চেয়ে, ধুলোর দিকে তাকিয়ে সে।
বললাম আমি, "নাম কি তোমার? থাকো কোথায় তুমি?"
বলল সে, "নাম জানি নিজের। জানি নাকো ঘর।
সবাই আমার আপন। কেউ নয় কো পর।"
বললাম আমি, "ধুলোয় কেন বসে আছে তুমি?"
মেয়েটি বলল হেসে সুখসাগরে ভেসে।
"এ তো আমার মায়ের কোল।
এখানেতেই থাকি সকাল-ভোর।
মা আমার মাটি।
একেবারে সোনার মত খাঁটি"।।

শিশুদের রাতের বেলায়
ভেসে ভেসে ঘুমের ভেলায়
স্বপ্ন দেখে আঁতকে ওঠায়
মা যেত খুব রেগে,
এখন আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুমিয়ে নয় জেগে!
ছোটবেলায় আঁধার দেখে
মুখ আঁচলে ঢেকে রেখে
ভয়ে ভয়ে কাটতো সময়
দেখিনি চোখ মেলে,
এখন আমি চলি দুঃখের
ঘন-আঁধার ঠেলে!
কাঁপানি গলায় বাবার কাছে
বলি কোন টাকা আছে?
কোথায় টাকা! ধমক খেয়ে
পালাই ভয়ে দূরে,
এখন আমি টাকার খোঁজে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে!

আমার স্বপ্নের গ্যালাক্সি
বিশ্বজিৎ দাস

রাবার
শুভম রায়

এখানেই আমার স্বপ্নের গ্যালাক্সি, আমার নিজের
আকাশ,
যেখানে মিশে আছে ভালোবাসা, মায়া আর বাতাস।
এখানেই আমার ছোটদের স্কুল, কলকাকলির মেলা,
শিশুর হাসিতে ভোর হয়, কাটে সারাটা বেলা।
এখানেই আমার সাধের বায়োকেমিক মেডিকেল
কলেজ,
মানবসেবার ব্রত নিয়ে গড়া জ্ঞানের এক নলেজ।
এখানে ওষুধ নয়, বিশ্বাসে সারে ক্ষত,
এখানে জীবন খুঁজে পায় নতুন শপথ।
অফিসের ক্লান্তির মাঝে এটাই আমার অবসর,
এই মাটিতেই খুঁজে পাই প্রাণের নির্ভর।
এ আমার উৎসব ভবন, আনন্দেরই ঘর,
এখানে আপন হয় সবাই, কেউ নয়তো পর।
কত লোকের যাতায়াত, কত পদধ্বনি বাজে,
কত কথা, কত আলাপন সকাল-সন্ধ্যা-সাঁঝে।
কেউ আসে শিখতে, কেউ আসে শেখাতে,
কেউ আসে দুঃখ ভুলে একটু সুখ পেতে।
এটা শুধু ইট-কাঠ নয়, এটা আমার হৃদয়,
এখানেই আমার শুরু, এখানেই আমার বিজয়।
এই গ্যালাক্সিই আমার পৃথিবী, আমার পরিচয়,
এ স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, হবে না কভু ক্ষয়।

আজব এই দেশে,
একই রকম বেশে
দাঁড়িয়ে আছো ভাই।
সব বস্তুর যেখানে,
প্রাণ আছে সেখানে
জড় তো কিছুই নাই।
একই রূপে তুমি,
সাদা হয়ে আছো গুনি
কাজ তোমার পাতায় পাতায়।
পেন্সিলের মোছো দাগ,
ক্ষমতা তোমার বিবাগ
পরিচ্ছন্ন রাখো সব খাতায়।
এভাবে মুছতে মুছতে
নিজেই তুমি মুছে যাবে যেদিন
এ বড়ই যন্ত্রণা
রাবারের বলবো সেদিন।

ছড়া না গো, ছেঁচড়া

পি.শাস্বতী

হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট প্রীতিময় চৌধুরীর বাড়ির সকাল। প্রাতঃরাশ খেয়ে যে যার মত কাজে ব্যস্ত। একান্নবর্তী রান্নাঘর বেশ বড়ই। নাতি নাতনিরা নামী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লেও শাস্তি গণ এখনও তাদের শাস্তির ভাষা বলতেই অভ্যস্ত। সকালে ব্যস্ততা, বাসনের ঠোকাঠুকি, শাস্তিদের উচ্চকণ্ঠ দৈনন্দিন রুটিন। উঠোনে দাসী হরিমতী মাছ কুটছে। কিলো তিনেক ওজনের কাতলা। সেই দেখে বাড়ির ছোট নাতিবাবুর হাজার প্রশ্ন। হরিমতী বিরক্ত হয়ে বলে 'আ ম'লো! সেই তখন থেকে এক কথা ঘ্যান ঘ্যান, ঘ্যান ঘ্যান করে চলস। বলছি নি শুধু মুড়ো ঘাঁটি রান্না হলি বলে মুড়িঘণ্ট। আর তাতে শাক, বেগুন, কুমড়ো এসব মেলা আনাজ আর মাছের তেল- পটকা পড়লি, আঃ, তখন হয় ছেঁচড়া। আমার বাপু মুড়িঘণ্টের থেকে ছেঁচড়াই বেশি ভাল লাগে।

নাতিবাবু -- ছেঁচড়া। ছেঁচড়া। মেজ গিল্লি--হরি... ও হরি... হরিমতী..... ও পুঁটির মা... কার সঙ্গে এত বক বক করছ? ও হরিমতী..... বলি, কার সঙ্গে এত বক বক করছ? কানে কথা যাচ্ছে না, না কি? হরিমতী--- এজ্ঞে, খোকাবাবুর সঙ্গে মেজ ঠাকরুণ! মেজ গিল্লি--- আ মো'লো! ওর সঙ্গে তোর এত রান্নার গল্প কিসের? ও এসবের কিছু বোঝে নাকি? হরিমতী--- তাই তো বোঝাতে নেগেছিলুম। তা আপনে ই বা রেগে মরছ কেন? দুটো কথা কয়েছি বই তো নয়। এত বড় কাতলার মাথা খানা দেখে খোকা বাবু শুধোলো! তাই.... মেজ গিল্লি-- হয়েছে আর বাখান দিতে হবে না। খোকার মা শুনলে একেবারে বাড়ি মাথায় তুলবে। মেজ গিল্লি--ভাই! ও ভাই! তুমি ওপরে যাও দাদু। মা খুঁজবে নাহলে। নাতিবাবু--- সে কি বলছ গো মেজদিদু। মা তো বললে- যা.... দেখ তোর দিদিরা, দিদুরা কি করছে! মেজ গিল্লি--- অ! তা মা কি ফোন নিয়ে বসে পড়েছেন। নাতি বাবু-- হ্যাঁ গো দিদুন। মা' র এখন অনলাইন ক্লাস। বললে ভাত খেয়ে উঠে আসবি। মেজ দিদুন--- ভালো। তা এস তো দাদু। দেখি তুমি কেমন ছড়া শিখেছ? নাতি বাবু পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামের নামী স্কুলে। ছড়া শব্দটা শোনেনি। আজকের নতুন শব্দ ছেঁচড়া টা ই ও ভাবে ছড়া। নাতি বাবু- ছড়া না গো দিদু, ওটা ছেঁচড়া। মেজ গিল্লি-- হয় গোপাল! ছড়া ছড়া। তোমাদের বইতে রঙিন ছবি দিয়ে যে লেখা থাকে। সেই কবিতা শোনাও দেখি! নাতি বাবু-- অ, রাইমস? তো সেটাই বল না। কোনটা শুনবে বল মেজ গিল্লি--- না, এসব ইংরিজি কবিতা নয়। ও তুমি ইস্কুলের দিদিমণিদের শুনিও। আমাকে খোকা গেল মাছ ধরতে বল... ও তো শাক না হলে হবেনা ...ও টা তো ছড়া না গো দিদু, ছেঁচড়া।।

প্রেমিক

সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জী

সাজো সাজো রবে শুকনো পাতা ঝরে। নতুন পাতার উচ্ছ্বাস সকল
নিরবতার মাঝে ঝঞ্ঝিত হচ্ছে। আমার দীর্ঘ জীবনের ভালোবাসার অস্তিত্বের সঙ্গে
সময় বাবু লেপ্টে আছে। কাল হাসতে হাসতে তাকে বলি, "আচ্ছা সময় বাবু
আমাদের প্রেম-সোহাগের পাতা ঝরেই চলেছে পাইনে কেন ওই গাছের উচ্ছ্বাস?"
সময় বাবু আমার কাছে এসে ভালোবাসার আলিঙ্গনে এসে বলে, "জীবনের পাতা
ঝরে দেহে, কখনোই হৃদয়ে নয়। তবে দেহ-মনের ভারসাম্য তো তোমাকে
রাখতেই হবে।" খুব রেগে আমি বলি, "না এসব আমি মানি না। আমার পুরাতন
দেহটাকে নিসর্গের সাজে সাজাব আজ।" সময় বাবু অটুহাস্যে বলেন, "তুমি চলো
আমার সাথে। এত ভালোবাসি তোমাকে তবুও আমাকে ভালোবাসো না?"
ক্ষিপ্ত মনে বক্র চোখে বলি, "ধূর ধূর তোমার সোহাগে দেখ দেখ শরীরের সব পাড়
ভেঙে যাচ্ছে!" আবেগের কণ্ঠে সময় বাবু বলেন, "রুগুণতার রূপে তুমি মনটাকে
কেন দূর করছ?" সময় বাবু আবার আমাকে কাছে টেনে আদরের ভাবে বলেন।
"আজ নদী বলছিল কেন যে পার ভাঙে আর ভাঁটা আসে?" আমি বলি, "সত্যিই।"
সময় বাবু বলে আবার, "ওই তো সেদিন বসুন্ধরা আক্ষেপ করছিল সেই
ভূমিকম্পের অত্যাচারের জন্য --- সব ভেঙে শেষ করছে। আর ----" ব্যাকুল হয়ে
আমি বলি, "বলো কী গো? তোমার বুকে মাথা রাখব।" সময় বাবু বলে, "আজ
আর প্রকাশ্যে নয়---আড়ালে। ওই দেখ ওই দেখ আসছে সমুদ্র" আমি অবাক হয়ে
বলি, "ও কেন আসছে?" "কী হলো সাগর এত হস্তদন্ত হয়ে---? কেন হলো টা
কী? বলো বলো?" সহজ ও শান্ত চোখে সময় বাবু বললেন, "আজ যে সুনামী
আসছে! সব সব তছনছ করে দিয়ে যাবে। যখনই আসে আমাকেই মেনে নিতে
হয়। আজ পর্যন্ত মেনেই চলেছি। সময় বাবু মনটা খারাপ তাই তোমাকে বলি, তবে
মানতে তো হবেই।"

কাতর হয়ে সময় বাবু বলেন, "দারুণ হয়েছে---- মেনে নিতেই হবে। হা হা
হা সাগর যাও ঘরে সামলে আবার এসো।" আমি কিছুক্ষণের জন্য সময় বাবুর
সামনে অবাক বিস্ময়ে থেকে যখন ঘরে যেতে পা বাড়াতেই সময় বাবু আমাকে
জাপটে ধরল। আমি বলি, "ছাড় ছাড় সময় বাবু। সেই পুরাতন প্রেমের আবেগ
আর আসবে না--- আসলেও আমি বুঝেছি বাহ্যিক দেহের সাথে যোগাযোগ আর
সামঞ্জস্য রেখে চলতেই হবে-সাগরের মত বসুন্ধরার মতন-।"

আমি সময় বাবুর হাতটা জাপটে ধরে বললাম, "আসি আজ। এসো কাছে---
মেনে নেব সাদরে --- শুধু বলি একান্তে একটি কথা?"

ব্যাকুল হয়ে সময় বাবু বলে, "কী কী বলো বলো শুনব সবটা। বলো।" আমি শান্ত
স্বরে বলি, "সত্যিই সময় বাবু আজ আমি খুব আনন্দিত কারণ আমার অবিদ্যাবাদী

আত্মার সাথে তো তুমি থাকবে তোমাকে হারাব না কোনোদিন। আমরা দুজনেই আলিঙ্গনের আবেগের উষ্ণতার আনন্দে থেকে আমি শয্যার কোলে থাকলাম পড়ে। জানি আমার সময় বাবু আছে। খুব যে ভালোবাসি তোমায়।"

অসমাপ্ত স্বপ্নের অপেক্ষা

শিবানী চ্যাটার্জী

তাল মিলিয়ে চলছে অপেক্ষার এক লড়াই,
ভোরের সোনালী সূর্যের উদয় থেকে পশ্চিমের লালের চিহ্ন,
এঁকে দিয়ে যাচ্ছে অপেক্ষার কাব্যগাঁথার প্রেমকাহিনী,
আকাশ, বাতাস সবাইকে সাক্ষী রেখে কর গোনা,
কাটবে বেলা, উঠবে আলো চোখের পর্দায় সেই রঙিন দিন,
মিটেবে কখন, কখন সেই ভালোবাসার অপেক্ষার ঋণ জানিনা,
অপেক্ষায় আমি অসমাপ্ত স্বপ্নের ভীড়ের মাঝে।
স্মৃতির কোঠায় গুমরে মরছে সেসব গল্পকথা,
জীবন মালায় গাঁথা রঙিন সুতোয় এক নকশীকাঁথা,
স্বপ্ন ঘিরেই যে দিন গোনা অপেক্ষার,
ফুলের সুবাসের সুরভিতে প্রেমের গল্পে তোমার সাজ,
অভিমানের কাজলরেখা আজ অশ্রুসিক্ত,
মনের গোপন দরজা খুলে উদাস মন,
ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসির ফাঁকে...
দ্বন্দ্ব মন্দ মনে ভাসে অপেক্ষার প্রহর গোনায়ে।
ভাবনার উথাল সাগরে হল এই বুঝি নৌকাডুবি,
ভেবেছিলাম অপেক্ষার বুঝি হবে অবসান,
অসমাপ্ত স্বপ্নেরা রয়ে গেল আজও সেই অভিমানের খাতা খুলে...
এভাবেই বুঝি স্বপ্নেরা চিরদিন জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।
হৃদয়টুকু ছুঁয়ে দেখবার জন্য।

আমি একা
নিবেদিতা দাস

বসন্ত আসবেই
দুর্গাপ্রসাদ গাঙ্গুলী

ভালো লাগে এই ধরণীকে
সবুজে সবুজে
ছেয়ে আছে চারিদিকে
মনের মাঝারে লাগে
সবুজের দোলা
আকার নেয় সবুজ পাল্লা।
মন ফিরে যায় সুদূর অতীতে
শৈশব কৈশোর যৌবনে,
কত কত পাল্লার সমারোহ
ভালো লাগে ভাবতে সেই সময়কে।
এমনি ভাবাবেগ ফিরে মন হঠাৎ বাস্তবে,
কোথায় সেই সবুজ পাল্লার সমারোহ
চারিদিকে কেবল ধূসর গোখূলি লগ্নের বেলা,
শুধু মনে হয় আমি একা একা, একা।
একেবারে একা—

বসন্ত এসে গেছে, ঝড়ে পরে শুকনো পাতা,
নতুন পাতা আসায়, শূন্য স্থানের হয় পরিপূর্ণতা।
গাছ, লতা, গুল্মের পাতার জন্যই বাঁচা,
পাতা বিহীন গাছ প্রানহীন খাঁচা।
গাছের নিশ্বাস প্রশ্বাস পাতার কারণে,
গাছের জোগায় খাদ্য পাতার রন্ধনে।
সূর্যের রশ্মি আর বাতাসের উপাদান,
গাছের খাদ্যের জন্য পাতা করে গ্রহন।
শতাব্দিক বৎসর কাল আয়ু হয় গাছের,
পাতার আয়ু থাকে এক বৎসর কালের।
জন্ম মৃত্যু নিয়ে আসে পৃথিবীর সব প্রাণী,
মৃত্যু নির্দিষ্ট সময় সবাই তা মানি।
সব কিছুতেই অঘটন হয়,
এর জন্য প্রবাদ বিধির বিধান কয়।
পাতার কারণে গাছের হয় বাড়বাড়ন্ত,
সেই পাতারও বৎসর কালের মধ্যে হয় অন্ত।
রোগজ্বালা মানুষের ভয়ের কারণ,
বসন্ত কালের মধ্যেই পাতার হবেই মরণ।
সেই জন্য সৃষ্টি ধংস পাশাপাশি রয়,
একের মৃত্যুর পরিপূরক আর একের জন্ম হয়।
মানুষের জন্য সবাই এই কথাটি বলে,
এমন কাজ করো স্মরণীয় রহে চিরকালে।

প্রেমের বীজ

বাবলু দিলীপ রায়

শাবণী আমি তোমায় ভালোবাসি
এটি ধ্রুব সত্য
আকাশ বাতাস সাক্ষী থাকে
সাক্ষী থাকে বৃক্ষ লতা পাতা
ওই যে পাখির কূজন শুনছো
সেও প্রাণ ভরে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে
প্রেমহীন জীবন তো মরুভূমি
অনুর্বর শুষ্ক মাটিতে প্রেমের বীজ বোনা যায়?
ফসল ফলবে কি তাতে?
তোমার কঠিন পাথর হৃদয়ে
কোন বীজই অঙ্কুরিত হবে না
তাই আমি দূরে সরে যাবো একদিন
ব্যথিত জীবন শুধু হাহাকার করে
নীরবতায় ভরে যায় চরাচর
শুধু একটু ভালোবাসার জন্য
কেঁদে ওঠে পথিক হৃদয়
আজ আমি শূন্য রিক্ত
আকাশে বাতাসে আলো আভাসে
শুধু আমি একাকী
প্রেমের বন্যায় ভাসমান থেকে
চাতকের চিৎকার
শুধু ব্যর্থতা ডেকে আনে।

মনের জোর

সন্ধিতা কানথাল

চুল পেকেছে ভাবছি না,
বয়স হয়েছে মাপছি না,
এবার বুঝি ফুরোয় পুঁজি,
সেই ভয়েও কাঁপছি না।
যৌবনের চৌকাঠ পেরিয়ে এসে,
প্রৌঢ়ত্বকে ভয় পাচ্ছি না,
পাকা চুলে কলপ করি,
লজ্জা আমি পাচ্ছি না।
ফোকলা দাঁতে হাসছি বলে
দাঁতন করা ছাড়ছি না,
বাঁধানো দাঁতে দিব্যি চিবাই
কারোর ভ্রুকুটি মানছি না।
খাতায় কলমে বয়স বেড়েছে
মনের বয়স বাড়ছেই না,
সুখের চাবি হারিয়েছি বলে
দুঃখের কাছে হারছি না।

সংযমের শেষ গ্রহর

শিল্পী সরকার

সব পথের কোথাও না কোথাও শেষ থাকে। আঁকে-বাঁকে চলতে চলতে নেমে আসে ক্লান্তি। জীবনের দৌড়ে থাকে বিরতি। ভালো-মন্দ সব পরিস্থিতিতে একটা সময়ের পর থামতেই হয়। অপেক্ষা করেনা সময়। এগোলে পিছনে তাকানোর কারণ — "পুরনো মায়ায় অতীতের টানে স্মৃতি খোঁজে বাঁধনের"। সব পথ কি শুধুই গন্তব্য? না, স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে প্রয়োজন পরে নিজের অস্তিত্বকে খোঁজার। তাই একটু থেমে আবার নতুন করে শুরুর প্রস্তুতি, এই পথ চলা সাদামাটা, অতি সাধারণ, আনন্দের। মন চায় নতুন করে নিজেকে গড়ার শিকড়ের টানে অসমাপ্ত গল্প সম্পূর্ণ করতে।

কিন্তু সেখানে যদি থাকে করায়-গণ্ডায় হিসাব? মেলানো যাবে স্নেহ ভালবাসার অমূল্য সামঞ্জস্য কে? পিছনে ফেলে আসা অতীতের গল্পটা সবার থাকেনা জানা। তাই জনসমাজে চারিদিক থেকে আসে কল্পনার অতিরঞ্জিত কথন, বিশ্বাস জাগানোর প্রচেষ্টা। কেউ শোনে, কেউ সাথ দেয়, আবার কেউ অগ্নেই বোঝে বলার ধরনের ভঙ্গিমার সাথে জড়িয়ে আছে কি। ভাবনার অবাক বিষয়— মিথ্যে সূত্র গড়িয়ে চলে অজানা প্রসঙ্গে, পাড়ি দেয় অবলীলায় ভরসা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মান পেতে। কিছু যাত্রা অসমাপ্ত থাকতে চায় আত্মসম্মান বহাল রাখতে।

সময় কাটানো আমিত্বের ব্যবধান, প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে মানসিক ভারসাম্য কে। যার বোধগম্যের মর্ম সবাই উপলব্ধি করতে পারেনা। সাময়িক স্থান পেলেও একটা সময় গতি হয় মন্থর। উত্তর বিস্মৃত হলে ফিরে আসে তচ্ছিল্যের শেষ অধ্যায়ের মুহূর্তগুলো। আফসোস থেকে যায় হারানো দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য। কিন্তু মার্জনার অবকাশ হয়ে যায় নিঃশেষ। অন্তর সাড়া দিয়ে ওঠে মনঃসংযোগ কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। একঘেয়েমি প্রতিযোগিতা জীবনে বিষন্নতার মিছিলে বৈচিত্রহীন অন্ধকার কে ডেকে আনে।

তাই সময় থাকতে সবাইকে একটা জায়গায় এসে থামতে হয়। থামতে হবে।

ঘটিগরমওয়ালার ঘটির আওয়াজ

পার্থ দেবনাথ

সন্ধ্যাবেলায় ঘন্টার ওই আওয়াজ শুনলেই তুতুন ছুটে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার আসার প্রতীক্ষায় থাকবেই সপ্তাহের শনিবার দিনটিতে। তুতুন হল শুভঙ্করদার একমাত্র বছর আটকের কন্যা। আর “তার” বলতে ঘটিগরম ওয়ালা নিধির। ভালো নাম নিধির দাস। তুতুন আর নিধিরের মধ্যে সম্পর্কটা যেন আধুনিককালের মিনি ও কাবুলিওয়ালার মতো হয়ে গেছে। দুজনের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে আত্মিক মেলবন্ধনের সম্পর্ক। ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক। টিনের বাক্স কাঁধের এক পাশে ঝুলিয়ে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে সে আসবে তুতুন সোনার কাছে। ঘটিগরমওয়ালা নিধিরবাবু ছোট তুতুনকে তুতুনসোনা বলে ডাকে। টিনের বাক্স নামিয়ে সে লক্ষা ছাড়া এক ঠোঙা গরম গরম ঘটিগরম চানাচুর দেবে, সাথে সাথে নিধির বাবু তার গাল একটু স্নেহের লালিত হাতে টিপে দেবেই আলতোভাবে। মিষ্টি হাসিতে দুজনেই একে অপরের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের ভাব বিনিময় করবে কিছু সময় ধরে। শেষে টাটা করে তুতুন বিদায় দেয় নিধির ঘটিগরমওয়ালাকে। প্রায় এক বছর ধরে এই নাম হারা আত্মিক সম্পর্কের ঘটনাক্রম চলছিল ভালোভাবেই, কিন্তু এর হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। লক্ষ্য করা গেল তিন সপ্তাহ ধরে ঘটিগরমওয়ালা নিধিরবাবু অনুপস্থিতি। ফরত: তুতুনও একটু মনমরা। বাড়ির লোকের কাছে তার না আসার কারণ জানতে চায়। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারে না তাকে। মেয়ের দুঃখ কিভাবে লাঘব হবে সেই নিয়ে চিন্তিত শুভঙ্কর দা। তিনি প্রতিদিনের মতন সকালে বাজারের সামনে কেঁপদার চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে যান। কথা প্রসঙ্গে আড্ডায় তুতুনের সাথে ঘটিগরমওয়ালার কাহিনী বলায় কৃষ্ণদার কাছ থেকে ঘটিগরমওয়ালার না আসার কারণটা জানতে পারে।

ঘটনাটা ঘটেছিল দিন কুড়ি আগে, পৌষের কনকনে শীতের রাতে নিধিরবাবু শান্তিপুরগামী ট্রেন ধরার তারায় দ্রুত পদে চলছিলেন। কেষ্টদার দোকান থেকে দশ হাত দূরে শীতে একদল যুবক কাঠ জ্বালিয়ে আগুনের উষ্ণতা নিচ্ছিল ও মদ্যপানে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে দুজন উঠে এসে নিধিরকে ধরে। মদের চাট খাওয়ার জন্য বিনা পয়সায় ঘটিগরম চানাচুর দেওয়ার জন্য জুলুমবাজি করে। বেচারি নিধিরবাবু ট্রেন পেতে অসুবিধা হবে ও বিনা পয়সায় না দেওয়ার কথা কাকুতি মিনতি করে বলে। হাতজোড় করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে, কিন্তু মদের অতি নেশায় একজন তার ঘটিগরমের টিন কাঁধ থেকে নামায় ও লাথি মেরে ফেলে দেয়। দুই তিন জন নিধির বাবুকে চরচাপর মারে। স্তম্ভিত ও বিস্মিত নিধির বাবুর ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। চোখের জল ফেলে নিধিরবাবু খালি হাতে নিজের ঘরের দিকে রওনা হয়। অসহায়ভাবে আতঙ্কিত হয়ে। এরপর থেকে এই রাস্তায় তাকে আসতে কেষ্টদা আর দেখেনি সম্ভবত, ভয়ে, আতঙ্কে, রাগে, অভিমানে সে এই পথে আসা বয়কট করেছে বা ভাল রকমই আহত হয়েছে যার ফলে তার হাঁটা চলায় অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই রকমই শুভঙ্কর দা মনে করছে। ঘটনাটি শোনার পর ব্যথিত হৃদয়ে শুভঙ্কর দা বাড়ি ফেরে। ঘরে এসে নিধির ঘটিগরমওয়ালার কথা ভেবে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে দুঃখে। সেটা সে হয়তো প্রকাশ্যে দেখাতে পারছে না কাউকেই। আবার ক্রোধের ভাব সৃষ্টি হয়েছে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি। সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে দিন আনা-দিন খাওয়া গরিব মানুষগুলো। সহজ সরল মানুষগুলো আক্রান্ত হবে মদ মাতালদের দ্বারা, অসামাজিক অপরাধীদের দ্বারা? এই ভাবনা কুরে কুরে খাচ্ছে শুভঙ্কর দা কে।

সব থেকে বড় চিন্তা তুতুনকে সে কি উত্তর দেবে? শুভঙ্কর দা জানে না তুতুনের কাছে নিধির ঘটিগরমওয়ালার কি ফিরে আসবে আবার? নাকি আদৌ সে ফিরবে না। অসুস্থ এই সমাজের জটিল রোগের শিকার হয়ে, ঘটিগরম ওয়ালার ঘন্টির আওয়াজ তুতুন কি আবার শুনতে পাবে?

তাসের ঘরের জীবন

রামকৃষ্ণ পাল

ঠিক যেন জীবন তাসের ঘর, এলোমেলো আবহাওয়া,
বিক্ষুব্ধ ঝড়েতে উথাল পাথাল, সমুদ্রে নিষেধ যাওয়া।
এই ভব সাগরে জীবন তরীটি প্রায় ডুবন্ত ওঠে ভেসে,
সংসারের দাঁড় টানতে টানতে ক্লান্ত তটভূমিতে এসে!
শরতে সুন্দর দিনগুলি কাটে আদরে সোহাগে ভরিয়ে,
বর্ষায় সতেজ শ্যামল সবুজে - শীতে শীর্ণ পাতা ঝরিয়ে।
অর্থ দস্তে মাটিতে যে পা পড়ে না বিশ্বশক্তির অধিকারী,
প্রকৃতির নিয়মে দুর্যোগের কালে- কী অসহায় হয়ে পড়ি!
বালির বাঁধের ওপর তাসের ঘর ভেঙ্গেচুরে সব ছারখার,
এই মায়ার ভুবনে অসাধ্য সাধ মেটার পূর্বে নামে আঁধার।

পেরেছে পারছে

হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

বিশালত্বে যাঁরা বিরাট - মহান,
তাঁরাই তো সমব্যথীতে, মায়াঘন মানবত্বে
পেরেছে পারছে পারিবারিক অশান্তি,
দাম্পত্যকলহ, স্বাস্থ্যচিন্তা, আত্মসুখ,
আত্মকেন্দ্রিকতা, পরার্থপরহীনতা থেকে
নিজেকে মুক্ত রেখে এই শাপদসঙ্কুল
বিশ্ব সংসারের কিছুটা সদস্য হতে!

হালিসহর আনন্দম

বর্ষা এলেই
সুকুমার বিশ্বাস

বর্ষা এলেই তপ্ত ধূসর দিন অবসান
বর্ষা এলেই মেঘ বালিকার হয় আগমন
সকাল -দুপুর-সন্ধ্যা রাতে যখন তখন
ঝিরি ঝিরি ছিচ-কাদুনির নেই যে বিরাম
বর্ষা এলেই মাঠ-জঙ্গল হয় কী সবুজ
হিসাবী মন এক লহমায় হয় গো অবুঝ
বর্ষা এলেই পথিক পথে হয় নাজেহাল
দমকা হাওয়া উল্টে ছাতা দেখায় কামাল
ঝলক-ঝলক ঝলকানি দেয় বিজলি -রাণী
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে হৃদয়খানি!
বর্ষা মানেই খোকা -খুকুর মজায়-মজা....
লেখা পড়া ছেড়ে রাজা - মন্ত্রী সাজা
জলে ভেজা পুকুর-ঘাটে বাঁপাই জোড়া
ভেঙ্কিবাজি দেখায় যেন আরবি-ঘোড়া
বর্ষাদিনে জেগে ওঠে কবির কলম
এটা-ওটা লিখেই চলে আজ হরদম
রাত-দুপুরে ক্লান্ত কবি নামিয়ে মাথা
ঘুমের-ঘোরে লিখতে থাকেন স্বপ্নগাঁথা!
ঠিক তখনই বনলতা কাছে এলেন
মিষ্টি হেসে কন --" এত দিন কোথায় ছিলেন?

খোসা
অণিমা মুখোপাধ্যায়

কথা বলতে নিয়ে এত খোসা ছাড়াও কেন?
ওইসব প্রতিবাদ-ফতিবাদ কিচ্ছু লিখবে না...
রাজনীতি বাদ দিয়ে কবিতা লেখ
তবেই আমরা ছাপবো.... !
যত দিন যায় ততই কঠিন হয় কথা বলা।
কবিতা লেখা আরও কঠিন
বিদ্রোহ করা তার চাইতে কঠিন
বরং বেশ সহজ গাধার ন্যায় হওয়া,
কিন্তু ভেড়ার ন্যায় একটাই কথা ব্যা-ব্যা_ব্যা
সমাপনের পন্থা কি?
ব্যা!
তোমরা কি রুখে দাঁড়াবে না?
ব্যা ব্যা ব্যা!
আর একটি বৈচিত্র্যময় পন্থা আছে,
সুযোগ সন্ধানী হওয়া...
ওরা এখন রক্ত ঝরিয়ে আন্দোলন করুক!
যদি জিতে যায় ব্যাস!
আমার কাজ শুধু পাল্টি খাওয়া।

লাশকাটা ঘরে পিঁপড়ে

তুষার আচার্য্য

লাশকাটা ঘরের স্যাঁতসেঁতে দরজাটা খুলতেই মদনবাবু নাকে রুমাল চাপা দিলেন। পুরোনো ফিনাইল আর পচা গন্ধের মিশেলটা আজ বড্ড বেশি ভারী। স্টিলের ঠান্ডা টেবিলটায় শুয়ে আছে এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধের নিথর দেহ। ফুটপাতে পড়েছিল, এতক্ষণ কোনো দাবিদার ছিল না।

সহকারী রতন ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, “স্যার, বয়স সত্তর পেরিয়েছে। কোনো পরিচয় মেলেনি।”

মদনবাবু নিঃশব্দে ছুরি হাতে নিতে যাবেন, তখনই রতন চমকে বলে উঠল, “স্যার, দেখুন! পিঁপড়ে!” টেবিলের পায়া বেয়ে একদল কালো পিঁপড়ে তরতরিয়ে উঠে আসছে। তারা শান্তভাবে বৃদ্ধের জীর্ণ আঙুল ছুঁয়ে বুকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মদনবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, “পিঁপড়ে নিয়ে ভাবিস না, কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ কর।”

মৃতদেহের জামা সরাতেই বুকপকেট থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ খসে পড়ল। কাঁপা হাতের নীল কালিতে লেখা—“আমার ছেলে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছে। মরার পর যেন অন্তত বাড়িটা আমাকে চিনতে পারে।” মদনবাবুর হাত এক মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে থমকে গেল। ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুবেশ এক যুবক ঢুকল। চোখেমুখে তাড়া নিয়ে বলল, “বাবার বাড়িটা কোথায়? আমি ওনার ছেলে। সেই কোথায় করতে হবে বলুন, কাজ ফেলে এসেছি।” যুবকটি নিথর মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিল। রতন দেখল, টেবিল থেকে নেমে আসা কয়েকটা পিঁপড়ে যুবকের চকচকে জুতোর ওপর ঘুরছে। যুবকটি চরম বিরক্তিতে পা বেড়ে সেগুলোকে পিষে মারতে গেল।

মদনবাবু শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় বললেন, “পিঁপড়েগুলোকে মারবেন না।” যুবক ক্র কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “কেন?”

বৃদ্ধের বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে মদনবাবু বললেন, “ওরা অন্তত জানে, এই মৃত মানুষটাও একদিন কারও একটা আস্ত ঘর ছিল।” বাইরে তখন চড়া দুপুরের নিস্তব্ধ রোদ। আর লাশকাটা ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে সেই পিঁপড়েরা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাওয়া কোনো এক বাড়ির ঠিকানার খোঁজে।

দুর্গাপূজোর মূল লক্ষ্য
নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার

সকল পূজোর মূল লক্ষ্য হলো ভগবান বা ভগবতীর কাছে ভক্তের, উপাস্যের কাছে উপাসকের পূর্ণ আত্মসমর্পণ। বিধিবদ্ধ পূজো যদি সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই পূজোর ফল অবশ্যস্বাবী। আবার অঙ্গহীন হলে বা বিধিবিহীন হলে বা শ্রদ্ধা রোহিত হলে পূজোর ফল লাভ তো হবেই না, বরং সময় সময় বিপরীত ফল ও ফলে থাকে। সেই জন্য পূজোর সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ যতই দুর্লভ হোক সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যিক। আন্তরিক প্রচেষ্টায় কিছুই অসম্ভব নয়।

একটি পূজো অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর তখনই হয় যখন প্রতিমা বা উপাস্য সুন্দর এবং নিখুঁত হয়। পূজক ভক্তিমান শুদ্ধ চরিত্র ও পবিত্র মনা হতে হবে। জজমান অর্থাৎ যিনি পূজোর আয়োজক তিনি সুন্দর মনের মানুষ হতে হবে, আন্তরিকভাবে ভক্তিমান হতে হবে।

প্রতিটি পূজোয় প্রতিটি পূজাঙ্গেরই এক একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পূজো করলে সেই পূজো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পূজোকে নিখুঁত শুদ্ধ স্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণই এক অনির্বচনীয় আবেশ তৈরি হয়। সেখানেই বিরাজ করে এক অদ্ভুত শুদ্ধ নীরবতা। তাই দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সংস্থা আয়োজিত এইরকম সর্বাঙ্গ সুন্দর পূজো অনুষ্ঠানে ঢল নামে অগণিত ভক্তের।

আমরা জানি সমস্ত পূজোতে উত্তরমুখী কিংবা পূর্ব মুখী হয়ে বসার রীতি আছে। পূর্বমুখী হয়ে বসার বিধি কেন? এখানে ইঙ্গিতটি হল সূর্য হলেন জ্ঞানের প্রতিভু, তিনি পূর্ব দিকে উদিত হয়ে অজ্ঞান অন্ধকার নিবারণ করেন।

হালিসহর আনন্দম

অতএব সহজেই অনুমেয় পূর্বমুখী হয়ে বসলে অজ্ঞান নিবারক জ্ঞান সূর্যের মহতি ভাবে সাধকের মন উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

উত্তরমুখী হয়ে বসার বিধি কেন? উত্তর দিকে ব্রহ্মলোক সেই ব্রহ্মলোকই সকল জীবের অন্তিম গতি। তাই মনকে সেই ব্রহ্মলোক মুখী অর্থাৎ ঈশ্বর মুখী করবার জন্যই উত্তরমুখী হয়ে বসার বিধান।। অধিকাংশ মানুষই পূজার বিধান বা তত্ত্ব না জেনেই পূজো অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। তাদের কাছে সেগুলি খানিকটা চিরচরিত প্রথা খানিকটা অন্ধ বিশ্বাস সম্বলিত। কিন্তু খানিক বিধি মেনে,জেনে, অর্থ বুঝে পূজা অনুষ্ঠান করলে তাতে কতইনা আনন্দ।

পরস্পর দ্বন্দ্ব ভরা এই জগতে মানুষের অন্তরে ষড়রিপুর জ্বালা, আবার বাইরে নানা ধরনের পশুররূপী শত্রুর যাতনা ছোবলের হাতেই দুর্বলের নিপীড়ন। এর ফলে জগতে আজ মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। যুদ্ধে এদের পড়াভূত করতে না পারলে মানুষের জাগতিক অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব নয়। ভোগলালসা, দম্ভ, দর্প, অভিমান,ক্রোধ এরা মানুষের অন্ত: শত্রু, সাধকের সাধনার প্রতিবন্ধক। এদের নির্মূল করতে না পারলে সানায় নোঙ্গর ফেলে নৌকা বাইবার মতো অবস্থা হবে। তাই বোধনের পুণ্য লগ্নে দেবীর বোধনের সঙ্গে আমাদের আত্মবোধের জাগরণের জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে:-

'হে দেবী যতদিন পর্যন্ত না আমাদের বাহ্য ও অন্তর শত্রুরূপী রাবণকে বধ করতে পারছি, ততদিন যেন আমরা তোমার অর্চনা থেকে বিরত না হই। তুমি আমাদের সহায় হও। আমাদেরও যেন মহাবিপদ দূর হয়, মহাসম্পদ লাভ হয়।

তখন পঞ্চম প্রহরে
বিমল চন্দ্র পাল

বিচার চাই
তিমির রঞ্জন হালদার

ধরার নক্ষত্র কুল তখন দৃষ্টিহীন
প্রকৃতি ঢেকেছে ক্রমে ঘণ তমসায়,
বারুণীতে চিকুর ধ্বনি হুঙ্কার ছাড়ে
কাকে যেন ক্রমাগত চমকায়।
ক্ষণপ্রভা মাঝে মাঝে আঁখি মেলে
বাজায় ক্রমাগত ডম্বর গুরুগুরু
ক্ষণালোকে দেখি নিখর তরুকুল
স্থির বলাহক বর্ষণ করে গুরু।
ছোট এক দারব অলিন্দে বসে আমি
হেরিতেছি প্রকৃতির মহা খেলা,
আসার নেমে আসে ক্রমে ক্রমে
আজিকার নিখর সায়ং বেলা।
বৈশাখের সন্ধ্যাকে পশ্চাতে ফেলে
নিশ্চল পবনের স্বেচ্ছা বিদায়,
মৃদু বাতাসে শিকরের অবাধ বিচরণ
ক্ষণে ক্ষণে করকাপাত ঘটায়।
হঠাৎ ধরার নক্ষত্র কুল আঁখি মেলে
চারিদিক আবার ঝলমল করে,
মেঘে মেঘে হুঙ্কার চলে অবিরাম
তখনও বরষা ঝর ঝর ঝরে।

৯ ঐ আগষ্ট স্মরণে থাক
খুনি ধর্ষক নিপাত যাক।
ছাত্র সমাজ দিচ্ছে ডাক
আর জী কর বিচার পাক।
প্রতিবাদের উঠলো ঝড়
জাস্টিস ফর আর জী কর।
তোমার স্বর আমার স্বর
জাস্টিস ফর আর জী কর।
হোক প্রতিবাদ উঠুক ঝড়
জাস্টিস ফর আর জী কর।
বাড়বে মিছিল বাড়বে ঝড়
বিচার চায় আর জী কর।
কণ্ঠ যত করবে রোধ
বাড়বে ততই প্রতিরোধ।
সবার বুকে উঠছে ঝড়
জাস্টিস ফর আর জী কর।
আমার বোনের রক্ত
ভুলে যাওয়া শক্ত।
অনেক হল হ্যারাসমেন্ট
এবার চাই পানিসমেন্ট।

শরৎ মানে

সুপ্রভাত মল্লিক

শরৎ মানে হিমেল হাওয়া, গা শিরশির করে,
ভোরের বেলা শিশিরবিন্দু জমে পাতার পরে।
শরৎ মানে নীল আকাশে সাদা তুলোর রাশি,
রাতের আকাশ জ্যোৎস্নালোকে ফোটায় মনে হাসি।
শরৎ মানে শিউলি আর কাশফুলের শোভা,
পদ্ম-শাপলা ভরে থাকে খাল-বিল আর ডোবা।
শরৎ মানে মাঠ ভরা থাকে সোনালি ধানের শীষে,
ভোরবেলায় পাখির কূজন কানে ভেসে আসে।
শরৎ মানে দুর্গাপুজোয় বাঙালি ওঠে মেতে,
মহালয়ায় চণ্ডীপাঠে সূচনা হয় তাতে।
শরৎ মানে পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন,
বইয়ের স্টলে মানুষের ভিড় দেখি রাত্রিদিন।
শরৎ মানে মা দুর্গার আগমন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সকলকে সঙ্গে নিয়ে।
শরৎ মানে নতুন পোশাক, নতুন সাজের বাহার,
গরিব-দুঃখীর ঘরে কিন্তু জমাট অন্ধকার।
শরৎ মানে মা লক্ষ্মী আসেন বাঙালির প্রতিঘরে,
শ্যামাপুজো, ভাইফোঁটা আসে তারই পরে।
শরৎ মানে বাঙালি মাতে আনন্দে ও উৎসবে,
আলোর নীচে অন্ধকার কি চিরকালই রবে?

মুখ ও মুখোশ

জয়নারায়ণ সরকার

প্রথম যেদিন নাটকের দলে গিয়েছিল, সেটা ছিল এলাকার হাইস্কুলের একটা অংশ। যে অংশে দরমার বেড়া আর টালির চাল। ইলেকট্রিক তো দূর অস্ত। রিহাসালের সন্ধেগুলো মোমবাতির আলোয় কেউবা রাজা, কেউবা রানি, কেউবা নেতা, কেউবা নেত্রী, কেউবা প্রতিবাদী, আবার কেউ ভদ্রবেশধারী খলনায়ক! আলো-আঁধারিতে এক-একজনের মুখাবয়ব এক-এক রকম মনে হত পর্ণার। তবে প্রতিবাদী চরিত্রে শান্তনুদার অভিনয় মনের ভেতরে ছাপ ফেলে গিয়েছিল।

মঞ্চের জোরালো আলোতে কখনও মেলাতে পারেনি ওই আলো-আঁধারির মুখগুলো। বড্ড বে-আব্রু হয়ে পড়ত তার কাছে। নাচের প্রয়োজন হলে পর্ণাকেই দিয়ে করিয়ে নিতেন নির্দেশক দীপকদা। তাঁর ভারী গলার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত সবাই। মুখে রং মেখে, জোব্বা পরে দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে নিতেন সোমাদি। পর্ণারও ইচ্ছে হত, দর্শকদের হাততালি কুড়ানোর। দীপকদা বলতেন, “শোন পর্ণা, তোকেও সোমার মতো অভিনয় করতে হবে।” কিন্তু কখনও এমন চরিত্র জোটেনি যেখানে দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে নিতে পারে। তবুও আশায় থাকত পর্ণা! কবে যে সে দিনটা আসবে? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে পর্ণা।

যে মঞ্চ লোকশিক্ষা দেয়, সেই মঞ্চের পেছনে নিকষ কালো অন্ধকারও থাকে। হঠাৎই পিঠে একটা ঢোকা পড়ায় চমকে পেছনে তাকায় পর্ণা। দ্যাখে শান্তনুদা দাঁড়িয়ে আছে। আধো আলো-আধো অন্ধকার ঘিরে ধরেছে শান্তনুদাকে। শান্তনুদা কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, “একটু পরেই তো তোর ঢোকা, রেডি হয়ে নে। পর্ণা হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। শান্তনুদা কিছু একটা বলার আগেই যেখান থেকে প্রবেশ করতে হবে, দীর পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। মঞ্চের আলো বলমল মঞ্চে প্রবেশ করতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মাথাটা সামান্য টলে ওঠে। অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়েছিল পর্ণা। পৃথিবীটা কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়েছিল তার। ফোকাসের আলোর বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ছিল বার বার।

দীপকদা বলেছিল, “আলো ছেড়ে দাঁড়ালে, তুই তো চিরজীবন অন্ধকারে থেকে যাবি!” পর্ণা বুঝতে পরেছিল সবাই ওই আলোর বৃত্তে থাকতে পারে না।

এখন মঞ্চে, মুখে রং মেখে, আলোর মধ্যে দাঁড়ায় না পর্ণা। অনেক দিন পরে হাইস্কুলের ওই রিহাসাল ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল সে। যে ঘরে এক-এক সন্ধ্যায় আলো-ছায়ায় ভেসে বেড়াত মুখ ও মুখোশ।

জীবন তরী

মমতা রায়

জীবনের পাতা থেকে পাতা গুলো বুর বুর করে ঝরে যাচ্ছে।

দিনলিপি লেখা হয়ে ওঠেনি।

সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে সাথে ভেঙে পড়ছে।

অন্তরাগের আভায় এগিয়ে চলেছি মরুভূমির দিকে।

তরঙ্গ সরনী বেয়ে এসেছি বহুদূর প্রায় চরের কাছে।

এখানে আমার জীবন তরী বেয়ে চলার নেই তো কোনো মাঝি।

হৃদয় নিংড়ে দিয়েছি যাদের, তারাই এখন পর।

ও নারী তুই কোন বালুচরে বেঁধেছিলি তোর ঘর।

শেষের উত্তাপ নেই সবাই শীতলতা কে এড়িয়ে যায়।

সম্পর্ক বদলে যায় অদ্ভুত ভাবে।

ভেতরে কারো নিঃশব্দ উপস্থিতি।

ভেতরে সব বেঁচে আছে আগের মতো,

কিন্তু সময় অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ছন্দ টা হারিয়ে গেছে, স্বপ্ন টাও মুছে গেছে।

আজ অচেনা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি।

অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

রঙ একবার ই লেগেছিলো

মাধুরী মাইতি

ও বৌদি বাইরে বেরিয়ে এসো, রঙ খেলবে এসো।

পাড়ার সবাই এসেছে।

সবাই সবাইকে আবিব দিচ্ছে।

মিষ্টির ট্রে আর আবিবের প্যাকেট টা নিয়ে এসো।

না আমি আবিব খেলবোনা, তুমি ওগুলো নিয়ে যাও।

কেন কি হোলো - আমার শরীর ভালো নয়।

কাল সন্ধ্য বেলা হোলিকা দহণে তো বেরিয়েছিলে।

আজ আবার কি হোলো?

বলছি তো রঙ আমি খেলবোনা, সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে---

দরজা বন্ধ করে চোখের জল আঁচলে মুছে ভাবতে লাগলো

রঙ তো তার জীবনে একবারই লেগেছিলো।

যেবার দোলের দিন মনীশ মাথায় আবিব দিয়ে

সারা মুখ রাঙিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলো

এ রঙ মুছো না। আমিও মুছবোনা।

আজ এতো বছর পর স্বামী ছেলে মেয়ের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে ও

সেই রঙ যে এখনও ভুলতে পারি নি।

ভোলা যে সম্ভব নয় সে কথা কি কেউ জানে?

রঙ একবারই লেগেছিলো।

মেরুদণ্ড

শুদ্ধদেব সান্যাল

মানুষ, তুই আর যা করিস মেরুদণ্ড সোজা রাখিস,
এটাই তোকে করবে প্রতিবাদী,
সারাজীবন এটাই মনে রাখিস।
বেঁকিয়ে দিলে নিজের মেরুদণ্ড,
সারাজীবন অনেক পাবি দণ্ড,
মাথা তুলে থাকবি চিরকাল,
বজ্রকঠিন হবে মেরুদণ্ড।
বিকিয়ে দিলে মেরুদণ্ডখানা
আর কোনোদিন খুঁজেই পাবি না,
হা-হতাশে বাঁচবি চিরকাল,
মাথা তুলে আর কখনও উঠতে পাবি না।
মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিলে থাকলো কি আর তোর!
তোর জীবনে আর কখনও আসবে না আর ভোর।
তাই তো বলি, সোজা রাখিস মেরুদণ্ড তোর,
বিকিয়ে তাকে দিস না কারোর কাছে,
মাথা তুলে থাকবি সবার মাঝে,
তোর জীবনে আসবে আবার আসবে নতুন ভোর।

মহাদেব

অর্ক প্রভ ভদ্র

বলল সেদিন গিয়ে করে কাকুতি,
আমাকে রক্ষা করো হে অন্তর্যামী
কথা শুনে বেজায় কাবু হলো মহাদেব-
বলল সেদিন, কার কথা শুনে হাঁটছো কোন পথে,
বাঁচতে চাও যদি তো শোনো এই বাণী,
ধৈর্য্য হল সফলতার একমাত্র দিশা,
কারোও কথা না শুনে, নিজের পথে চলো
আর মনেমনে বম্ বম্ বম্ এই কথাটি বলো,
এই কথা, সেই লোকটি শুনেন যখন,
চেষ্টায়ে উঠেন তার স্বরে বম্ বম্ ভোলে বম্ ।

ব্যবধান

জয় চক্রবর্তী

যখন তোমার ভোর,
আমার তখন চৈত্রের দুপুর।
যখন তোমার গোখুলি,
আমার তখন নিশীথ বেলা।
এতটা ব্যবধান।
তবুও পায়ে পায়ে হেঁটে চলা
মাঠভরা ফসলের
সবুজের স্বাণে।

এক কৌটা ভাত

মরুভূমি

কখন আসছো, হাওড়া তে নামছি দশটায়
তারপর মেট্রো ধরে, গঙ্গার জল ছুঁয়ে পৌঁছে যাবো বেলা বারোটায়।
তুমি আসছো তো, আসলে পরবে হলুদ শাড়িটা
লাল সাদা ব্লাউজ, পোড়ামাটির দুল আর লাল রঙের হারটা।
বই পাগলের ভিড়ে, অভিমানী পাগলীটা এসেছিলো
একরাশ ভালোবাসা ভরা, কৌটাতে করে ভাত এনেছিলো।
তুমি কোথায়, এই তো এখানে চার নম্বর গেটের কাছে
তুমি কোথায়, এইতো আসছি পায়ে পায়ে
বাব্বা: কি ভিড় - আমি আছি প্রেস কর্ণারের পাশে।
সে তো এলো, দেখা হোলো দুজনায়
চোখগুলি ভাসলো জোছনায়
মনে মনে কত কথা হোলো শুরু
স্তির দুটি প্রাণ, কপালেতে ঘাম
বুক দুরু দুরু, আর কতক্ষণ, দাও দাও কি এনেছো
কৌটা খুলতেই গরম ভাতের গন্ধ
কত আবেগ কত স্বপ্ন জড়ানো তাতে,
খিদেয় কাতর কাঁপি থর থর - তৃপ্তি পেলাম স্নেহমাখা ভাতে।

শব্দ বন্দী খেলা

অঞ্জু সরকার

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলছে শব্দের খেলা, সুর-তাল-লয়-ছন্দে,
তারা ঘুরছে-ফিরছে, নির্বিকারে অবাধ গতিতে, অনাবিল আনন্দে।
ঝুলে আছে, ভেসে আছে, দোল খায় অন্তর্জালে,
অবিরাম খেলে যায় শব্দবন্দী খেলা।
বন্দী যে শতসহস্র শব্দ ----
তারা গাঁথে শব্দের মিনার, শব্দের ইমারত।
দেহবল্লরীর খাঁজে খাঁজে সুঠাম শব্দের আলপনা,
সুচারু শব্দ-প্রলেপে পঙ্কজিত অতুলনীয়া,
মূর্তিমতি অনুপমা, অনিন্দিতা।
হৃদয়ের পদ্মপাতায় টলটলে ভালবাসার মুক্তদানা,
ছমছম নুপুর নিকুণে আবছায়া শিহরণ!
ঝরঝর শ্রাবণের রিমঝিম বরষায় হারায় "নিঃসীম শূন্যে,"
"সব পেয়েছিস দেশ" এ আখরমালায় অরুপরতন।
দূর হতে দূরে ভেসে যায় ঈগলের ডানায়,
উড়িয়ে দেয় মানবিকতার বিজয় কেতন।
এলোমেলো শব্দের জাল ছিন্ন হয়,
মুক্তি ঘটে এক সহজবোধ্য 'কবিতা'য়।

হারিয়েছি কি??

সুবীর মুখার্জী

শৈশব -- কৈশর -- যৌবনের সারল্যের আঙিনা -

এক অনাবিল উদ্দাম উচ্ছাস -

আমি হয়তো বা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,

বিশ্বাস -- অবিশ্বাস র দোলাচল, সম্পর্কের ভঙ্গুরতা,

অনুভব, সন্দেহের অবকাশ, কিছু স্মৃতি আর প্রেমহীন ভালোবাসা,

আবার হারালো তোমাকে, তোমার প্রস্ফুটিত প্রেমকে।।

মনোসচক্ষে ভেসে তো উঠেছিলে তুমি, তবে সে ভেসে ওঠা

আমার ভগ্ন হৃদয় কে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করেছিল।।

ক্ষতের প্রলেপ আরো দীর্ঘায়িত করে বলেছিলো

না না --আর নয় -আর নয় তবুও -- কেন জানিনা

আবারো বোধহয় ভুলের পথেই পা বাড়লাম।।

না -- ফেরাতে পারিনি - সত্যিই।

যা কিছু ভাবি সংগোপনে কিছু তো -- সত্যিই হয় -- তাই না,

টেলিপ্যাথি তো এভাবেই হয় -- তাই না --?

তাই আবারো ভুল করি, ভুলের পথ আবারো ধরি।--

আবেগ অস্বীকার হয়তো নয় ---তবে, সত্যিই হলেই বা --

আজ আর সে আবেদন আর কৈ??

মনের আয়নায় এসেছো তো সত্যিই ----- তবে ----

হৃদয় আয়না বার বার প্রশ্নের ঝড় তুলেছে -----

তার উত্তর হয়তো বা উভয়ের ই নেই।।

জীবন

সৌমেন দে

ঝরা শিউলি

মনোজ কুমার দেওয়ান

আচ্ছা কি অবাক লাগে না!

কতই না মূল্যবান

আমাদের কাছে আমাদের জীবন।

কিন্তু ভাবি না পোকা - মাকড়ের কথা,

বুঝে, না বুঝে কতই না দেওয়া হয় ওদের ব্যথা।

অনুভব করি না যে, ওদেরও জীবন

ওদের কাছে কতটা মূল্যবান।

মানুষের মতো ওদেরও -

বাঁচার অধিকার দিয়েছেন ভগবান।

প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ হয়েও

আমরা রাখি না মোদের মান।

তাইতো আমাদের দেখে হয়তো

তাচ্ছিল্য করে আসছেন ভগবান।

এই জীবনের পরম মূল্য

দিয়েছেন যতো গুনীজন,

মানব জাতির তাঁরই রেখেছেন সত্যের সম্মান।

পৃথ্বী যাবে সুষুপ্তির ঘোরে অচেতন।

প্রস্ফুটিত নীরবে তব সুধাগন্ধ তনু,

দানিয়া স্বীয় সৌরভ ইষ্ট-সুশোভন

দেবতায়, ধরিত্রী মাতার ক্রোড়ে, জানু-পাতি

মাগিয়া বিদায়, লভি ধরাতল

ক্ষান্ত হয় কর্ম তব কর্ম যোগিনীর।

নিশার আঁধারে জন্ম যদি, কোলাহল

তব সনে, মানি আমি নহে অগোচর,

বিঘ্ন বাঁধায় সুরধামে তব প্রার্থনা -

প্রেরিতে, ক্ষুদ্র যদিও তবু জানি নাহি -

হয় দেবী দশভূজার যোগ্য অর্চনা

তোমা ব্যতিরেকে। শরতের পথ চাহি

বসি রও হ'য়ে আনন্দ-চিত্ত উন্মুখ।

নিশাজন্মে সেই তব মহা-মহাসুখ।।

দুঃসময়

সুভাষচন্দ্র মজুমদার

আমাদের পৃথিবীটার

বড়ই দুঃসময়।

শিশুকে ভালোবাসার,

ফুলকে ভালোবাসার

কারো হাতে নেই

এক ফোঁটা সময়।

তাই বড়ই দুঃসময়,

বারুদের গন্ধ দুহাতে ছড়িয়ে,

উল্লাসে উড়িয়ে

প্রকৃতিকে ভালোবাসার

সময় গেছে ফুড়িয়ে,

তাই বড়ই দুঃসময়।

সাগরকন্যা কিউবা, সুমাত্রা,

জাভা বিনিদ্ৰ রাত জাগতেই

কখন যে ধেয়ে আসে সেই

বিষাক্ত হায়নার থাবা।

হিংসার আগুনে জ্বলছে,

লোভের আগুনে পুড়ছে

মৌলবাদীর দাবানল আসছে

পৃথিবীর গা বেয়ে

তাই বড়ই দুঃসময়।

পূর্ব – পশ্চিমে,

উত্তর – দক্ষিণে,

বারুদের স্তূপ গেছে জমে

তাই মানুষকে ভালোবাসার

সময় গেছে কমে।

মনে হয় প্রিয় পৃথিবীটা

একদিন হঠাৎ যাবে থেমে।

তাই বড়ই দুঃসময়।

সময়

শিবশঙ্কর বক্সি

কোন কাজেই দিও না ফাঁকি। সময় আড়ালে হাসে,
সময়ের কাজ সময়ে করলে জীবনটা মরে না ত্রাসে।
সময় থাকতে সাবধান হও, সময়কে দিও না গোল,
সময়ে তুমি দেখতে পাবে, জীবনের নানা গন্ডগোল।
সুন্দর মুখের জয়-জয়কার, মনটা খুবই বাজে।
সুন্দর তার চলন বলন, শয়তানি প্রতিটি ভাঁজে।
ফাঁকি দেয় সময় জ্ঞানে, মস্তানি ওদের সহায়,
সময়ের যাঁতাকলে যখন পড়বে, করবে হায় হায়।
সময়ের লেখাপড়া সময়ে সারো, বাড়বে তাতে জ্ঞান,
জীবন হবে ফুলের মত, বাড়বে তাতে মান।
পড়াশোনায় যদি ফাঁকি পরে, সময় দেবে উত্তর,
জীবন তোমার বিফলে যাবে যতই আওরাও মন্তর।
বিদ্যা দিয়েই বিনয়ী হওয়া যায়, এটাই ধ্রুব সত্য,
জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে, পার হতে হবে বিপদের গর্ত।
গুরুজনদের সম্মান করো, হও তাদের অনুগামী,
তাতেই তোমার জীবন ভরবে, আছেন অন্তর্যামী।
সময় মত সঠিক বই পড়ো, তাতেই জীবন শুরু,
চলার পথের অজানা খবর বানাবে শিক্ষাগুরু।
সময় তোমায় পৌঁছে দেবে, স্বপ্নের রঙিন আকাশে,
একাই কর বাজিমাত, সময় আছে তোমার পাশে।

স্বপ্ন

অমিত ঘোষ

স্বপ্ন দেখি না মাথার পাশে তুমি বসে
স্বপ্ন দেখি না জটিল অঙ্ক মিলে গেছে নিমেষে।
স্বপ্ন দেখি না আরশোলার ভয়ে
জেন জি নিজেই আরশোলা হয়।
স্বপ্ন দেখি না রাজপথে ভিখিরির হাতে সোনার থালা
স্বপ্ন দেখি না জীবনে শুধু অমৃত আছে, নেই গরলের জ্বালা।
স্বপ্ন দেখি না তুমিই থাকবে সমস্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে
স্বপ্ন দেখি না দম্পতির সুখী প্রেম করে বিয়ে।
স্বপ্ন দেখি না শান্তির পায়রা এড়িয়ে যাবে চিলের হিংস্র থাবা
স্বপ্ন দেখি না শূন্য পকেটে সন্তান সুখ খোঁজে বাবা।
স্বপ্ন দেখি না পাশ্চাত্য এসে ধাঁধিয়ে দেবে চোখ
পঁচা সংস্কৃতিতে সাজিয়ে দেবে দামি মোড়ক।
স্বপ্ন দেখি সকাল হবে অন্ধকার যাবে ঘুচে
স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যৎ আর থাকবে না সংকটে।
স্বপ্ন দেখি তুমি আমায় দেবে স্বপ্ন উপহার
দিনরাত দেখবো স্বপ্ন চোখ জুড়ে সবার।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো
বিক্রমজিত ঘোষ

কবিগুরু, থাকতে যদি তুমি আজও আমাদের মাঝে;
পেতাম আমরা যদি তোমাকে - করতাম গল্প তোমার সাথে,
তোমার সাথে আমরা পারতাম বলতে কথা।
তোমার সান্নিধ্যে পারতাম আমরা আসতে -
আজ যে তুমি নেই তোমার কথা আজকের দিনে,
আমরা বলি, শুনি অনেকে।
তোমার কথায়, তোমার ভাবনায় আজও চাই আমরা ভেসে যেতে।
রবীন্দ্রনাথ, তুমি যে বিশ্ববরেণ্য, পেতাম যদি আমরা তোমার সান্নিধ্য!
ধন্য আমরা হতাম - আজ শুধু তোমার ছবিতে পরিয়ে মালা,
গাই তোমার লেখা গান; উচ্চারণ করি - তোমার লেখা কবিতা।
এ যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো,
হে রবীন্দ্রনাথ, করো ক্ষমা আমাদের।
হয়তো পারিনি রাখতে তোমার সম্মান,
তা বলে ভেবোনা তুমি -
করেছি তোমাকে কোনোরকম অসম্মান।

ক্ষুধার্ত খুকির আত্ননাদ
মৌসুমী দে

সকাল হতেই ছোট্ট খুকি পা ছাড়িয়ে কাঁদে
কাকভোরে মা যে তার, গিয়েছে ঠিকের কাজে।

খিদের জ্বালায় পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে;
এদিক ওদিক খুঁজে মাকে; রান্নাঘরে হাঁকে

রান্নাঘর জনশূন্য মা কোথাও নাই;
খিদের জ্বালা এবার মাগো কি করে যে সহ!

হঠাৎ দেখে শিকের উপর হাড়ি একখান আছে,
বাবা টা যে কোথায় গেলো? খুঁজে পাই না তাকে!

বাপখান ভবঘুরে; পান করে সুরা সারাদিন ঘোরে
কিছুই কি পরে না মনে? ছোট্ট খুকি টা যে একা ঘরে!

চতুর্দিকে বাবাকে খোঁজে; হাঁপিয়ে ওঠে চৌমাথার কাছে!
হঠাৎ দেখে; "রামধনু" দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে তাকে।

ভগ্ন ষোড়শ স্বপ্ননীর সরকার

দিনটি আজকের 16 ই অক্টোবর ১৯০৫। সকাল থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় সেই ভয়ংকর সত্য আত্মপ্রকাশ করছে। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলো। রাস্তায় মানুষের ঢল। "বন্দেমাতরম" মেয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলমানের হাতে রাখি বাঁধছে। সবাই বলছে, "বাংলা এক ছিল এক থাকবে"। এরই মাঝে প্রতিদিনকার ন্যায় আজও হাসান মিয়া রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে, তবে সকাল থেকে এক পয়সাও ভাড়া নেয়নি। শুধু বলেছে আজ ভাড়া নয় বাবু। আজ দ্যেশের কাজ। বিকেলে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন হাসান, লর্ড কার্জন কি সত্যিই বাংলা ভেঙে দেবে? হাসান জোরে প্যাটেল ঘোরালো 'ভাঙতে দিমনা বাবু, রিক্সায় চাকা থাকতে'। রাত বারোটো। মিছিল শেষ। ক্লান্ত হাসান গঙ্গার ঘাটে রিক্সা রেখে বসলো। হঠাৎ কালো মেঘ। বিদ্যুতের ঝিলিক। একটা নীল আলো এসে রিকশায় পড়লো। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার। শুধু ফিসফিস শব্দে শুনতে পেল "তোর কাজ শেষ হয়নি হাসান। বাংলা এখনো ভাঙা"। তারপর ১২০টা বছর কেটে গেছে। ২০২৫, ১৬ই অক্টোবর, কলেজ স্ট্রিট। সৌপ্তিকের ক্লাসের দেরি হয়েছে। বাস নেই, ক্যাবেও ভাড়া প্রচুর। হঠাৎ মোড়ের কাছে চোখ গেল। একটা কাঠের রিকশা। বছর পঞ্চাশের ধুতি ফতুয়া গায়ে এক রিক্সাওয়ালা। ও বলল যাবে চাচা? কত নেবে? 'ভাড়া লাগবো না। আজ ১৬ই অক্টোবর। মিছিল আসে।' সৌপ্তিক অবাক। কিসের মিছিল চাচা? রিকশা চলতে শুরু করল। রিক্সাওয়ালা শুধু বলল "বাংলা ভাইঙ্গা গেসে বাবু। মানচিত্রে, মনে, ভাষায়। তাই আজও রিক্সা টানতে আইসি। যদি দুইটা মন জোড়া লাগে"। সৌপ্তিক চুপ করে গেল। রিক্সার হাতলে বিবর্ণ লাল - সবুজ ফিতে। গম্বটা পুরনো দিনের মতো। কলেজের সামনে এসে সৌপ্তিক নামলো। পকেট থেকে ৫০ টাকা বের করল। রিক্সাওয়ালা টাকা নিল না। হেসে বললো, পয়সা রাইখ্যা দাও। পারলে দুইটা বাঙালিরে এক কইরো। তাহলেই আমার ভাড়া শোধ। এই বলে রিক্সা ঘুরিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শুধু রাস্তায় পড়ে আছে একটা ভিজে রাখি। তাতে সুতোর কাজে লেখা সরলা দেবী। আজও প্রতি ১৬ই অক্টোবর কলেজস্ট্রিটে কেউ কেউ একটা কাঠের রিকশা দেখে। আর ভেতর থেকে ভেসে আসে "বন্দেমাতরম"।

"আম্রপালি নগরবধু থেকে মুক্তিকন্যা"

শিউলি

আমি আম্রপালি!! বৈশালীর এক বেনামী আম্রকুঞ্জে শিশিরে ভেজা মাটির বুকে আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিল এক মালী। কুলহীন,গোত্রহীন এক কুঁড়ি যেদিন ফুটলো, সমাজ তাকে মুকুট পড়ালো রূপের,যৌবনের। আর কপালে এঁকে দিল এক রাজকীয় অভিশাপ! আমার অপরাধ? আমি যে বড় বেশি সুন্দরী ছিলাম। যে সৌন্দর্য্য কারো প্রার্থনা হতে পারত, তা হয়ে উঠল একটি গোটা রাজ্যের গভীর সম্পদ। আমারও তো হচ্ছে ছিল এক সাধারণ নারী হওয়ার, আমারও তো মনে জেগেছিল এক চেনা পুরুষের প্রেম! কৈশোরে যার চোখের দিকে চেয়ে বেঁধেছিলাম সংসার বাঁধার স্বপ্ন, তা হয়ে উঠলে একটি গোটা রাজ্যের ভোগের সম্পদ। বৈশালীর গণতন্ত্র সেদিন আমায় কোনও পুরুষকে ভালবাসতে দেয়নি। বরং আমার সেই গোপন প্রেমকে কেড়ে নিল,হত্যা করল আমার প্রথম ভালোবাসা। যে সৌন্দর্য্য হতে পারত একান্তে কারও গৃহপ্রদীপ, কিন্তু সবার মাঝে ঘোষণা হলো - "আম্রপালি একা কারও নয়, তার বিয়ের অধিকার নেই! সে নগরবধু, সে সবার!" হয় রে বৈশালী!তোদের রাজনীতির বলি বানিয়েছিলি আমায়। একক ভালোবাসার অধিকার কেড়ে নিয়ে আমার মাথায় তুলে দিয়েছিলি 'নগরবধুর মিথ্যা মুকুট।

সোনার খাঁচায় বন্দি এক বিষণ্ণ ময়ূরী, যার নুপূরের নিক্ষেপে মেতে উঠত রাজসভা! কিন্তু কেউ শোনেনি তার হৃদয়ের নীরবে রক্তক্ষরণ। আমার প্রাসাদ ভরে গিয়েছিল রেশম, কাঞ্চন আর সুগন্ধির মৌতাতে। তারপর একদিন ছদ্মবেশে এলেন মগধের সম্রাট বিম্বিসার। তাঁর অনুরাগে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম এক চিলতে রাজকীয় অনুরাগ। ভালোবাসার সেই ক্ষণটুকু সত্য ছিল, নাকি কেবলই এক সম্রাটের তৃষ্ণা? আমার গর্ভে এল তাঁর সন্তান, অভয়! কিন্তু সমাজ আমায় শুধু দিল 'বারাঙ্গনা'র তকমা, মায়ের পবিত্র আসন নয়। কত রাজা, কত শ্রেষ্ঠী, কত বীর সেনাপতি আমার এক ঝলক হাসির বদলে বিকিয়ে দিতে চেয়েছিল রাজ্য আর ধনসম্পদ। পাওয়ার তালিকায় আমার কোনো অভাব ছিল না, হীরা, মাণিক্য, কাঞ্চন, আর একচ্ছত্র রাজকীয় সমাদর। সবই তো ছিল পায়ের কাছে। কিন্তু আমি তো এসব চাইনি! আমি চেয়েছিলাম শুধু একটি হাত, যা আমায় শতহীন ভালোবাসবে। আমি চেয়েছিলাম এক টুকরো নিভৃত সংসার। যেখানে লোলুপ

চোখের নজর থাকবে না, থাকবে শুধু অধিকার। কিন্তু আমার পাওয়ার খাতা তো শূন্যই থেকে গেলো? আমি নেচেছি, গান গেয়েছি, রূপের মায়াজালে মুগ্ধ

করেছি বিশ্বকে। কিন্তু প্রতি রাতে প্রদীপের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, উৎসবের কোলাহল শেষে আমি সারারাত একা কেঁদেছি। মানুষ ভালোবেসেছে আমার দেহ, আমার নৃত্য, আর আমার মোহময় রূপ। কিন্তু আমার আত্মা? সে তো চিরকাল থেকে গেছে তৃষ্ণার্ত, অনাহার! আমার রূপই ছিল আমার অহংকার, আর সেই রূপই ছিল আমার জীবনের চিরন্তন কারাগার। আমি বৈশালীর গৌরব ছিলাম, আবার বৈশালীর সবচেয়ে বড় পাপের সাক্ষীও। তারপর... একদিন আমার নগরে এলেন এক মহামানব। তাঁর চোখে কোনো কামনার আগুন ছিল না, ছিল না কোন অধিকার বোধের অহংকার। ছিল করুণার মহাসমুদ্র। তিনি গৌতম বুদ্ধ!! প্রথমবার কোনো পুরুষ আমার দিকে চাইল— না ভোগের নজরে, না ঘৃণায়। চাইল শুধু অগাধ করুণা, পরম ভালোবাসায় প্রকৃত শ্রদ্ধায়! রাজপুরুষদের ঐশ্বর্যের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করলেন আমার সামান্য আমন্ত্রণে আত্মার ভিক্ষা। যে নগরী আমায় পাপের সাগরে ভাসিয়েছিল, পতিতা বানিয়েছিল, সেই নগরীর সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ আমায় দিলেন পরম মুক্তির আলো। আমার সব অলংকার, সব রূপের অহংকার, আমার প্রিয় আত্মকানন, আমার রত্নখচিত অলংকার, মুখের সমস্ত প্রসাধন -সব সঁপে দিলাম বুদ্ধের চরণে। আমার অহংকারের কালো চুল নিজ হাতে কেটে আমি মাথা মুন্ডন করলাম। আমার রেশমি বস্ত্র ছেড়ে পরিধান করলাম জীর্ণ কষাণ বস্ত্র। নগরবধূ আত্মপালি সেদিন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। জন্ম নিল এক শান্ত ভিক্ষুণী! যে খুঁজে পেয়েছে জীবনের আসল সত্য- "অনিচ্ছ" আর "নির্বাণ"। আমার জীবনে আলো-অন্ধকারের খেলা ছিল; ছিল প্রেম হারানোর যন্ত্রণা, রাজকীয় হলনা, আবার বুদ্ধের চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমি কোনো অবাস্তব কাল্পনিক দেবী নোই, আমি রক্তমাংসের এক নারী, যে নিজের নিয়তিকে নিজেই অতিক্রম করেছিল। আজও বৈশালীর বাতাস বয়ে যায় আত্মকাননের উপর দিয়ে।

আমার নুপুরের ছন্দ কি শুনতে পাও তোমরা? সেখানে কোনো কামনার আত্মকান নেই-

সেখানে আছে এক নারীর শৃঙ্খল ভাঙার গান আর সোনার খাঁচা ভেঙে অনন্ত মহাশূন্যে উড়ে যাওয়ার এক ঐতিহাসিক আত্ননাদ! আমি আত্মপালি!! আমি রূপের বন্দি, আর অবশেষে সত্যের মুক্তিকন্যা!

মান মানে কচু

বাপি সিনহা

বছর কুড়ি আগেও কিছুই ছিল না নরেশ বাবুর।

স্কুল মাস্টারি করতেন ভদ্রলোক

টাকা জমি বাড়ি সোনা কিছুই ছিল না তার।

কেবল মান টুকু ছাড়া;

আসলে সাদাসিধে মানুষটা ছিলেন সৎ সম্মানীয় ছিলেন সবার কাছে।

বছর কয়েক হলো স্কুল মাস্টারি ছেড়েছেন নরেশবাবু

এই ক'বছরে নানান ঘাটের জল খেয়ে

টাকা কামানোর নানান রকম ফন্দি জেনেছেন তিনি।

স্বনামে - বেনামে অনেক ব্যবসা তার

নানা স্তরের মানুষের অবাধ যাতায়াত

জমি বাড়ি গাড়ি মোবাইল এই সব কিছুই হয়েছে তার

সম্পদ বাড়ছে হু হু করে কেবল মান টুকু বাদে।

পাঁচজনে, পাঁচ রকম কথা বলে

কিছুতেই কিছু যায় আসে না নরেশবাবুর।

পুরনো দিনের কথা-সততা আদর্শ কথা মনে করিয়ে দিলে

উনি প্রথমে দুর্বোধ্য মুচকি হাসি হাসেন।

তারপর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন -

মান? মান আবার কোন বস্তু হে?

মান মানে তো কচু।

নাজমা সুলতানা

শঙ্কর রায়

নাজমা, ১৪ বছরের কিশোরিটি প্রেমে আঘাত পেল,
বাবা - মার বেদম প্রহারে প্রানটা ওষ্ঠাগত হলো।
মাত্র ১৪ বছরের কাঁচা জীবনটা শেষ করে,
বাবা - মাকে একটা চরম শিক্ষা দিতে চাইল।
ঐ দুধে আলতা রঙা নাজমা।
কীটনাশক খেয়ে নাজমার জীবন যমে - মানুষে
টানাটানির জায়গায় চলে এলো।
ওর আঁখি যুগল প্রথমে বিবর্ণ হতে লাগলো।
ওকে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে
মেদনাপুর এর এক নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলো।
দুজন এমবিবিএস ডাক্তারবাবু বললেন,
এর শরীরে বিলক্ষণ প্রাণ নেই।
নাজমার বাবা - মা হাউমাউ করে কাঁদছে
আর বলছে ডাক্তার বাবু, আর একবার ওর প্রাণটা ফিরিয়ে দিন না!
ডাক্তারবাবু, আর একবার ওর প্রাণটা ফিরিয়ে দিন না!
হার না মানার পাত্র অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে থাকা টেকনিশিয়ান বলছে,
ওর শরীরে অবশ্যই প্রাণ আছে, হার্টবিট চলছে,
কবরের মাটি থেকে বেরিয়ে এলো নাজমার জীবন্ত প্রান।

শতবর্ষে ঋত্বিক সলিল স্মরণে

গৌর চন্দ্র দাস

ঋত্বিক ঘটক ও সলিল চৌধুরীর আগমন আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁদের অমোঘ কীর্তিকে কথায়, গানে, কবিতায়র মধ্য দিয়ে স্মরণ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে অসংখ্য অনুরাগীরা একত্রে ব্রত হয়েছি। ঋত্বিক ঘটক নাটক লিখতেন পরিচালনা করতেন। নিমাই ঘোষের দলে অভিনয় করেন প্রথমে, নিজে পরিচালনা করেন “নাগরিক”। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি “অযাত্রীক” পড়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র তৈরি করেন। তিনি উদ্বাস্ত হয়ে এপার বাংলায় আসেন। ছিন্নমূল মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ও সেই সময় উদ্বাস্ত সমস্যা তাঁকে ব্যথিত ও বেদনা মোহিত করে তোলে। সেই বাস্তব সমস্যার কথা তার ছবিতে প্রতিফলিত হয়। “কোমল গান্ধার” যেখানে ব্যবহার করেন। নবজীবনের গান যা সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটে। চারের দশকে তিনি গণআন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময় গণনাট্য সংঘের দারুণ সুনাম ছিল। নামিদামি শিল্পীর মিলনস্থল। কলকাতা স্টুডিওর সাধারণ টেকনিশিয়ানদের নিয়ে সংগঠন করেন এবং তাঁর মধ্যে রাজনীতির চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। একদিকে তিনি ছিলেন আপসহীন ব্যক্তি। তাঁর তৈরি করা চলচ্চিত্র গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে তুলে ধরে। তাঁকে বারংবার লড়াই করার অবস্থা চালিয়ে যেতে হয় এবং গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেন। ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টিতে ছিল শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর শিল্প কর্মই প্রতিবাদের মাধ্যম ছিল। বর্তমানে যা ব্যতিক্রমী ও অন্যায়ের প্রতিবাদ লেশমাত্র নেই। ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর সমসাময়িক গুরু দত্তের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে তাদের নিজেদের জীবনের ছায়া পড়েছে। একজনের “কাগজকে ফুল” এবং ঋত্বিকের “কোমল গান্ধার”, “যুক্তি তর্ক” আর গল্পে দেখা যায় ছবির মধ্যে। দুইজনেরই জীবন ছিল ঘটনা বহুল এলোমেলো। এই কাজের মধ্য দিয়ে সিনেমার ফর্মের যথার্থ নাটকীয়তা এবং নব ভারতীয় জাতির রাষ্ট্রের আধুনিকতা দুই এর এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। সেই কথা ভেবে

আজকের দিনে ঋত্বিক ঘটক সমসাময়িক সলিল চৌধুরীর মত কবি শিল্পীর প্রয়োজন। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বিশালত্ব বোঝাতে গেলে আমাদের দেখতে হবে রানার কিভাবে গান হয়ে উঠলো, তার জীবনে স্বপ্নের মত পিছিয়ে পড়ে যায় বোন, আরো পথ বুঝি হয় লাল ও পূর্বকোণ। রানার দৌড় তার পথ পরিক্রমার সাথে পালাতে থাকে। ভোরের ইঙ্গিতের সাথে সাথে ভৈরব রূপের ছায়া আমরা দেখতে পাই সংগীত সৃষ্টির রহস্য।

অধিকার কে কাকে দেয়? বাঁচার অধিকার সংগীতটি মিলিত কণ্ঠে এক অসাধারণ সংগ্রামী মুহূর্ত সৃষ্টি করে। সলিল চৌধুরীর গানের মধ্যে ছিল এক সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা। যা ভাষা ধর্ম বা অঞ্চলের বিভেদ অতিক্রম করে সবাইকে এবং দেশকে অদম্য জাতীয়তাবোধ ও একাত্মতার অনুভূতিতে আকড়ে ধরে। “মানবো না বন্ধনে”, “পথে এবার নামো সাথী”, মার্চের ছন্দ প্রত্যক্ষভাবে শোনা যায় এইসব গান থেকে। “পথেই হবে এই পথ চেনা”, “আমি বাড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা”, যাত্রা পথে সলিল চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরে একটি জংশন। চিন্তাভাবনায় নতুন পথের ভোরের সূর্যের মতো আলো দাতা। তার সঙ্গীত সভতার মশাল দৌড়, কোন এক সময় সংগীত জগতে দিকপালরা যখন কাজ করতেন। সলিল চৌধুরীর যে কোন গান, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন জায়গায় বলে দেওয়া যেত। তার গানের বাঁক, মোর একদম আলাদা। তাঁর সৃষ্টি থেকে যাবে সকল মানুষের মনে। এক বাঁক পায়রা আকাশে বাতাসে ছরিয়ে দেবে তার সুর। “আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা”, “দুরন্ত ঘূর্ণি - এই লেগেছে পাক”, এই গানগুলি আজও প্রগতিশীল মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এগিয়ে চলার পাথেয় সঞ্চিত করে, সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। সলিল চৌধুরীর নানা অঙ্গীকার গান কবিতা ও নৃত্য আজও দিকবিদিকে পরিবেশিত হচ্ছে ও হবে। এই সমস্ত কালজয়ী বৈপ্লবিক গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়ে গেছেন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এখানেই গীতিকার, গণসংগীত শিল্পী, সলিল চৌধুরীর অনন্য অবদান অনস্বীকার্য।

প্রকৃতি

নকুল সাধু

প্রকৃতির সাথে চলো, প্রকৃতির কথা বলো
নইলে পরে কখনো কলেরা, কখনো করোনা কেড়ে নেবে শত শত প্রাণ।
গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও।
প্রকৃতি মোদের মায়ের সমান, আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, বাঁচায় যে প্রাণ।
গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও, একটি গাছ একটি প্রাণ।
জলের আরেক নাম জীবন হলে –
জল ছাড়া কি জীবন চলে?
জল বাঁচাও, গাছ লাগাও, সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন চালাও।
একটি গাছ - একটি প্রাণ, গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও।
অকারণে কেটোনা গাছের ডাল,
কেটে কেটে দুনিয়ার হয়েছে কি হাল!
গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও, একটি গাছ একটি প্রাণ।
গাছ লাগালে নদীর পাড়ে, শেকর মাটি আঁকড়ে ধরে,
ভাঙতে দেয় না নদীর কোন বাঁধ।
গাছ লাগাও বাঁধ বাঁচাও, গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও।
গাছ লাগাও রোগ তাড়াও,
নিজের স্বার্থে গাছ কাটলে, প্রকৃতিতে কমবে অক্সিজেন
সুস্থ মানুষ রোগী হবে।

মঙ্গলময়ী মা

সন্ধ্যা মন্ডল

মর্তে খুশীর জোয়ার আনে, তোমার আগমন
হৃদমাঝারে সদাই পাতা, তোমার সিংহাসন।
দিকে দিকে সাজ সাজ রব, পেয়ে তোমার আগমন বারতা
প্রকৃতি সেজেছে ঝলমলে সাজে, খুশী আবালবৃদ্ধবনিতা।
তোমায় বরণ করব বলে, আল্পনা আঁকি সদর দরজায়
শঙ্খনাদ আর উলুধ্বনি, আসবে কখন সেই প্রতীক্ষায়।
মাত্র চারটি দিনে ভুলিয়ে দিলে, ভয় ও ভাবনা
তোমার ভয়ে নিশাচরেরা, পেঁচার মতো বেরয় না।
মাগো তোমার অশেষ কৃপা, সবার প্রাণে জাগাও আশা
দুঃখী ভোলে মনের দুঃখ, ক্ষুধার্ত ভোলে ক্ষুধা পিপাসা।
দুঃখ কষ্টে জরাজীর্ণ, অনশন ক্লিষ্ট সংসার
তোমায় পেয়ে সব ভুলে যায়, থাকে না কারো মুখটি ভার।
যেয়ো না মাগো একলা ফেলে, নিষ্ঠুর পৃথিবীতে
মানুষরূপী হায়নার দল, ওত পেতে আছে দিনে রাতে।
বিসর্জনের ঘন্টা বাজলেই, বিদায়বেলার আয়োজন
দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে, কৈলাসে প্রত্যাবর্তন।
কদিনের তরে এসেছিলে মা, ছাড়তে চায় না তোমায় মন
আত্মভোলা বাবা ভোলানাথ, তোমার আশে গুণছে ক্ষণ
আশায় আশায় বুকটি বেঁধে, রইনু মোরা পথটি চেয়ে
আসছে বছর এসো মাগো, নব আলোকবর্তিকা নিয়ে।

জীবন বোধ
কল্যাণ আচার্য্য

স্তব্ধ অভিযান
উদয় কুমার সাহা

জীবন নদীর ধারে বসে,
একটা গভীর শ্বাস নিলাম।
কাছে কোথাও গন্ধরাজ ফুটেছে,
হাসনুহানাও হতে পারে,
ঠিক বুঝতে পারলাম না,
বাতাসে শুধু পোড়া মাংসের গন্ধ,
সে গন্ধে মিশে আছে,
কত চেনা মানুষের গায়ের গন্ধ।
ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে,
গভীর থেকে তুলে আনা স্বপ্ন গুলো,
পাড়ে আছড়ে পড়েই ভেঙে যাচ্ছে
জলের রেখায় থেকে যাচ্ছে স্মৃতি,
কালের নিয়মে হারিয়ে যাবে একদিন,
পরে থাকবে কয়েক মুঠো ছাই।
দিগন্তে অন্তিমিত সূর্য্য,
প্রস্তুতি নেবে নতুন সকাল হওয়ার।

হঠাৎ কোন একখন থেমে যাবে হৃদস্পন্দন।
নীরব হবে সব অভিমান
স্তব্ধ হবে সব অভিযান।
চাওয়া-পাওয়া স্বার্থের টান
বন্ধ হবে দান প্রতিদান।
যাদের সাথে ছিল ওঠাবসা
হঠাৎ শুনবে পরলোক বার্তা।
কেউ বলবে বাঁচা গেল
কেউ বলবে আপদ গেল।
কেউ করবে হাছতাশ
কেউ করবে দুঃখ প্রকাশ।
জানি অনেকে পেয়েছে কষ্ট
কারণ কথা ছিল স্পষ্ট।
আজ মনে হয় নীরবতাই ছিল শ্রেষ্ঠ
মেকি অহংকারে করেছি তুচ্ছ।
জীবনে ক্ষমাই আদর্শ - ক্ষমার নেই প্রতিশব্দ।
মৃত্যুদূত আসার আগে চাই কলুষ মুক্ত হতে।

আসলে

সুনির্মল মিস্ত্রি

স্বপ্ন যেখানে দাঁড়িয়ে যায়
সেখান থেকেই ঝরে পড়ে ছাই
প্রতিটি মানুষ চাকরিজীবির মত
গোনা দিন খরচ করতে করতে
একদিন কাঙাল হয়ে
আঠারো মোকামের কাছে এসে দাঁড়ায়
আর সেখানেই জ্বলে অদৃশ্য এক বাতি

Little Gift from Mother Nature
Arjab Mukherjee

The boy stood quiet in the prayer room light,
His eyes were full of tears that night.
“Maa is gone,” he softly sobbed.
“Why did she leave? Why have I been robbed ?
A teardrop fell onto the floor so still,
A tiny drop, yet the room felt chill.
Then he went to say goodbye at Maa's bed,
With flowers and prayers for all she'd said.
When he came home, he wiped his eyes,
And saw some ants where the teardrop lies.
They were so thirsty, weak and small,
But drank his tear and felt life's call.
The boy watched as the ants moved on,
Strong once more now the tear was gone.
And in his heart a calm voice spoke,
“Maa may not be here, but love's not broke.”
She may not stand right by your side,
But through you, Maa still cares and guides.
Her love lives in all your deed
Helping the small, the weak, in time of their need.

রিলস- সামাজিক অবক্ষয়

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেনে বাসে হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষা করছেন, অন্যের ফোনে বিভিন্ন ধরনের হাহা হিহি ব্যঙ্গাত্মক শব্দে কান বালাপালা হয়ে উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একদল গল্প বানায় অন্যরা উপভোগ করে, সময় কাটায় যাকে বলে রিলস। গান, অডিও ব্যবহার করে নিজের ছবি ভিডিও সাজানো হয়। কখনো সৃজনশীলতা শালীনতাকে অতিক্রম করে। ২০১৯ সালে ব্রাজিলে পরী শুরু হয়। ভারতে প্রথম টিকটক ব্যবস্থা চালু ছিল। ফেসবুক রিলস ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়।

পেশার সংজ্ঞা বদলে এখানে যুক্ত ব্যক্তি মাসে হয়তো টাকা আয় করতে পারে, তবে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। রিলস তৈরিতে স্টেশন, হাইওয়ে, ট্রেন লাইন, স্টেশন, ব্যবহার করতে গিয়ে জীবনকে আত্মাহুতি দেয়। কিছু রিলস সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষতিকর ভাবে ব্যবহৃত হয়, রিলস তৈরি করতে ঘাড় নিচু করে থাকতে হয় অথবা যিনি দেখেন তারাও হাতে ঘাড়ের ব্যথায় তারা কাবু হয়ে পড়েন। রিউমোলজিস্টরা বলেছেন এই ব্যথা বেদনার কারণ হলো পনের থেকে কুড়ির ডিগ্রি পর্যন্ত ঝুঁকি থাকা।

৪ঠা জুলাই ২০২৫ অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল পিজি হসপিটালে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'শোয়ার কন' ২০২৫। উপরের কথাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন ডাক্তার ঘোষ। তারা আরো বলেন মোবাইলে কথা বলার জন্য হাত একটি নির্দিষ্ট কোণে টেনে রেখে দেওয়ার জন্য বাড়ছে কার্পেল ট্রান্সাইল সিনড্রোম যার লক্ষণ কজিতে ব্যথা হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাবার মতো অনুভূতি, হাতে দুর্বলতা ইত্যাদি। পড়াশোনা, রাগ, সুর, খেলা, রান্না, ভ্রমণ ইত্যাদি উপকারে লাগে। যারা তৈরি করেন তাদের যোগ্যতা সম্পর্কেও ভাবতে হয়। অত্যধিক রিলস ব্যবহার করায় পড়ুয়া, কর্মচারী, সিনিয়র সিটিজেন, প্রত্যেকের এটেনশন স্প্যান দেখা যায়। জীবনে ধৈর্যতা ক্রমশ কমে আসে। পুরনোকে নতুন ঘটনা বলে প্রচার, ফেক ছবি পোস্ট করা, কখনোই ঠিক নয় মোবাইলে বুঁদ হওয়ায় জীবনের খাতা থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে আড্ডা, গল্প, বইপড়া, শিশুদের চোখের উপর চাপ বাড়ছে, মনের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন রিলসের মাধ্যমে 'রিচ লাইফ স্টাইল' এবং 'বিউটি স্ট্যান্ডার্ড' দেখে জীবনের সঙ্গে একাত্মের চেষ্টা করে বিফল হওয়ায় ডিপ্রেসন এবং অ্যাংজাইটিসের শিকার হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের তাগিদে, রিলসের উপরে রাস টানতেই হবে।

মংপুর স্মৃতিকথা
চৈতালি বোস

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি".....

আমাদের সকলের মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা দার্জিলিং জেলার কাশিয়াং মহকুমার অন্তর্গত পাহাড় ঘেরা একটি ছোট গ্রাম, "মংপু"। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম মংপুতে এসেছিলেন ১৯৩৮ সালে। মংপু ছিল সিঙ্কোনা তৈরির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি প্রথম মংপুতে এসে সিঙ্কোনার "সুরেলা বাংলোতে" থাকলেও তার মনের মতো ছিল না সেই বাংলোটি। তারপর তিনি ডক্টর মনমোহন সেন এর অফিসের কোয়ার্টারে থাকলেন। ডঃ মনমোহন সেন ছিলেন মৈত্রী দেবীর স্বামী, যার জন্য কবি জীবদ্দশায় চারবার মংপুতে গিয়েছিলেন সেই মৈত্রী দেবী ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখিকা ও ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল "ন হন্যতে" ও "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"।

১৯৪০ সালের ২১ শে এপ্রিল চতুর্থবার বা শেষবারের মতো কবিগুরু মংপুতে আসেন সেইবার ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিন সেখানেই পালিত হয়। সেই ৮০ তম জন্মদিন কবির মনে গভীর রেখা পাত করে, সেই সঙ্গে সকল পাহাড়ি নরনারীদের কবিকে প্রণাম ও ফুল দিয়ে আতিথেয়তা কবির সঙ্গে তাদের সুখালাভ কবির মনকে উৎফুল্লে ভরিয়ে তুলেছিল। এখানে বসেই কবি লিখেছিলেন "জন্মদিন", "নবজাতক", "সানাই", "মংপু পাহাড়", "ক্যামেলিয়া" এইরকম অনেক বিখ্যাত কবিতা আজও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে, "মংপু রবীন্দ্র ভবনটিতে"। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কবির স্মৃতি তাঁর ব্যবহৃত খাট, বিছানা, রং তুলি, কলম সবকিছু আজও একই রকম আছে। অভিনব পদ্ধতিতে তৈরি তাঁর স্নানাগার আজও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কবির ব্যবহৃত মেহগিনি কাঠের খাট ও তার নিজস্ব নকশায় তৈরি টেবিল চেয়ার বিভিন্ন আসবাবপত্র দেখলে মনে হয় কবি বুঝি আজও এখানে বিরাজমান।

কবির পাহাড়ি লোকদের প্রতি ভালবাসার অফুরন্ত প্রকাশ আজও আমরা দেখি, সেখানে স্তরে স্তরে সাজানো বিভিন্ন হোমিওপ্যাথি ওষুধ যা কবি নিজের জন্য ও সকল গ্রামবাসীর জন্য ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ এর "মংপু" তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও ভালোলাগার জায়গা গুলির মধ্যে একটি অন্যতম স্থান হিসেবে আজও পরিচিত।

আমার বাবা
গৌরাঙ্গ দেবশর্মা

বাবা আমাকে আর দেখতে পায় না
বাবা কি অন্ধ হয়ে গেছে?
অথচ আমি প্রতি রাতে শুতে গেলেই
বাবার ঘরজুড়ে পায়চারি শুনতে পাই
আমি বেশ বুঝতে পারি বাবা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে
সামনে অন্ধকারের জট খোলার চেষ্টা করছে।
এত কাছে আমি তবুও বাবা আমাকে দেখতে পায়না
আমি নিভু নিভু চোখে দিব্যি দেখতে পাই
বাবা অন্ধকারের চৌকাঠ পেড়িয়ে আলোর
এপাড়ে আসার চেষ্টা করছে।
চশমার গাঢ় লেন মুছতে মুছতে
বাবা ক্রমশ চৌকো হয়ে যায়।
তখন আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারি না
সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সময়
ক্রমশ ছিঁড়ে ফেলে আমাকে।
"বাবা " বলে চিৎকার করলেই
বাবা কেমন হকচকিয়ে যায় আর
আলমারির পিছনের কালো তরল অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে।

হারায় চিঠির গর্ব
দীনেশ চন্দ্র হাজারী

আজকাল রমারা থাকে কখনো দিল্লী কখনো ফিরদাবাদ,
মুঠোফোনে ডাক দেয় অবিরল বাঙালির চিঠি যায় বাদ।
বিজনদের চিঠিতে এখন কৈফয়ৎ আর কূটনীতির বায়না,
মনের ব্যাথা কত, বুঝিয়ে দিত স্ববির চিঠির আয়না।
চিঠির পথ চেয়ে থাকেতা বসে প্রিয়তমা নয়না।
চিঠির আশায় প্রহর কাটায় তবু চিঠির দেখা হয়না।
কান্ন- হাসির সুখ-দুঃখে তির হতো চিঠি,
স্বজন সখা হাতে নিয়ে হসতো মিঠি মিঠি।
চিঠি আজ বন্দী থাকে মিউজিয়ামের ঘরে,
সলফি-এস,এম,এস, ভেসে আসে ইথারের বরে।
কানে - কানে হয় কথা গাপন মনের ব্যাথা,
সাগর পেরিয়ে ছুটে আসে মুঠোফোনে সই কথা।
ভালোবাসা - ভালোলাগার চিঠি হারায় কালের গর্ভে,
যবিনকা হয়ে ফিরে আসে চিঠি সমর্পণের মর্মে।
চিঠি নেই কাব্য নেই, নেই প্রতিশ্রুতির অর্ঘ,
আসে না ফিরে সংসার ধামে আশ্বাসের স্বর্গ।
চিঠি থাকে লাল পাগরির হাতে শান্তির আঁচড়ে,
হারিয় ফেরে চিঠি দ্বারে দ্বারে সেলফোনের পাঁজরে।
আলোর পথে বিজ্ঞান ছোট্টে নিয়ে নতুন পর্ব,
দিন বদলায়, কাল বদলায়, হারায় চিঠির গর্ব।।

তোমার কথা

কাজল দাস

লাল টিপ খোলা চুলে দেখে তোমায় গিয়ে ভুলে।
নদীর তীরে একলা বসে গিয়েছি শুধু অঙ্ক কষে।
তোমাকে পাবার অঙ্ক শুধু তোমাকে নিয়ে সব কষা।
তোমাকে দেখতে পাবো বলে সকাল বিকাল গিয়ে বসা।
কৃষ্ণচূড়ার তলায় গিয়ে কোকিলের গানের সুরে।
তোমার কথা ভেবে ভেবে হারিয়ে যাই বহুদূরে।

আমি একা নই

সুতপা দেবনাথ

চোখের তারায় তাকায় লষ্ঠন ঝুলিয়ে
বারবার সমুদ্র পাহাড়ের আনাচে কানাচে খুঁজছি
লষ্ঠনের আলো বড়ো কম
আবছা আলোতে সুপষ্ট দেখলাম
কুয়াশার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে একঝাঁক মানুষ
কি যেন তাদের তাড়া
খুব দ্রুত যেতে হবে
যেতে তো হবেই
নির্জন হতে হতে চোখে ভেসে ওঠে
সমুদ্রের অগাধ জলরাশি
চিকচিক করছে তাতে আলো পড়ে
চোখে বিভ্রম জাগে
একদল অশ্ব ছুটে চলেছে জল ভেঙে
কোথায় যেন তাদের যাওয়ার তাড়া
যেতে হবে, যেতে তো হবেই
আজকাল নির্জন হতে শিখছি।

সংসার পরিবার

একটা আকাশ

আনন্দধারা শারদসংখ্যা ২০২৬

অগ্নিদূত

গণেশ চন্দ্র রায়

কত সংসার পরিবার
ভেঙে হয় চুর মার
ভাঙা সংসারে যদি
জোড়া কভু লয়
মানুষ রয়েছে আজ কত অসহায়।।
থাকলে নিজের ঘরে মধুর হাসি
সুখের সাগরে তুমি যাইবে ভাসি
কত জনা কত কথা বলিবে তোমায়।।
মানুষ মানুষকে দিতে চায় সুখ
যার ঘরে কেহ নাই তার বড় দুখ,
নিজের মানুষকে যে জনা হারায়।।
গণেশ বাউল আজ গাইছে গানে
সুখ দুঃখ কিছু নাই তাহার প্রাণে
বেঁচে আছি প্রভু শুধু তোমার দয়ায়।।

দুঃসময়

বিভু মুখোপাধ্যায়

আজ মনে হয় আমাদের বড় দুঃসময়
আগামীতে আসবেই আবার সুসময়
সাথে আছো তুমি সময়-অসময়
প্রতিকূল সময়ে সম্মুখে ভেসে ওঠে
শুধু তোমারই ছবি।
মানুষ গড়ার কারিগর,
তোমার কথাই মনে পড়ে

একটা আকাশ সকালবেলা সূর্য প্রদীপ ভালে।
আর এক আকাশ ভালোবেসে বোধের কথা বলে।।
একটা আকাশ হারিয়ে গেছে কালো মেঘে ঢেকে।
প্রিয়ার চিঠি পড়েই আছে বুক পকেটের তাকে।।
একটা আকাশ লক্ষ তারায় জ্বালে সাঁঝের বাতি।
সেই আকাশে ছড়িয়ে পড়ে দীপ্ত আলোর ভাতি।।
এমন করে আকাশ জুড়েই রঙ বাহারি মেলা।
জীবনে তাই আলোর খোঁজে ভাসিয়ে দিই ভেলা।।

সংগ্রাম-আন্দোলনের মাঝে।
তোমারই সুহৃদ সাথী তিনি বিদ্রোহী কবি।
অস্থির মুহূর্তে অস্থির চিন্তা না হয়েও –
সকলেই এগিয়ে যাও।
চড়াই-উতরাই কন্টাকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে,
অস্থিরতার মাঝেই স্থির হয়ে –
স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবোই আমরা
সুসময়ের জন্য,ই দুঃসময় পার হয়ে।।

এলাও ভুলিবার পাণ্ড নাই
অনিল সাহা

দিনহাটায় ছোট্ট একটা গেরাম
এক ডাকত সগায় জানে নান্টু বর্মন নাম
দাদা কৈরেছে মাস্টারি,জমি চাষে গিরীন
সমাজ সংসারেতে দুই ভাই রাখেছে রাজবংশীর মান
আর কাহোই নাই বাড়িত ডাঙর একনা বাড়ি
হামার বাড়ি বক্সির হাটত দিনহাটা কলেজে নেকা পড়ি
নান্টু বর্মন ভাত দেছে,থাইকবার দেছে ঘর
অভিনন্দন দেবার ভাব ও ভাষা নাই হামার
কাহাকো কোন দিন বয়া বুদ্ধি নাই দেয়
উয়াক পরশ পাইসে সগায়
অল্প বয়সত নান্টু অকালে গেইল যমের বাড়ি,হায়!
উমার মতো দরদী ও মরমী মানষী কয় জনায় হয়।
জন্মিলে মরিবার নাগে,জানি সগায়
কাহো কাহো জানিয়াও অবুজা হয়। যায়।
চলি গেইছে অকালত মাইন্য নান্টদা মোর
এলাও ভুলিবার পাণ্ড নাই উয়াক তার ব্যাভার আর চাতুরী কাতার।

দূরে কোথাও দূরে দূরে
দেবযানী সেনগুপ্ত

চাঁদের জ্যোৎস্নার বানভাসি আলোয় উদ্ভাসিত তিস্তা আর তিস্তাপাড়ের ছোট্ট শহর জলপাইগুড়ি। চাঁদের হাসির সুরে সুর মেলায় বেণুরব। আকাশ বাতাস মাতাল করা জ্যোৎস্না আর মন উদাস করা বেণু ধ্বনি। জ্যোৎস্না আর বেণুবীনার যুগল সঙ্গতে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ উত্তাল ছিল এতোদিন। জ্যোৎস্নার(জ্যোৎস্নেন্দু) হাতে ছিল গদ্যের ডালি আর বেণুর হাতে কবিতার মালিকাগাছি। গদ্য - পদ্য , জ্যোৎস্নেন্দু আর বেণু একসাথে পাড়ি দিলেন অনেকটা পথ পাশাপাশি। জ্যোৎস্নালোকের বেণুধ্বনিতে জলপাইগুড়ি ভাসতো এক সুরবিতানে। কালের অমোঘ নিয়মে মেঘ ঢেকে দিলো চাঁদকে! গভীর অমানিশা ঘনিয়ে এলো, চলে গেলেন জ্যোৎস্নেন্দু চত্রবর্তী। জোছনা করেছে আরি, তাই বাজেকি আর বেণু ধ্বনি! একদা জ্যোৎস্না হারিয়ে নীরব হয়ে গেল বেণুরবও! চলে গেলেন বেণু দত্ত রায়।

পৃথিবীর অপর প্রান্তে হয়তো এখন আলোকিত জ্যোৎস্নায় বাজছে মধুর বেণু সুর! মৃত্যুর পারাপারে দুই সখা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যান দূরে কোথাও দূরে দূরে.....!!

আমার স্বদেশ
সুনীল শর্মাচার্য

আমার স্বদেশ জুড়ে কত নিরালোক
কখনো আঁধার, আলো, বিষম্ব আকাশ,
কখনো বিক্ষুব্ধ বায়ু, দুঃখ বারোমাস।
আড়ালে মুখোশ ঢাকা সাপের নির্মোক্ষ,
তুখোড় চাতুর্য-ভরা মানুষের চোখ
সমাজ আদলে শুধু ভেক্কির বাতাস,
যন্ত্রণা তরাসে মরে কখনো উদাস
কৌতুকী প্রেমিক কেউ ভাবে শান্তি হোক।
হাজার বিচ্ছেদ নিয়ে, চোর কাঁটা নিয়ে

আমার স্বদেশ ভূমে মাটি, ফুল, ফল,
নক্ষত্র, আকাশ, পাখি, বন, নদী, জল---
আমার অস্তিত্ব এরা, কত রক্ত দিয়ে
দেশের গড়ন তৈরি; ক্ষুধিত আলয়---
পূর্ণতা জ্বলেছে কত আলোর বলয়!

সে তুমি

মনোরঞ্জন হালদার

বিপদ কালে

সমীর কুমার প্রতিহার

সে তুমি কখনো নীরবে মনের ভেতরে
কখনো বা অনুভবে অন্তরে বাহিরে
সুন্দরের পসরায় রূপের মহিমাতে
কখনো বা মায়া জড়ানো খুশির হাসিতে
সে তুমি কখনো বা শান্ত নীরব নিস্তব্ধ
ভালোবেসে বেসে ভালোবাসায় অনুরক্ত
হয়ে রয়ে অসীম অনন্ত দুরন্ত যৌবন
ভেবে ভেবে মন ভরে যায় জানিনা কখন।
কখনো বা ঢেউ খেলানো সাগর কিনারায়
রূপে অরূপে অভূতপূর্ব বর্ণা ধারায়
বারেক ভাবে মন, যেনো দেখি দুচোখ ভরে
সে শুধু তারি তরে নিত্য নুতন করে।
লিখি কতো না বলা কথা, কবিতা ও গান
মনে করে সে তোমায়, জুড়ায় মনো প্রাণ
বুঝিনা কেনো যে তায়
এতো এতো ভাবি নয়নে নয়নে
ভেবে ভেবে, সে তোমায়
মনে প্রাণে জীবনে ও মরণে।

পাতার পরে পিঁপড়ে মাঝি ফড়িং সাথে চলে,
মনের সুখে গান ধরেছে যাবে ভেসে বলে।
গাছের পাতা পড়লো খসে হঠাৎ দমকা ঝড়ে,
মিলে মিশে ছিল তারা দোঁহে সখ্য গড়ে।
নদীর জলে যাচ্ছে ভেসে অজানা কোন্ পুরে,
নাহি জানি ভিড়বে কোথায় অচেনা কোন্ দূরে।
যাচ্ছে ভেসে বলছে হেসে আর কতটা যাবো,
শুধুই চলে নাহি থামে, বাঁচার দিশা পাবো
এমন সময় উড়ো পাখি ধরলো ঠোঁটে পাতা,
নিয়ে গেল নদীর তীরে তিনি এখন ত্রাতা।
বললো তাদের, ভয় করোনা থাকবে আমার কাছে,
গাছের ডালে নিরাপদে, আমার বাসা আছে।
ভিন দেশেতে ক্যামনে রবে শুধুই দোঁহে ভাবে,
দুই বন্ধুতে করে শলা, কবে মুক্তি পাবে?
দিবারাত্রির মনের ভয়ে পাখির সাথে থাকে,
মাথায় চিন্তা শুধুই ঘুরে পড়েছে বেশ পাকে।
বিপদ কালে পাশে যে জন তাকে সৃজন ধরি,
ভরসা করে চলার পথে ভাসাই জীবন তরি।
যতদিন আর থাকবো ভবে রবো হাসি মুখে,
ইষ্ট কাছে জীবন সাঁপে সুখের আশায় বুকো।

পেট পূজো

তৃপ্তি পাল

বাহিত

প্রমোদ বড়ুয়া

পঞ্চমীতে মায়ের মুখের

যদি দেখা না মেলে

উণ্ডল হয় সবকিছু - চপ কাটলেট খেলে।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যাবেলা আগেভাগে এসে

ঢাকির দলকে উস্কাই ঝালমুড়ি হাতে।

সপ্তমীর সন্ধ্যাতে উপচে পরা ভীড়

রাত জেগে বিরিয়ানি, রোল, মিষ্টি, ক্ষীর

অষ্টমীর সকালে অঞ্জলি

লুচি আর বেগুনভাজা

রাত্রিবেলায় পরোটা আর মটন কষা

নবমীর ভুড়িভোজে সবশেষে মোগলাই

বিজয়ার মনখারাপে মিষ্টিমুখে,

মায়ের মুখে এক মনে চেয়ে

পূজোর কদিন অনিয়ম করে,

মাতবো পেট পূজোতে।

জাগতিক উপাদান কত ভাবে প্রকাশিত

বিচিত্র অনুভূতিতে তাই জীবন রচিত।

কত দৃশ্য শব্দ গন্ধ কত জীবন্ত মুখর

কত স্বাদে পরিপূর্ণ কত রসের নির্ঝর।

জীবনে জীবন যোগ আছে অজস্র সম্পর্কে

জড়িয়ে ফেলে জীবন কতনা তর্কে বিতর্কে।

সুখদুঃখ অনুভবে জগত আর জীবন

একাত্ম হয়েই ওঠে কত ধরন ধারন।

আত্মবিশ্বাসী সাহসী কত আছে পদক্ষেপ

হতাশা গ্লানি দুশ্চিন্তা আছে উদ্বেগ আক্ষেপ।

রাগ ব্যথা অভিমান কত ঈর্ষা ঘৃণা দ্বেষ

ক্ষোভ লিপ্সা উৎফুল্ল মনে মনমরা ক্রেশ।

দয়া স্নেহ প্রেম ভক্তি আছে বিবিধ সাধনা

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ব ও অনুশোচনা।

স্বস্তি শান্তি আনন্দের কতনা আছে প্রেষণা

মিলন বিচ্ছেদ আর ভয় ভীতির চেতনা।

কত ভাবে প্রভাবিত করে থাকে আমাদের

মানসিক আচরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্ষোভের-

আস্বাদে অতিবাহিত যত জীবন প্রবাহ

বৈচিত্র্যময় জীবন করে চলেছি নির্বাহ।

আমার আমি

পাঁচুগোপাল হাজরা

এ জীবনে কত কিছু দেখা হলো
কত কিছু অদেখা - অচেনা - অজানা রয়ে গেল।
তবে বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারি
প্রত্যেকটা আমার মধ্যে আর একটা আমি
লুকিয়ে থাকে, কোন আমিটা বড়?
ভেতরেরটা নাকি বাইরেরটা? তা বোঝা বড় দায়।
অথচ অনায়াসে বুঝতে পারি আমার ভেতরেও
দুটো আমি অনায়াসে অবস্থান করছে।
বয়স বাড়লে মাঝে মাঝে মনে হয় আমিই
একা একা কথা বলি -----
তখন ছোট্ট আমি - দীর্ঘ জীবনে বড় আমি হয়ে ওঠে।
নিজের আমি কখনো গুরু হয়ে ওঠে,
যা ছিল বর্তমান - তাই অতীত হবে একদিন,
কত জীবন দেখা হলো এ জীবনে।
অনেক সমুদ্রের ঢেউ দেখেছি
ভয়ংকর উত্তাল কিংবা শান্ত নারীর মতো।
মানুষ আনন্দ খুঁজে নেয় আনন্দ পেতে চায় খুব।
স্বনির্ভরতা, উৎসাহ, আবেগ বড় বেশি প্রয়োজন
এ জীবনে তবু বারবার মনে হয়,
প্রত্যেকটা আমার মধ্যে আর একটা আমি লুকিয়ে থাকে,
আমি সেই আমার আমিকে খুঁজে ফিরি সারা জীবন ভোর।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে বাঁধ ও ব্যারেজ বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের বাঁধ ও ব্যারেজ সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। বর্ষাকালে প্লাবন ঘটলে দিন কয়েক খবরে উঠে আসে কিছু কিছু বাঁধ ও ব্যারেজের কথা। যদিও এর মধ্যে পাল্শ্বে ও মাইথন নিয়েই আলোচনা বেশি হয়। কিন্তু এই দুটোর কোনটাই পশ্চিমবঙ্গে নয়। আরেকটি বৃহৎ ব্যারেজের কথা সকলের জানা সেটা হল 109 টি লগগেট বিশিষ্ট ফারাক্কা ব্যারেজ কিন্তু এটি কেন্দ্রীয় জনশক্তি মন্ত্রকের অধীনে এবং এটি উত্তরবঙ্গের করিডোর হলেও পর্যটন স্থল নয়। অধিক চর্চিত এই তিনটি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে ড্যাম আছে 13 টি, ব্যারেজ আছে 15 টি, চেক ড্যাম আছে 72 টি। এরমধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। সেচ ও জলপথ দপ্তরে ইন্সজিনিয়ার হিসেবে চাকরির সুবাদে ও বদলীর কারণে অনেকগুলো বাঁধ ও ব্যারেজের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং মনে হয়েছে এগুলো কে কেন্দ্র করে যে পর্যটন ব্যবসা গড়ে উঠেছে বা উঠছে তা আগামী দিনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। কর্মজীবন শুরু হয়েছিল মুকুট মণিপুর ড্যামকে কেন্দ্র করে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে পুরুলিয়া জেলার গা ঘেঁষে কংসাবতী ও কুমারী নদী কে বেঁধে সত্তরের দশকে তৈরি হয়েছিল এই জলাধার। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ। 12 কিঃমিঃ দীর্ঘ এই বাঁধের ওপর দিয়ে যানবাহননে চেপে অথবা জলাধারে নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে দেখে নেয়া যায় পরেশনাথ মন্দির, কালীমন্দির, ডিয়ার পার্ক। কাছেই প্রাচীন অম্বিকা মায়ের মন্দির। ওপারে সবুজ অরণ্যে মোড়া বারঘটু, ঝিলিমিলি, সুতান, বান্দোয়ান। থাকার জন্য সরকারি বাংলো রয়েছে “কংসাবতী ভবন”। এছাড়া বনবিভাগের “সোনারুড়ি”, পর্যটন দফতরের “বারঘটু ইকো ট্যুরিজম”, বেসরকারি “পিয়ারলেস ইন ” এবং অনেক গুলো ছোট মাঝারি হোটেল ও রিসর্ট।

বীরভূমের ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অধীনে রয়েছে ম্যাসাজোর ড্যাম। বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ি এবং ঝাড়খণ্ডের দুমকার সীমান্তবর্তী অংশে 1955 সালে নির্মিত এই কংক্রিটের বাঁধ এক অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে অবস্থান করছে। অনন্য সুন্দর এর নির্মাণ প্রকৌশলী। সবুজ পাহাড়ের ঘেরাটোপে ময়ূরাক্ষী নদী এখানে বাঁধা পড়েছে। এখানে দুই মেগাওয়াটের দুটি ইউনিটের জলবিদ্যুত প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এখানে সরকারি বাংলো রয়েছে “ময়ূরাক্ষী ভবন। আছে “যুব আবাস ”। এছাড়া আরো

কয়েকটি থাকার জায়গা। ম্যাসাঞ্জের থেকে জল আসে তিল পাড়া ব্যারেজে। সিউড়ির এই তিল পাড়া ব্যারেজে সিদ্ধেশ্বরী নামক আরেকটি নদী এসে মিশেছে। পনেরোটি লগগেট রয়েছে এই ব্যারেজে। গোখূলি বেলায় এই ব্যারেজ থেকে সূর্যাস্ত দেখার অপূর্ব রূপ গোয়ার দোনাপাওলার থেকে কোন অংশে কম নয়। তারাপীঠ-বক্রেস্বরের পথে এই তিল পাড়া ব্যারেজ ছাড়া আরও কতকগুলো ছোট ছোট ব্যারেজ আছে। বীরভূম জেলায় রয়েছে মোট সাতটি ব্যারেজ ও দুটি ড্যাম। “হাসুলী বাঁকের উপকথা ” র সেই কোপাই নদীর উপর রয়েছে কুলতর ব্যারেজ যেখানে দাঁড়িয়ে এক গ্রীষ্মের দুপুরে আমি দেখেছি এক দল গরু হাঁটু জল থাকা নদী পার হচ্ছে আর আমার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটি- “আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে ” ।

উত্তরবঙ্গের গাজোলডোবায় রয়েছে সুদীর্ঘ তিস্তা ব্যারেজ। চুয়াল্লিশটি লগগেট বিশিষ্ট এটি পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে থাকা সবথেকে বড় ব্যারেজ। এখানে রয়েছে সরকারি বাংলো “হাওয়া মহল”। এই ব্যারেজ কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে “ভোরের আলো ট্যুরিজম”। শরৎকালে মাঝে মাঝেই এই ব্যারেজ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায়। দামোদর নদের উপর নির্মিত দুর্গাপুর ব্যারেজে রয়েছে চৌত্রিশটি লগগেট। শীতকালে এখানে চড়ুইভাতির মজাই আলাদা।

পুরুলিয়ায় রয়েছে অনেকগুলো চেক ড্যাম যার মধ্যে অনেকগুলোই পর্যটন মানচিত্রে আজ সমাদৃত। অযোধ্যা পাহাড়ে উঠতেই দেখতে পাবেন তুর্গা ড্যাম। আর তার মাথার উপর অবোড় ধারায় ঝোড়ে পড়ে বামনী ফল্স। আর আশপাশে বসন্তে ফোটে আগুন রাঙ্গা পলাশ। আবার অযোধ্যা পাহাড়ের নীচে নেমে বাঘমুন্ডি থেকে খানিক দূরে রয়েছে খয়েরাবেড়া ড্যাম। তার কিছু দূরে আছে মরগুমা ড্যাম। এখানে ওয়েস্টবেঙ্গল ট্যুরিজমের থাকার জায়গা রয়েছে। বড়স্তীর প্রধান আকর্ষণ যে চেক ড্যাম আর তার সামনে থাকা পাহাড়চুড়া সেই চেক ড্যামটির নাম রামচন্দ্রপুর চেক ড্যাম। সেচ ও জলপথ দপ্তরের এই সকল বাঁধ ও ব্যারেজ গুলো মূলত তৈরি হয়েছে কৃষিজমিতে সেচ সেবন ও খানিকটা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। কিন্তু বর্তমানে সময়ের দাবি মেনে এগুলি পর্যটনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। পর্যটন দপ্তর আরো একটু যত্নশীল হলে আরও অনেকগুলো বাঁধ ও ব্যারেজ কে কেন্দ্র করে পর্যটন ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে। সেই সঙ্গে সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

মৃত্যু

রমা সরকার

মৃত্যু তুমি সুন্দর, তুমি অনন্ত আদি।

এসো, হাত ধরে নিয়ে চলো অমৃত লোকে,

মৃত্যু তুমি সুন্দর, চলো যাই সেই পথে

যেখানে চির শান্তির অবগাহন মোহ মুক্তির প্রান্তর

যেখানে নেই কোন জটিলতা,

নেই কোন চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কষা,

কি পেলাম - কি দিলাম নেই ভাবনার অবকাশ

মৃত্যু তুমি সুন্দর, এসো হাত ধরে নিয়ে চলো

সেই অসীম শূন্যে, ভুলক ছাড়িয়ে অনেক দূরে

যেখানে নেই কোন দুঃখ, নেই কোন কষ্ট,

নেই কোন বোঝা পড়া, নেই কোন দায়, নেই কোন দায়িত্ব।

তুমি সেই বৈকুণ্ঠের দিশারী, খেয়া তরী কর পার

প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন, আমি মুক্ত এক বাঁধন ছাড়া পথিক।

মৃত্যু তুমি সুন্দর, এস হাত ধরে নিয়ে চলো, অমৃত লোকের পথে

লক্ষ্যে পৌঁছে বিলীন হব, মুক্তধারার শ্রোতে,

মৃত্যু তুমি সুন্দর, তুমি আদি - তুমি অনন্ত

তুমি সত্য - তুমি সুন্দর - তুমি সত্য - তুমি সুন্দর

তুমিই সেই বৈকুণ্ঠের দিশারী খেয়া তরী কর পাড় তুমি সুন্দর।

আবেগের ভুল

লেখা মন্ডল

আবেগের শুভ পরম লগনে আঁখি দেখে পলে পলে,
আবেগের ফুলে গাঁথা মালাখানি পরাই তাহার গলে।
আশা ভরা চোখে স্বপ্নগুলো অরুণ আলোকে হাসে,
আবেগের তুফান উচ্ছল হয়ে মনের সাগরে ভাসে।
আবেগী প্রণয় আশকারা পেয়ে নব নব রূপে সাজে,
স্বপনবলাকা খুশিতে হারায় আকাশ নীলের মাঝে।
একলা ভুবনে মধুর বাঁশিতে ডেকেছিল ভোরে সেই,
তন্দ্রালু মোহে কানে শুনাইলো আমি তো আপন কেউ।
ডুব দিয়েছিলাম অমৃত সাগরে সুখা ভান্ডার তরে,
হরষিত মনে বিষের পাত্র তুলে আনি নিজ করে।
আবেগের বশে কৈশোরের ভুল বিঁধে আছে কাঁটা নামে,
আবেগের বাড় ফুর্তি দেউ আজ ভাঙনের খামে।
আবেগের ঘর বালুচরে বেঁধে ভুলের মাশুল গুনে,
আবেগের ভুল মুক্ত হৃদয়ে মুক্তির গান বুনে।

রাত

তুলসী দে

ক্লান্ত শহর গুনছে প্রহর রাত সীমানার শেষে।
নিঝুম রাতে এসেছে আঁধার অভিশাপের বেশে।
চলছে খেলা, মুখোশবাজির রক্ত নদীর ধারা।
রাত্রি বলে গুনছো সময় ঐ আসছে যেন কারা।
মুখে তাদের উন্মাদনা পশুর আচরণ।
একলা পেলে ছিঁড়ে খেতে চায় টাটকা একটা জীবন।
আগুন হাসে বালির কণায় জলের ফোঁটা হাওয়া।
কুয়াশা ঘেরা শহরটাকে লুকিয়ে হেঁটে যাওয়া।
নতুন আলো নতুন ভোর সাজানো শহর দেখে।
বোবা রাতে শহরটাকে নগ্ন করে রাখে।

রাতপরী

সাগর চক্রবর্তী

রাতপরী, আমি একটা কবিতা লিখতে চাই,
যে কবিতায় থাকবে শুধু তোমার কথা।
রাতপরী, আমি একটা ছবি আঁকতে চাই,
যে ছবিতে থাকবে তোমার হাসির স্নিগ্ধতা।
রাতপরী, আমি একটা স্বপ্ন দেখতে চাই,
যে স্বপ্ন হাসবে শুধু তোমায় জুড়ে।
রাতপরী, কথা দিলাম, সেই স্বপ্নকে আমি
রাখবো বুক সোণায় মুড়ে।
রাতপরী, তোমার জন্য অপেক্ষায় থেকে
কাটে কতো নীদ্রাহীন রাত।
রাতপরী, ভালোবাসায় থাকে বুঝি শুধুই আঘাত।

সিক্ত স্রোত
সৌরভ ঘোষ

নদী বয়ে যায় প্রবাহমান গতিতে, স্রোতের সাক্ষী হয়ে।
মূহূর্ত সাথে নিয়ে বাঁচে জীবন
আর স্মৃতি থেকে যায় - সম্পর্ককে জড়িয়ে।
ঘড়ির কাঁটার অবস্থান বদল হয় শুধু - সময়ের নয়।
অপলক চাহনিতে, থমকে গেছে
দিগ্বিদিক হয়ে যাওয়া বিভ্রান্ত মন
বেহিসাবী এলোমেলো বাতাসে, অনুভূতির উষ্ণতা ভেসে আসে।
অদৃশ্য স্পর্শ ছুঁয়ে যায় স্পন্দিত ধমনী।
চোখের আড়াল করো না, বরং রেখে দিও কাজলে।
হাজারটা অভিমান হলেও দিও না যেতে,
রেখো বেঁধে সিক্ত ঠোঁটে, বাম অলিন্দে।
গোধূলি সন্ধ্যে ছাতিমের গন্ধে,
একটু উঁকি দিও সময়ের খেয়ালে, মনের দেওয়ালে।
ভালোবাসার নিকোটিনে আচ্ছন্ন চোখ,
চুমুকে সিক্ত ঠোঁট উদ্দীপনার মহারণে
আঙ্গুলে আঙ্গুলের ঘষায়, তরঙ্গিত হয়
শিহরণের চোরাস্রোত।

ঐ পাহাড়ে আমার প্রেম

মনিশঙ্কর রায়চৌধুরী

আমি পাহাড় বড্ড ভালোবাসি কেন জানো?

সেইযে গভীর নিস্তন্ধতা, সেইযে নিবিড় গম্ভীরতা,

সে যে বড্ড টানে আমায়

আমি যেন সেই পাহাড়ের চূড়ার ওপর চূড়ায় উঠতে চাই

কিন্তু পারিনা যে কারণ?

কারণ আমি যে নই সেই অভিজ্ঞ শেরপা,

তবুও আছে যে আমার মনের রণপা

যা দিয়ে আমি সেই পাহাড়ে কখনো বেড়াতে গেলেও

কোনো উঁচু হিলটপ হোটেলের জানলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়েই

মনের গহীন কল্পনায় পৌঁছে যাই সেই ওই পাহাড়টার এক্কেবারে চূড়ায়

যেখান থেকে আমি চেষ্টায়ে বলি

শুনতে পাচ্ছ আমার কথা আমি এখানে আমি এখানে,

যেন তোমার খুব কাছে আর তুমি? তুমি যে রয়েছ ওই আকাশটায়

আমি এই পাহাড়ের ওপর থেকে তোমাকে মাথা উঁচু করে দেখছি আর তুমি?

তুমি ওপরের আকাশ থেকে নীচে আমার দিকে তাকিয়ে

হাসছো শুধু হাসছো হাহাহাহা সত্যিই পারো বটে তুমি,

সেই একই রকম রয়ে গেলে।

আমি পাহাড় বড্ড ভালোবাসি

আর ভালোবাসি তোমায় ও, অনেক অনেকখানি।

আঁশটে ঘ্রাণ

রূপকুমার হালদার

শরতের মেঘমুক্ত আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা শুরু হতেই মাতলা নদীর চরে চরে কাশফুলের দোলা লাগে। কিন্তু সেই শুভ্রতা ছাপিয়ে সাগর আর কালার চোখে তখন বাসন্তী বাজারের সেই আলো-বলমলে বিপণি বিতানগুলোর হাতছানি। গ্রামের ধুলোমাখা পথে চলতে চলতে বড় ভাই সাগর বিড়বিড় করে, “বুঝলি কালা, এবার পুজোয় আর ওই তালি মারা জামা পরে মগুপে যাব না। এবার বুক ফুলিয়ে নতুন কাপড়ের গন্ধে পাড়া মাতাব।” কিন্তু পকেটের শূন্যতা ঘোচানোর রাস্তা একটাই—গঙ্গার নোনা চরের সেই পালোয়ান চিতে কাঁকড়া। সেদিন অমাবস্যার ঘোর কাটেনি। সাগরের ফন্দি মাফিক আগের রাতেই জঙ্গল থেকে একটা হুটপুট ‘কলাবঙ’ সাপ পিটিয়ে মেরে রেখেছিল ওরা। সাপের সেই কড়া আঁশটে গন্ধ নাকি বড় ঘাণ্ড কাঁকড়াদের যম। সেই টোপ ফেললে গর্তের অন্ধকার থেকে তারা ছরমুড় করে বেরিয়ে আসে।

ভোর হওয়ার ঢের আগেই দুই ভাই বেরিয়ে পড়ল। সাগরের কাঁধে বাঁশের মস্ত এক খলুই আর কালার মুঠোয় ধরা সেই সাপের পুঁটলি। জোয়ারের জল সবে নামতে শুরু করেছে, নদীর পাড় জুড়ে থিকথিকে কাদা আর নোনা জলের সোঁদা গন্ধ। কালার বুকটা একটু টিপটিপ করছিল। নিস্তব্ধ চরে জোলা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে সে বারবার সাগরের গেঞ্জি খামচে ধরছে। সাগর বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়, “আ মরণ! অত ভয় পেলে নতুন জামা হবে না। এবার সুতোয় টোপ বাঁধ।”

সুতোর মাথায় কলাবঙের চাকা চাকা টুকরো বেঁধে গর্তের মুখে ফেলতেই খেলা শুরু হলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুতোয় জবরদস্ত টান পড়ল। সাগর ফিসফিস করে বলল, “হাঁড়িকাঠে গলা দিয়েছে রে কালা, এবার হ্যাঁচকা টান মার।” কিন্তু কালা উত্তেজনার চোটে এমন বেসামাল টান দিল যে, টোপ সমেত প্রকাণ্ড এক চিতে কাঁকড়া কাদা ছিটকে সরাসরি সাগরের পিঠের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল। দাঁড়া দিয়ে সাগরের ঘাড়ের কাছে জাঁতকল বসাতেই আর্তনাদ করে উঠল সে। কালা তখন ভয় পেয়ে সেই কামড় ছাড়াতে গিয়ে উল্টে বড় ভাইয়ের নাকেই

এক থাপ্পড় কষিয়ে বসল। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাদার ওপর দুই ভাইয়ের কুস্তি আর কাঁকড়ার দাপাদাপিতে একাকার দশা।

যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে নেশায় মাতল ওরা। কলাবঙের গন্ধে একেকটা কাঁকড়া যেন উন্মত্ত হয়ে ধরা দিচ্ছিল। সূর্য যখন মাথার ওপরে, তখন খলুই ভর্তি হয়ে গেছে লাল লাল সব জ্যাস্ত বাঘ-কাঁকড়ায়। কাদা মেখে ভূত হয়ে দুই ভাই যখন বাসন্তী বাজারে মহাজনের আড়তে পৌঁছাল, তখন তাদের চোখমুখে বিজয়ের হাসি। দরদাম হলো জুতসই। পকেটে যখন সাতটি কড়কড়ে একশো টাকার নোট এল, তখন সাগরের মনে হলো—বাসন্তী বাজারটা যেন তাদের পায়ের তলায়।

জিলিপি আর কচুরির আশ্বাদ নিয়ে তারা ঢুকল কাপড়ের দোকানে। সাগর হাত দিল সবথেকে চড়া দামের রেশমি পাঞ্জাবিতে, আর কালা বেছে নিল বাহারি কারুকাজ করা এক জামা। কে কার চেয়ে বেশি দামী পোশাক কিনবে, এই রেযারেযিতে তারা দোকানের কাউন্টার মাথায় তুলল। কিন্তু ঠিক যখন দাম মেটানোর সময় এল, সাগরের হাত পকেটে যেতেই মুখটা আমসি হয়ে গেল। হুড়োহুড়ি আর দস্তুর চোটে পকেটের এক কোণ কখন যে ছিঁড়ে গেছে, আর সেই ফাঁক দিয়ে তিনটি মস্ত নোট কোথায় ঝরে পড়েছে, তা দুজনের কেউই খেয়াল করেনি।

দোকানের সেই ঝকঝকে আয়নার সামনে দুই ভাই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সারাদিনের সেই নোনা জলের পরিশ্রম আর কলাবঙের টোপের লড়াই—সব যেন এক নিমিষে ফিকে হয়ে গেল। সাগর ম্লান হেসে কালার ম্লান মুখের দিকে তাকাল। সে দেখল, অতিরিক্ত ঔদ্ধত্য আর একে অপরের ওপর টেক্কা দেওয়ার নেশায় তারা আসলে নিজেদের সবটুকু আনন্দকেই ধুলোয় মিশিয়ে ফেলেছে।

বাকি টাকা দিয়ে তারা অতি সাধারণ দুটি সুতির জামা কিনল। দামী না হলেও, নিজের রক্ত জল করা পয়সায় কেনা সেই পোশাকেই শান্ত হলো তাদের মন। বাসন্তী বাজারের সেই ভিড় ঠেলে যখন তারা বাড়ির পথ ধরল, তখন গোধূলির আলোয় দুই ভাইয়ের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে।

কবিগুরু - কে বলে তোমারে মৃত?

নিমাই চন্দ্র মন্ডল

নিখিল ভুবনেরে ভাল বাসিয়াছো, হে ভানু, কে বলে তোমারে মৃত?
বাইশে শ্রাবনে অশ্রুশিঙ নয়নে, বিদায় দিয়াছো নশ্বর দেহ, করিয়াছো সমাহিত।
দিয়াছো হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া, সৃষ্টির উল্লাসে উঠিছো মাতিয়া,
কবিতা নাটক, উপন্যাস, ভরিয়া, অভিনয় আর কণ্ঠশিল্প ঘিরিয়া,
অঙ্কন সঙ্গীত প্রবন্ধ রচিয়া,
হে দার্শনিক, তুমি কালজয়ী সাহিত্যিক, এ বিশ্ব জুড়িয়া।
হে কবিগুরু কল্পতরু, কে বলে তুমি প্রয়াত?
তুমি জীবন্ত চির অনন্ত, রচনাবলীর বত্রিশ খণ্ডে তুমি স্বর্ণাসনে অধিষ্ঠিত।
বাহন্থানি কাব্যগ্রন্থ, চোদ্দ উপন্যাসে,
ছত্রিশটি প্রবন্ধ জুড়ে, আটত্রিশ নাটকের পাশে।
উনিশশো সঙ্গীতের সাথে পঁচানব্বই গল্প যুক্ত,
এত শত মহান সৃষ্টি, গল্পগুচ্ছ গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত।
নিজ হাতে আঁকা দ্বিসহস্র ছবি, সবের মধ্যে রবি,
চিরদিন তুমি আমাদেরই মাঝে, রয়ে যাবে প্রিয় কবি।
রবি গেল যথা অন্তাচলে আজি, পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া,
প্রকৃতির কারণে আসিবে ফিরিয়া, উথলিবে কিরণ ফেলিয়া।
বাংলা ভাষার সাহিত্যসম্ভার, তুমি সাজায়েছো থরে থরে,
শিল্প কলা সঙ্গীত নাটক গল্প উপন্যাসে, দিয়াছো আখ্যান ভরে।
কাব্য রূপায়ণে কিংবদন্তী তুমি, রচিয়াছো ইতিহাস,
নৃত্য অঙ্কনে অভিনয় মঞ্চগসনে, তুমি জাগ্রত আশ্বাস।

আরও কিছু
নির্মল কুমার প্রধান

আরও আরও করে বেহিসাবি চলা
অধিকার আরোপের আকাশচুম্বী মানসিকতা
একদিন নিঃশেষ করে দেয় জীবনকে
আগ্রাসী মন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মিশে যায় মাটিতে
যবনিকার পর্দা নেমে আসে নাট্যক্ষেত্রে।
সম্রাট আলেকজান্ডার পারস্য, মিশর পেরিয়ে
ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে বলেছিল তার অদ্ভুত পরিণতি
অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে,
আরো কিছুর ফসল তুলেছিল জীবনের উঠোনে
যা ইতিহাস - ঘন জন্মের নির্ধারণ প্রাপ্তি।
আরও কিছু চাওয়ার অসীম ক্ষুধা
অহংকার ও শাসন শোষণের লিপ্সাকে উদ্বেলিত করে
সহায় সম্পদের প্রতি টানো নিষিদ্ধ হয়
সময়ের নিশ্চিত বিধানে কালের নির্ধারিত নিয়মে,
আমরা সকলেই সেই মহান ছন্দের জৌলুষে
আরো কিছু-র নিভৃত মোড়কে বন্দী।

নব প্রজন্মের জন্য

ড. দিবাকর নাথ

মিথ্যা দর্প মিথ্যা অহংকার
মিথ্যা অভিমান মিথ্যা ক্ষোভ
আপন আপন বলে
সবকিছু নিজের ভেবে
মরছি আমরা ধরাতলে।
নাই কোন ধর্ম আমাদের মধ্যে
মানব ধর্ম আমাদের ধর্ম
নাই কোন জাতি আমাদের মধ্যে
আমরা একই জাতি মানবজাতি।
ধর্মবিদ্বেষ এনে দেয়
জটিল আলোড়ন।
আলোড়নে আনে
এক ধর্ম যুদ্ধ এক বিশ্ব যুদ্ধ
আর বিশ্ব যুদ্ধে ডেকে আনে সংহার।
মানে না কোন ধর্ম
মানে না কোন জাতি
সবাই আসছে একদিন
যাবে ও পৃথিবী ছেড়ে একদিন
রেখে যাবে শুধু জীবনের কীর্তি।

হালিসহর আনন্দম

করোনার সময়। মা ও মেয়ের যুগল বন্দী।
মেয়ের প্রশ্ন মায়ের কাছে? লকডাউন এ আমরা ঘরে বন্দী,
স্তব্ধ অনেক কাজ এই ধরায়! আবার অনেক কিছু বয়ে যায় আপন ভেলায়।
তবুও পৃথিবী স্তব্ধ নয় জনমে ও মরণে! আমার 'অদ্রিকার' মননে মায়ের প্রেরণায়।

ভাবনা

অদ্রিকা সরকার

করোনার কারণে
লক হলো বিশ্ব
বাতায়নে বসে ভাবি
এ কেমন দৃশ্য?

ফুল কেন ফোটে
তবে মেঘ কেন ছোটে রে?
নদী কেন বয়ে যায়
কলকল ধ্বনিতো!

বাড় কেন ওঠে তবে?	সূর্যের ছটা কেন
ডাল কেন ভাঙ্গেরে?	আকাশের বুকেতে?
বুষ্টির ফোটা কেন	মন কেন ছুটে যায়
টুপ টুপ পড়ে রে!	অজানিতের পথে রে!

দিন রাত হয় কেন
তবে এই ভুবনে?
পৃথিবী স্তব্ধ নয়
জনমে ও মরণে।

সন্ধানী আলো

পলাশ হালদার

সন্ধানী রোদ এখন পেখম তুলেছে; হাওয়ার দাবানল শিখায়।

গোধূলি বালিয়াড়ি পথে বাউলের একতারা

উদাস হয় সুর ভুলে তামাশার নেশায়

বাদাবনের লোককথা ঝরে যায় দিনান্তে,

সূর্য হারিয়ে যাওয়া কংক্রিট জঙ্গলে হাতছানি দেয় ধ্বংসের মায়া!

তবুও,কোজাগরী রাতের পূর্ণিমা যদি ধরে হাত?

সমুদ্রে মিশে নীলাভ ঢেউ জানি কত মায়াবী হয়।

উন্মাদ শরীরের শবরী জেগে ওঠে যখন কনক চুম্বনে!

তখন সন্ধান পলকে আনমনে খোঁজে বিবাগী হিয়া!

বিকীর্ণ আলেয়ায় কাম গন্ধ খুঁজে মরে উথলিয়া শ্রাবণের নারী!

মিটি মিটি তারায় নরম আলো জেগে থাকে রাত,

বিশ্রামের ভোর খোঁজে ঠোঁটের ছোঁয়া!

ঝরে যাওয়া পাতার শব্দে হয়তো জাগে রঙিন পলাশ।

কুয়াশা ঝেড়ে প্রভাতের রাগ চামোরে চারণ গেয়ে ওঠে।

বেড়ে ওঠা পৃথিবীর স্বরলিপি তখন সঞ্চরিত হয় বিগলিত হেমে,প্রায়সী মুখের

ওপর।

প্রিয়তমা চাঁদ কলঙ্কের ভারে পর্দা আড়াল করে,

জেগে থাকে সুখ_অমাবস্যা হরিতে,অলকা পুরীর আলেয়ায়।

ফিরে যাও তুমি ফিরে যাও তুমি সন্ধানী আলো।

আলোছায়ার সন্তান

মৌসুমী রায়

"তাই বলে তুমি পাঁচ বিঘা জমির ভাগ ছেড়ে দেবে, বড়দাকে? আমি তো শুনেছি, অধিকাংশ জমিই তোমার চাকরির টাকায় কেনা।" সুজন চমকে উঠল। একঘর লোক! মা চলে যাবার পর বড়দার কাছেই সুজনের বেড়ে ওঠা। সুজন তখন মোটে পাঁচ। বড়দা, মেজদা, নিপুদিদি, সুজন। বাবার সে এক হতভম্ব দশা। আপনভোলা মানুষ। মা ছিলেন সংসারের মেরুদণ্ড। এক দিনের ঝড়েই সব ওলটপালট হয়ে গেল। বাবা বোধহয় মাকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। তাই মা চলে যাবার ঠিক ছয় মাসের মাথায় বাবাও। বড়দাই তখন সব। তাঁর নিজের লেখাপড়ার পাট ঘুচল। নাইয়ে খাইয়ে ধুইয়ে ভাই বোনের ইঙ্কুলে পাঠানো। বাড়ি ফিরলে তাদের ধরে বেঁধে পড়তে বসানো। বড়দা না হাল ধরলে, ওরা দু'জন পাল ছিঁড়ে কোথায় ভেসে যেত! হ্যাঁ, দুজন। মেজদা ততদিনে নিরুদ্দেশ। তারপর আরো কত লড়াই। নীপুদিদি এখন দিদিমণি। সুজন অফিসার। আজ মায়ের দিবসী। বহুদিন পরে সবাই একসঙ্গে। বিকেলের বৈঠকখানায় সবাই মিলে মজলিশ। সেজো মামা উকিল। সোজাসাপটা বাস্তববাদী মানুষ। তিনি বড়দা কে সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার কথা পাড়তেই, সুজন বলল, "ঐ তো সামান্য জমি। একচালা মেটে বাড়ি। ওর আবার ভাগাভাগির কি আছে? যেমন চলছে, চলুক। আমার কিছু চাইনা। আমরা যাওয়া আসা করব।" কথাটা পড়তেও পারে নি, সংহতি ফুঁসে উঠেছিল। বৈঠকী পরিবেশটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। সুজন পা দিয়ে মাটি খুঁটছে। নিপুদিদির চোখে জল। বড়দা স্তব্ধ হয়ে বসে। শুধু সুজনের ঠোঁট কাটা মেজমাসী খরখর করে উঠল। "আলোদিকে তখনি বলেছিলাম, এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগেনা। শুনল না। কোথা থেকে এই অনাথ ছেলেটাকে নিয়ে এল। আর আজ তার বৌয়ের কথা শোনো! বলি, মাথাই যার নেই, তার আবার মাথাব্যথা কিসের!" সংহতির মুখ সাদা! সুজন ফ্যালফ্যাল করে বড়দার দিকে চেয়ে। বড়দা উঠে সুজনকে জড়িয়ে ধরল। নিপুদিদিও। তিন জনের হাত একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ। দেওয়ালের আলোছায়ায় মায়ের ছবিটা যেন হাসছে।

অনুভূতির কাব্যকথা
দেবব্রত মাইতি

স্পন্দনের বন্ধন ছেড়ে অনুভূতিরা বেরিয়ে আসে।
লিখে ফেলতে চায় কাব্য কথা।
শব্দেরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে পথে।
কাগজের উদ্যানে সুশোভিত হয় শব্দ-বর্নালী।
শুভেচ্ছা মাথা কত কথার প্রস্ফুটন।
অনুপ্রেরনার সীলমোহর দেওয়া কত সীমাহীন সম্পর্ক।
অন্তহীন চাওয়া, স্বার্থহীন ভালোবাসা
কত প্রেম, কত প্রতিবাদ, কত যন্ত্রনা, কত মন্ত্রনা
কত বিরহ, কত বেদনা কত উপাচার, কত অনাচার
তবু ভোর হলেই, স্মৃতির পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু দরা-দরির কারবার।
নাটকের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি, মঞ্চ সজ্জায় সমাজ।
মাঝে ঝাড়বাতিটা ছড়ায় আলো ফুটে ওঠে জীবন চরিত্রের ঝাপসা ছবি।
প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন শব্দেরা উপস্থাপনা করে
বাস্তবের মধ্যে হোঁচট খাওয়া জীবন গল্পের অলীক কাহিনী।
বোধহয়, অনুভূতিরও একটা ক্ষমতা সম্পন্ন চশমার প্রয়োজন।

আমার ভালোবাসা থাক আমার কাছেই
স্বপন সাহা

তোমাকে তো অনেকই ভালোবাসে
বিশেষ একজনের ধরাছোঁয়ার বাইরে;
দূরে থেকে শুধু দেখা
এভাবেই তৃপ্তি পেতে হবে বেঁচেথাকা কাল ধরে।
আমার ভালোবাসা থাক আমার কাছেই সুরক্ষিত থাকবে
প্রকাশের আনন্দের দরকার নেই, শুধু মনের কোণে ছবি হয়ে থাকবে।
যদি কোন দিন কেউ পড়ে খাতার পাতা খুলে
লিখে যাওয়া ক'টি কথা মনের ছন্দে;
গুরু শেষ না দেখে অবাক হলে
কী আর করা যাবে! আমি তো ছিলাম আনন্দে।
অনেকের মধ্যে এক, অনেকে চেনে তোমাকে
তুমি তো চেননা অনেককেই;
অনেকের মনের সঙ্গে মিশে আছো তুমি
অনেকের মনে থেকে যাবে তুমিই।
যদি কেউ বলে - এমন কেন ভালোবাসলে?
'কেন' এর উত্তর কিছু আছে নাকি?
ভালোবাসা আপন বেগে চলে
যুক্তি তর্ক কিছু মানে কি?

দুগ্ধা পিসি
সুনীল আদক

শারদীয়া
সুব্রত দাস

মাগো, দুগ্ধা পিসি চারদিন থেকে
যায় যে কেনো চলে
আরো চারদিন থাকতে তাঁকে
দাও না তুমি বলে।
শারদ মানে, মিলনমেলা
জমে দারুণ খেলা
মন্ডপে মন্ডপে লোক জমে
চলে গানের ভেলা।
বাংলা মায়ের ঘরে ঘরে
আর চলে খুশির হাওয়া-
হাতে গোনা চারটি দিন
বছর ঘুরে পাওয়া।
এই বছরই এসো তুমি
এসো সময় নিয়ে
দশমীতেই চলে যাও
যাও দুঃখ দিয়ে।

থোকা থোকা সাদা মেঘ
পেঁজা তুলো মেখে,
নীলাকশে পুজো-খুশি
ছবি যায় ঐকে!
সুবাসিত শিউলিরা
সুভাষিত আঙিনায়,
ফুলে ফুলে আলপনা
কী দারুণ ঐকে যায়!
ওই দিকে কাশবনে
চামড় দোলায়,
দুধ সাদা রঙ আমার
মনকে ভোলায়!
এরপর তালে তালে
ঢাকের কাঠি,
পড়লেই শারদীয়া
আসে হাঁটি হাঁটি!

টুঙ্কি -

অসিত কুমার মল্লিক

বেশ কিছু দিন আগের কথা। একদিন সকাল বেলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের ট্রেনে উঠেছি, রানাঘাট লোকালে পালপাড়া থেকে। তার ওপর নামব মাঝপথে বারাকপুরে। নিরুপায় হয়েই উঠেছি। জরুরী কাজ, যেতেই হবে। আগের ট্রেনটা মিস করেছি, সেটাতে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের অত চাপ থাকেনা। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের ট্রেনে নিয়মই আলাদা। ওদের এক একেক 'টা দল থাকে আর প্রত্যেকটা দলের জন্য কম্পার্টমেন্টের এক একেকটা দিক রিজার্ভ থাকে। এমন কি দু'দিকের দরজার কাছে হাওয়া খাওয়ার জায়গাও রিজার্ভ থাকে। সেখানে অন্য কেউ দাঁড়ালে তাকে দু-এক কথা শুনিye ওখান থেকে হটিয়ে দেবে। দু'দিকের মুখোমুখি সিটগুলোর মাঝে যে একফালি জায়গা থাকে, সেখানে ওদের দলের লোকই দাঁড়াবে। সে যে স্টেশন থেকেই উঠুক না কেন, হই হই করে ঠেলে গুঁতিয়ে সেখানেই দাঁড়াবে। কেউ কিছু বলতে গেলে সমবেত বাক্যবাণে তিনি বিদ্ধ হবেন। ওরা নিজেদের মধ্যেই কেউ দাঁড়িয়ে অন্যকে বসতে দেয়। ওদের কথা অনর্গল চলতে থাকে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, আর মাঝে মাঝেই দম ফাটা হাসি। আমি এই ভীড়ের মধ্যে কোনক্রমে কোণার আধখানা সিটে বসা এক ভদ্রলোকের ঘাড়ের কাছে ওপরের ঝোলানো হাতল ধরে স্থাপুবৎ দাঁড়িয়ে আছি। আমার কনুই বেয়ে দুফোঁটা ঘাম ওনার সাঁটে পড়ল। ওনার টের না পাবারই কথা। এদিকে বিভিন্ন দলের কথাবার্তা মিলেমিশে কানে ঢুকছে, কোনটাই অনুধাবন করা যাচ্ছেনা। এরই মধ্যে আমার পেছন দিকে যে দলটি বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে একটি কথা আমার কানে ঢুকল, "আজ সকালের খাওয়াটা খুব জম্পেশ হয়েছে। গরম গরম লুচি আর মাংস। বউ-এর আজ খুব পরিশ্রম হয়েছে। আমি বলি যে এত কষ্ট করার কি দরকার।

"শুনে সবাই হই হই করে উঠল, "আমাদের জন্য একটু আনতে পারতি, দেখতাম তোর বউ কেমন রান্না করে।" আমারও একটু ঔৎসুক্য হল, ভাগ্যবান

লোকটিকে দেখবার”। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, জানালার ধারে বসা ভদ্রলোক, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী হবেনা। এবার একজন কুচুটে বন্ধু প্রতি আক্রমণ করে, “তোরা বউ এত সময় পায় কি করে রে? আজ লুচি- মাংস, কাল পোলাউ -কালিয়া, পরশু পরোটা - কোরমা করে সাত সকালে খাওয়াচ্ছে। আমাদের বউরা তো পায়না। আমাদের বউরা কি এতই নিকম্মা?”

পাশ থেকে আরেক জন বলল, “ একবার টুস্কি বাজাতো দেখি”।

“টুস্কি বেজেছিল কিনা আমি শুনিনি”, কেননা আমার নামার স্টেশন সামনেই আসছে, আমি ভীড় ঠেলে গেটে পৌঁছতে ব্যস্ত। তবে একটা হাসির রোল শুনলাম। টুস্কি হল মাঝের আঙ্গুলের সাথে বুড়ো আঙ্গুলের ঘর্ষনে যে শব্দ হয় ।

দোষ কারো নয় গো

ইলা সাহা

আমার হৃদয়েই দোষ ছিল, পৃথিবী গো করুনার ঢেলা।

যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছে উষ্ণতা দেবে বলে,

আমি গর্হিত কর্মে লিপ্ত থেকে গোটা সন্ধ্যাবেলা

চাঁদ ওঠবার পর চলে গেছি নতুন জঙ্গলে।

তোমাকে কি বলি বলো? তুমি হলে রাজা

আমার কি এত সাধ্য, হৃদয়ে মুক্তার মালা পরি?

ছিঁড়ে যাবে, ভেঙে যাবে, উৎপীরন করে ফেলাব কত

তুমি অসহিষ্ণু হলে, আমি হব গোপে আহত।

সেলো ফোন তো নামিয়ে রাখলে,

মন ও সরিয়ে রাখতে পারো আমার উপায় নেই

বিনা প্রশ্নে আরও ভালোবাসবো।

নব দিগন্ত
গৌতম শর্মা

ভালোবাসার স্নিগ্ধ বেড়াজালে
যতই বাঁধো, তবু আমাকে পাবেনা।

সব মন কুড়িয়ে-নিংড়ে নিলেও
একরাশ শূন্যতায় আমার শহর হেঁটে যাবে
এগলি থেকে ওগলি।

অজস্র নদীর ঢেউ নদীর তটে আছড়ে পড়লেও -
যেমন অক্ষত থাকে।
তেমনই দুঃস্বপ্নের পৃথিবীতে ভঙ্গুরীত আরশি
তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে না।

নিরবে শূন্যতা জমাট বাঁধে মনের গভীরে!
আর হাতুড়ির আওয়াজ গুমড়ে কাঁদে পাঁজর জুড়ে।
যদি কখনো বিষন্নতার শৃংখল
ভেঙে জেগে ওঠে নবদিগন্ত।

আমার প্রিয় রবীন্দ্রনাথ
আশীষ পাল

আমার প্রাণের ঠাকুর, তুমি আমার প্রিয় রবি ঠাকুর।
এই বিশ্বসংসারের মাঝে যার জগৎ জুড়ে
ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য খ্যাতি।
কবিগুরুর আশীর্বাদে ভারতের এই বঙ্গ ভূমি ধন্য।
ধন্য এই ভারত মাতা, এমন সম্ভান পেয়ে।
আমাদের এই মানব জীবনের প্রতিটা কোণায়
রয়েছে তার কোমল ছোঁয়া।
কবির ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে অজস্র কবিতা আর আঁকা।
তোমার বইয়ের পাতায় উপন্যাস আর নাটকে মোরা।
অনবদ্য বিখ্যাত গানের ডালি দিয়ে সাজানো এই গীতবিতানের পাতা।
তোমার লেখা জাতীয় সংগীত পড়ে ভোরে যায় মন।
গীতাঞ্জলির রচনায় প্রথম নোবেল পাওয়া।
তোমার তৈরি পাঠশালায় জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন বয়েছে শিক্ষার ধারা।
কবীর পরশে প্রাণ ফিরে পায় এই প্রকৃতি।
আমাদের মাঝে রয়েছেন তিনি বেঁচে আজও স্মরণীয় হয়ে।
আমাদের সকলের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ বলে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে

কুমারহট্ট - হালিসহরের মনীষীদের ভূমিকা

দেবানন্দ পাল

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব। তিনি তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম সাধনাকে সমন্বয় করে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি বিশেষ পথ প্রচার করেছিলেন। তাঁর মূল আদর্শের মধ্যে ছিল অদ্বৈত জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়।

স্বামী নিগমানন্দ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সারস্বত আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। হালিশহরের মঠটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণবঙ্গ সারস্বত মঠ হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশ মতো তাঁকে এই হালিসহর মঠেই সমাধিস্থ করা হয় এবং স্থানটি পরবর্তীকালে নিগমতীর্থ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

গঙ্গার তীরে আশ্রম

মঠটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর ভাগীরথী/গঙ্গার তীরবর্তী অবস্থান। মঠের প্রাঙ্গণ থেকে গঙ্গার দিকে যাওয়ার সিঁড়ি ও ঘাট রয়েছে। ফলে ধর্মীয় পরিবেশের পাশাপাশি এটি হালিসহরের একটি সুন্দর নদীতীরবর্তী দর্শনীয় স্থানও।

মঠের প্রাঙ্গণে নিগমানন্দের সমাধি-মন্দির ছাড়াও নিগমেশ্বর শিবমন্দির এবং গঙ্গামন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুধু মঠ প্রতিষ্ঠা নয় – শিক্ষা ও সেবার কেন্দ্র

এটি কেবল পূজা বা সাধনার স্থান নয়। এখানে দুটি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে যেখানে নিয়মিত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মঠের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী নিগমানন্দ যোগ শিক্ষা কেন্দ্র, নিগমানন্দ সংস্কৃত সংঘ এবং গীতাপাঠ চক্র-এর মতো কার্যক্রম রয়েছে। আছে সুন্দর বাগান বিভিন্ন প্রকার গাছ পালা সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত নাম।

এখানে নিয়মিত গীতা জয়ন্তী, সংসঙ্গ, পাঠচক্র এবং বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে দর্শনার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২৫ সালের গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ২৪৮ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশ্রমের মহারাজদের ব্যবহার আপনাকে মুগ্ধ করবে। গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ, শান্ত মনোরম পরিবেশ সকলকে আকর্ষণ করে।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী

হালিসহরের অন্যতম কৃতি সন্তান। বীর বিপ্লবী (১৮৮৭-১৯৫৪) ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম বিশিষ্ট বাঙালি এবং যুগান্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতা। তাঁর পৈতৃক সম্পর্ক হালিসহরের সঙ্গে।

তিনি আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ২০২২ সালে হালিশহর ক্রেগ, পার্ক বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী কে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে রাখতে তার নামে নামাঙ্কিত করা হয়। গঙ্গা তীরবর্তী এই পার্কটির মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সকলের কাছেই এক আকর্ষণ। পার্ক সংলগ্ন 'রামপ্রসাদ লাইব্রেরী' এবং 'কফি হাউস' রয়েছে।

রামপ্রসাদ সেন

হালিসহরে রামপ্রসাদের ভিটা বলতে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান ও সাধনাস্থলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানটিকে বোঝায়। এটি হালিসহরের ঐতিহ্য ও পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

রামপ্রসাদের ভিটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত শাক্ত কবি ও সাধক। তাঁর জন্মস্থান হিসেবে হালিসহর তথা প্রাচীন কুমারহট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্মসাল নিয়েও মতভেদ রয়েছে—প্রায় ১৭১৮-১৭২৩ সালের মধ্যে তাঁর জন্ম বলে বিভিন্ন সূত্রে অনুমান করা হয়। এই স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব হল এখানে তাঁর সাধনার পঞ্চমুণ্ডি আসন রয়েছে। বর্তমানে ভিটায় পাকা মন্দির রয়েছে এবং সেখানে মা জগদীশ্বরী কালী-র নিত্য পূজা হয়।

ভিটার বর্তমান রূপ

বর্তমানে হালিসহর রামপ্রসাদ ভিটা একটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দর্শনস্থল হিসেবে পরিচিত। এটি রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

জনকল্যাণমূলক কাজ

রানি রাসমণি বহু রাস্তা, ঘাট, পুকুর ও জনকল্যাণমূলক স্থাপনা নির্মাণে অর্থ দিয়েছিলেন। কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে তাঁর নির্মিত বিভিন্ন ঘাট ও জনহিতকর কাজের স্মৃতি এখনও রয়েছে। তিনি দরিদ্র মানুষ, তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান

রানি রাসমণির জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। সাধারণ জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর ভূমিকা তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

স্বাধীনতা

ইন্দ্রানুজ চৌধুরী

স্বাধীনতা? হাঃ! সে তো প্রহসন মাত্র,
স্বপ্নের আড়ালে ধোঁয়াশায় ঢাকা একটা শব্দ শুধু।
অরাজকতার এই যুগে শহীদের রক্ত অভিশপ্ত মনে হয়।
সত্যিই কি পেয়েছি আমরা, ইংরেজ দুঃশাসনের সময়
প্রত্যেকের বুকে আঁকা বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা?
বোধ হয়, না।
আজ আশি বছর পরে 'মহামানবের সাগর তীরে'
জীর্ণ 'মঙ্গলঘট' লুটায় মলিন ধুলায়।
তাই আজ এই স্বাধীনতা চুরি ক'রে পাওয়া মনে হয়।
যাদের রক্তে লাল হ'ল এই ১৫ই অগাস্ট,
দেশের স্বার্থে প্রাণ দিল যেসব দেশপ্রাণের দল,
রাস্তার পাশে তাদের আবক্ষ মূর্তিও
কটাক্ষ দৃষ্টিতে দেখছে সেই স্বাধীনতার ফল।
রাজনৈতিক দলগুলো দলাদলি ক'রে পিষে মারছে সাধারণ জনতাকে,
ভোটের নামে জঘন্য জুয়াখেলায় পেশাগত চৌর্যবৃত্তির প্রাধান্য।
ক্ষমতার অনিবার্য অপব্যবহার কিছু সাম্প্রদায়িকের হাতে,
সস্তা রাজনীতি করে তারা কলঙ্কিত করছে গণতন্ত্রকে,
হিংসা, জিঘাংসা আর নৃশংসতার নোংরা দেশভক্তি
স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদ করেছে আজ।
স্বাধীনতা দিবসে তাই দেশের পতাকা দেখি আর ভাবি,
আমরা আজও পরাধীন নিজের দেশেই,
অগ্নিতা, অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার কুৎসিত-কদর্য অভিশাপ
আজও ছেয়ে আছে আমাদের দূষিত-দলিত বুকে।
জানি না এই মেকী স্বাধীনতা অবশেষে
কোথায় নিয়ে যাবে ভারতের আত্মাকে।।

ফিরবে না আর

শ্রী আঢ়

লাগাম ছাড়া পাগল পারা, উদাস এ মন,
সাহিত্য, কাব্য, কবিতার, ছোট্ট ছোট্ট পত্র পত্রিকার, অরণ্যানী পথে,
সারাটা জীবন করছে ভ্রমণ, কি জানি কি সে করে অন্বেষণ,
এ ভাবে অজান্তে কখন যে পড়ে গেছে বেলা,
সুরূ হয়ে গেছে কবে, সরযু তটিনী তটে,
গোধূলি আবির্ভাবের খেলা তার, সহস্র, অজস্র, ধন্যবাদ,
সুন্দর চমৎকার, সব পিছে ফেলা, এতে ওর ছিলনা বিকার,
স্বৈদ-শিক্ত দেহ, আগে চলার শক্তি নাই আর,
এখন সে অবসাদ, ক্লান্তির শিকার,
অন্বেষি কোন এক ছায়া তরুতলে, শয্যা পাতে,
নেমে আসে সুপ্তির সুগভীর ঘুম আঁখি পাতে,
পাশে ছিল পড়ে এক টুকরো কাগজ,
কি যেন হিজি বীজি, লেখা ছিল তাতে।
কোন এক উৎসুক পথিক, পড়ে দেখে, লেখা ছিল,
"আমি এক খুচরো চারন কবি,
এঁকেছি আমার জীবনের ছবি, খুঁজেছি যারে এ জীবন ধরে,
বারে বারে, এখনো পাইনি দেখা তার।"
পরশে পথিক তার দেহ,
বুঝে সে কবি, নিখর, অচল, অসাড়, নিভে গেছে দীপ-শিখা,
মিশে গেছে পঞ্চ ভূতে, কোনো দিন ফিরবে না আর,
পথিক ভাবে মনে, কবির জীবনে, বিধাতার একি এ বিচার!
এ হেন, নিষ্ফল পরিনতি, কি চমৎকার।

জাতীয় পতাকা

অমিত কুমার দাস

সারা ভারতের দিকে দিকে তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে,
জেগে উঠেছে ভারতবাসী নতুন ভারত গড়ছে।
এই পতাকার মহিমা অপার অপার রঙের শোভা,
এই পতাকায় যায় দেখা যায় সূর্যোদয়ের আভা।
গেরুয়া রঙের আলোক ছটায় শৌর্যবান করছে,
জেগে উঠেছে ভারতবাসী নতুন ভারত গড়ছে।
এই পতাকার জন্য ক্ষুদিরাম বরণ করেছে ফাঁসী,
এই পতাকা হাতে নিয়ে লড়ে লক্ষ্মীবান্ধ রাণী ঝাঁসী।
সাদা রঙের রূপালী ছটায় যেন জোছনা ঝরছে,
জেগে উঠেছে ভারতবাসী নতুন ভারত গড়ছে।
এই পতাকার ক্ষমতা এমন বাড়ায় হৃদয় স্পন্দন,
এই পতাকা দেখলে আকাশে বিমোহিত হয় নয়ন।
সবুজ রঙের শামিয়ানা যেন জমিতে শস্য ধরছে,
জেগে উঠেছে ভারতবাসী নতুন ভারত গড়ছে।।

।। জয় হে ।। জয় হিন্দ ।। বন্দে মাতরম্ ।।

পথ পথিক

ফুলেশ্বরী গায়েন

জন্মসূত্রে মা খোয়ালো বাবা থেকে নাই,
পথ হারা পথিক শিশু পুত্র
পথ খুঁজে নাহি পায়।
জন্মসূত্রে পা দুখানি অচল করেছে বিধাতা,
তাই হাতে ভর দিয়ে করে সে চলাফেরা।
দোকানে দোকানে ভিক্ষা মাগে করুন দৃষ্টিতে,
বিধাতার খেলা কে বুঝিবে এই পৃথিবীতে।
হঠাৎ একদিন স্টেশন সংলগ্নে,
পথিকের জীবনে স্বর্গ নেমে আসে।
দেখা হয় নিঃসন্তান স্নেহময়ী মায়ের সাথে,
স্নেহময়ীর তিন তিনটে সন্তান
গর্ভে মরিয়া গিয়েছে।
স্নেহময়ী সন্তান খোঁজে আহত মর্মান্বিত জীবনে,
পথিক সম্মুখে হাজির হইলো মা--মা বলে।
নিজ সন্তান গুনে স্নেহময়ী তুলিয়া নিল কোলে,
যেন যীশু মাতা মেরি,
বিশ্ব জননী এক করিয়া দিলে।

ধোঁয়ার সাথে উড়ে যাওয়া রাত
রিয়া দে

দিনগুলি কাটছে কিছুটা ভালো কিছুটা মন্দ নিয়ে। রোজ একই নিয়ম - সকালে ওঠা, তাড়াহুড়ো করে কাজে চলে যাওয়া, তারপর দিনশেষে কিছুটা খারাপ লাগা, কিছুটা ভালোলাগা এবং কিছুটা চিন্তা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরা। তারপর বাড়ি ফিরে নিজের পড়াশোনা শেষ করা। এইভাবেই কাটছে এক রকম স্ট্রাগল এবং স্ট্রেস ভরা একটি জীবন।

রাতে খাবার শেষে ছাদে একা বসে, যখন বাড়ির সব আলো প্রায় নিভে গেছে, সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দিলাম চলার পথের সমস্ত খারাপ লাগা গুলি এবং আরো একবার তৈরি হলাম আগামী দিনের যুদ্ধের জন্য।

জীবনটা যেন বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। প্রতিদিনই শেষ বেলায় এসে প্রিয় মানুষটাকে হারানোর কারণগুলি আমাকে ভাবায়। নিজের প্রতি হওয়া হাজারো অপমান, অপবাদ এবং লাঞ্ছনার স্মৃতিগুলি আবারও একবার মনে করিয়ে দেয় যে, নিজেকে আরও কতটা বদলাতে হবে।

এই যুগে দাঁড়িয়ে আমি এখনো অনেক বোকা। মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে ফেলাই আমার জীবনের কষ্টের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই, কারণ আমি মনে করি যত আঘাত পাবো, তত শক্ত হব। এবং বুঝতে শিখব এই দুনিয়াটা আসলেই কেমন।

আগে আমি ভাবতাম আমি খুব স্ট্রং একটি মানুষ। এখন যতদিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছি আমি আসলেই খুব বোকা এবং দুর্বল একটি মানুষ। এখনো কেউ আঘাত দিয়ে কথা বললে চোখ এমনিতেই ভিজে যায়।

নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে অনেকটাই। এখনো একটা সময়ের পর হয়তো আমি অনেকটাই পরিণত একটি মানুষ হয়ে উঠবো। জীবনের সঙ্গী হল দুঃখ, কোনদিনই সেটি বদলানো তো যাবে না। কিন্তু নিজেকে তো বদলানো যেতেই পারে। এটারই চেষ্টায় রইলাম আমি।

শুভ শারদীয়া

টিয়া বিশ্বাস

শিউলির গন্ধে ভোরটা আজ মিষ্টি হয়ে যায়,
কাশফুলের দোলায় শরৎ মনের কথা গায়।
নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোট্ট ভেসে চলা,
মায়ের আগমনী সুরে মন যে ওঠে দোলা।
ঢাকের শব্দ দূর থেকে কানে এসে বাজে,
পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে পাড়ার প্রতিটি মাঝে।
মা আসেন ভালোবাসা নিয়ে সবার ঘরে,
আশার ছোট্ট প্রদীপ জ্বালান অন্ধকারের পরে।
যার মনে আজ দুঃখ আছে, হাসি ফুটুক তার,
একলা মানুষ খুঁজে পাক আপনজনের দ্বার।
রাগ-অভিমান ভুলে গিয়ে হাত ধরি সবাই,
মায়ের কাছে এইটুকুই তো প্রার্থনা জানাই।
হিংসার কালো মেঘগুলো দূরে সরে যাক,
মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাক।
শারদীয়া হোক নতুন করে বাঁচার এক গান,
মায়ের আশীর্বাদে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ।
নির্মল হোক আমাদের মন,
সত্য আর ভালোবাসাই হোক জীবনের ধন।
পুজোর আলো ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীর পথে,
শান্তির কথা ফুটে উঠুক সবার মনের সাথে।
মা যখন ফিরে যাবেন, স্মৃতি রয়ে যাবে,
তাঁর দেওয়া ভালোবাসা হৃদয় জুড়ে রবে।
তাই আজ সবাই মিলে বলি ভালোবাসার বাণী—
শুভ শারদীয়া হোক সবার, এই আমার প্রার্থনা জানি।

আক্ষেপ

সাপ্নিক জোয়ারদার

ধরিয়া রাখিও

কৌশিকী কুন্ডু

মানুষে মানুষে কেনো এতো ভেদাভেদ,
ধনী আর গরিবের মধ্যে কেনই বা এত খেদ।
একই রক্ত, একই তো প্রাণ,
তবে কেনো মানুষে মানুষে,
আলাদা সবার সম্মান।
একই আকাশ, একই তো আলো,
কেউবা সাদা, আবার কেউবা কালো।
সোনার থালায় কেউ বা খায় ভাত,
আবার কেউ বা বাটি হাতে ভিক্ষা করেও
খালি থাকে তার হাত।
রাস্তায় ফুটফুটে শিশু,
খিদের জ্বালায় ঝরায় জল,
আমরা চলি আপন খেয়ালে,
হৃদয়টা যেন পাথর-অচল।
মিলেমিশে চলো হাত ধরে ভাই,
জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে আজ গান গাই,
সবার হৃদয়ে ফুটুক হাসি,
মানুষকে মোরা সব ভালোবাসি।

ধরিয়া রাখিও মোরে
রাখিও তোমার হৃদয় জুড়ে.....
যেমন করিয়া সাজাও
তোমার জামার বোতাম
ঠিক তেমনি সাজাবে মোর
লালচে শাড়ির আঁচল
যেমন করিয়া যতনে সাজাও,
তোমারও ফুলের বাগান
তেমনি যতনে সাজাবে মোর
অগোছালো প্রাক্ষণ।
সাজাইয়া রাখিও তোমারি দরবারে
আমার নামখানি,
যেমন থাকে শশাঙ্কের বুক
কলঙ্কের দাগ খানি,
ঠিক তেমনি।

শারদীয়া

কাকলি মন্ডল

বর্ষার শেষে আসে শরৎ, পুজো পুজো রব সারা জগৎ
মা আসছে স্বর্গ থেকে নেমে মর্তে হবে তারই আরাধনা
চারিদিকে কাশ ফুলে ভরা মা তুমি এসো, মা
তুমি এসো সকল অন্যায়ে বিচার তুমি করো
এতদিন সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে অপেক্ষায় রয়েছি মা গো তোমার জন্য
প্রতিটি মানুষ থাকে যেন ভালো
এই প্রার্থনা করি মাগো করি তোমার কাছে
প্রকৃতির সাথে আজ আমাদের মন সেজে উঠেছে।
কচি কাচাদের মন অনন্দে ভরে উঠেছে
ঢাকের তালে আর আলোর সজ্জায় মায়ের অপরূপ মুখখানি ভেসে উঠেছে
সেই আলোতেই ঘুচে যাক আমাদের সকলের মনের অন্ধকার
পাঁচটা দিন সব কিছু ভুলে থাকি উমা আসার আনন্দে
বাজারে অনেক ভীর জমেছে কেনা কাটার আনন্দে
চারি দিকে কতো নতুন জামাকাপড়
কোনটা ফেলে কোনটা নেবো, আনন্দেই সবাই আত্মহারা
ঠাকুর দেখতে যাবো সবাই প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে
নিত্য নতুন প্যাণ্ডেল গুলি আলোর সাজে দেখতে লাগে ভারী
পাঁচটা দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেলো অবশেষে
আবার একটা বছর অপেক্ষায় উমা আবার আসবে করে মর্তে।

পতাকা

অনাথ

কি ভাবছো! ঐ তেরঙা পতাকা?
ওটা কিন্তু একটুকরো কাপড় নয়,
ভেবোনা ওটা এক টুকরো কাগজ
ভারতবাসীর জীবনের প্রত্যয়।
ঐ এক টুকরো কাগজে নিহিত আছে
দু-শো বছরের ইতিহাস
ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধাদের পবিত্র রক্ত
বৃটিশদের কালো সন্ত্রাস!
ওটা মোটেও কোন তুচ্ছ কাগজ নয়
ভারতবাসীর গর্ব, অহংকার
সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে আছে
সময় নেই ইতিহাস দেখার?
জানো কি আগামী কাল স্বাধীনতা দিবস
তুমি তো ছোট জনবে কি করে!
শোন, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা
কাল পতাকা উড়বে ঘরে ঘরে।
ঐ যে পতাকার তিনটি রঙ দেখছো
গেরুয়া আছে সবার ওপরে,
গেরুয়া হচ্ছে সাহস আর ত্যাগের প্রতীক

ভারতবাসীর হৃদয় জুড়ে।
আর মাঝখান দেখো সাদা রঙের
সবার জীবনে শান্তির দ্যুতি,
সাদার মাঝে দেখো নীল অশোক চক্র
ওটা জীবনে চলার গতি।
পতাকার একদম নিচের রং গাঢ় সবুজ
মাটির উর্বরতা, আশার প্রতীক
পতাকা রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য
আমরা যে পতাকার সৈনিক।
এই পতাকায় নেই কোন জাত, ধর্ম, বর্ণ
পতাকা ভারতবাসীর ইতিহাস
পতাকা শুধুই ভারতবাসীর জন্য
মুছে দিতে দেশে সকল সন্ত্রাস।
আগামী কাল শির উঁচু করে বলো
আমি গর্বিত ভারতবাসী,
এক পতাকা তলে আমরা সবাই
অহংকারী ভারতবাসী।
দেখি লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণ
ঐ পতাকায় আছে আঁকা,
বল, যুগ যুগ ধরে রক্ষা করব শহীদ রক্ত
এ আমাদের জাতীয় পতাকা।

হালিসহর আনন্দম

মা আসছেন শারদ প্রাতে
অঙ্কিতা প্রধান

শান্ত দুটি পা
বর্ণালী গুপ্ত

শিউলির গন্ধে ভরে ওঠে ভোরের মিষ্টি হাওয়া,
কাশফুলের দোলায় যেন আনন্দেরই ছোঁয়া।
ঢাকের তালে বাজে সুর, জাগে নতুন প্রাণ,
মায়ের আগমনে আজ আনন্দে ভরে প্রাণ।
নীল আকাশে সাদা মেঘ, প্রকৃতি হাসে আজ,
আলপনাতে সেজে ওঠে ঘর আর পাড়ার সাজ।
মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি দূর করে সব ব্যথা,
আশীর্বাদের ছায়ায় মুছে যায় মনের কথা।
অঞ্জলিতে জোড়া হাত, চোখে ভক্তির আলো,
মায়ের চরণ ছুঁয়ে যেন কাটুক সকল কালো।
ধূপের গন্ধ, প্রদীপের আলো, মন্ত্রের মধুর সুর,
মায়ের কৃপায় দূরে যাক জীবনের সব দূর।
চারটি দিন আনন্দে কাটে, হাসে সবার মন,
আপন করে কাছে টানে প্রিয়জনের ক্ষণ।
বিদায়বেলায় চোখের কোণে জমে অশ্রুধারা,
মা গো তুমি আবার এসো, থেকে আমাদের সারা।
শারদ আকাশ সাস্কী থাক, ভালোবাসার টানে,
মায়ের আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ুক সবার প্রাণে।
গুপ্ত কাশে লিখে যাক এই উৎসবের গান,
মা দুর্গার আগমনে পূর্ণ হোক সবার প্রাণ।

এইমাত্র রাখলাম ক্লান্ত দুপুরে শান্ত দুটি পা
মেলে দিলাম আবছা রোদের আলোয়
বলেছিলে আলতা পড়ে থেকে -
ছুঁয়ে দেখব চতুর্দশীর রাতে।
মাঠের ধারে শ্রীখোল ছন্দ বাজে
ঘুঙুর গুলো ছড়িয়ে আছে দেখ,
মেঠো দাওয়ায় আলসেমির সোহাগ -
নিঃশব্দ বলে, থাক থাক থাক।
নকশি কাঁথা জড়িয়ে নিলাম গায়ে -
দূর আকাশে সূর্য ঘড়ি হাসে,
অপেক্ষার পিদিম জ্বালিয়ে রাখি,
ক্লান্তি কাটিও নিবিড় হয়ে সাথে।
রাত গুলো আলো ছায়ায় ঘেরা
নীল ঘূর্ণি আঁচল লুটিয়ে যায়,
শান্ত পায়ে একটুখানি চলা -
রোজনাচার কত কথা কপচায়।
আবার ভাবছি আলতা পরবো পায়ে
ছুঁয়ে দেখ, জোনাকজলা রাতে।

সময়

মালা প্রামানিক

কালের অমোঘ নিয়মে, সদা সে গতিময়,
বিরামহীন, ক্লান্তিহীন, - এগিয়ে চলা।
প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি, এমনকি জৈবিক বাহুবল
রোধ করতে পারে না -
নীরবে, নিঃশব্দে সে এগিয়ে চলেছে - আপোষহীন ভাবে
জগতের কাছে সে পরিচিত 'সময়' নামে

হায়রে! একদল লোভী, কুটিল, স্বার্থপর ব্যক্তিসমাজ
চেয়েছিল 'সময়কে' 'বশবর্তী' করতে,
অত্যাধুনিক যন্ত্র, অহংকার আর জটিল শিক্ষাকে
ভর করে - করতে চেয়েছিল বিশ্বজয়।

পারেনি! তারা পারেনি - 'সময়ের' 'কেশাগ্র' স্পর্শ করতে
ব্যর্থতা, বিফলতাকে স্বীকার করে
মাথা নত করে চূর্ণ হয়েছিল তাদের অহংকার।

'সময়' 'সে' মানে না কোনো বাঁধা,
তাঁর নেই কোনো স্থিতিশীলতা
আপন মনে, নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে,
ছন্দে ছন্দে পা ফেলে, এগিয়ে চলে চক্রাকারে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে, 'সময়ের' 'পরিবর্তন' ঘটে যায়,
কিন্তু তাঁর গতি থেমে থাকে না, তার নেই কোনো অপেক্ষা,
'সময়ের' নিয়মে 'সময়' এগিয়ে যায়।

ইচ্ছা

প্রসাদ ব্যানার্জী

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম আপনমনে
আচ্ছা – কোনোদিন গ্রামের আল ধরে হেঁটেছো?
ভোরের কুসুমিত সবুজ ঘাসের ওপর দেখেছো শিশিরবিন্দু?
অনুভব করেছো বৃষ্টিভেজা গ্রামের মেঠো পথের সোঁদা গন্ধ?
মনের অন্তর থেকে – মনের আবাহনে নেতিবাচক উত্তর এলো,
একি করে বলবো? কোনোদিন কি গ্রামে গিয়েছি?
শহর, শহরতলীতে বসবাস করা পেশাদার ব্যস্ত আমরা,
টিভির পর্দায়, বইয়ের পাতায় দেখেছি। - যাওয়া হয়নি।
চোখটা বন্ধ করতেই – ভেসে উঠল সেই মধুর গ্রামের কথা।
আবার নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা! তোমার ইচ্ছা করে না?
কাশ ফুলের মাঠের মধ্যে নিজেকে লুটিয়ে দিতে?
টোকা মাথায় চাষীভাইয়ের সাথে চাষ করতে?
গুনগুন করা গোয়ালিনীর পার্বনি গান শুনতে?
জেলোদাদার সাথে হাত মিলিয়ে জালে চাড়া লাগাতে?
মাটির কুঁড়েঘর, আলপনা আঁকা – সন্ধ্যা প্রদীপ,
সবুজক্ষেত, কালো দীঘির জল, রাতের জোনাকি –
ইচ্ছা করে না তোমার? মিশে গিয়ে তাদের হতে?
মনটা নড়েচড়ে উঠল – শিহরিত হল – ইতিবাচক উত্তর এলো
হ্যাঁ! ইচ্ছা করে! ইচ্ছা করে! আমার ইচ্ছা করে!
তাদের সাথে তাঁদের হয়ে – তাঁদের সাথে মিশে যেতে।

নক্ষত্রের আশ্রয়

সুনীল ঘোষাল

আকাশের সীমা খুঁজে চলেছি কোথায়?

মেঘের তালিকা লিখি।

অনন্ত পথের যাত্রা, বায়ুহীন,

জানি বেশি দূর যেতে, অনুচ্চারিত শব্দগুলি কণ্ঠ রোধ করে।

তোমার না বলা কথা সম্বল,

দৃষ্টির আলোয় ফোটে উন্নয়ন রথ।

ছাতার ভাঁজে ভাঁজে, তোমার আশ্বাস

দূরত্ব ধীরে ধীরে মুছে যায়।

ভুলে যাই পকেটে ওষুধ - পিছুটান।

সারারাত জ্যোৎস্না ও শিশিরের ভেজা মুখ

ডুবে যাচ্ছি অনন্ত আলোকে।

আসলে গন্তব্য টা ঠিক জেনে গেছি।

এখন সময়ের অপেক্ষা, ধীর স্পন্দনহীন বুকের দৃশ্য দেখি।

শোভাময় দ্বিতীয় আকাশ মাথার উপর ছায়া ফেলে।

পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের এক অবতার

জন্ম নিয়েছে দেখি, ধরণীর বুকে।।

অদ্ভুত ঘড়ির শব্দ

কনকেন্দু চ্যাটার্জী

মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম আমলকীতলা। সময় যেন সেখানে থমকে আছে। নেই শহরের কর্মব্যস্ততা, নেই কোলাহল, নেই চটুলতা। আছে শুধু গভীর নিস্তর্রতা আর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যের গন্ধ। গাছপালা এক অদ্ভুত নীরবতায় ঘেরা। মনে হচ্ছে, প্রকৃতি শ্বাস নিচ্ছে না। এই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি পুরনো জমিদার বাড়ি, নাম “ইচ্ছাময়ী ভবন। এখন সেখানে কেউ থাকে না। কিন্তু এক সময় এই প্রাসাদে থাকতেন জমিদার রজনীকান্ত চৌধুরী এবং তাঁর পরিবার। বাড়িটির মধ্যভাগে ছিল একটি বিশাল হলঘর, যেখানে একটি অদ্ভুত ঘড়ি টাঙানো ছিল। পুরনো ধাতুর তৈরি, গোলাকার, ঠিক উপরে শ্যামলাবর্ণ নারীর মুখ খোদাই করা। কথিত আছে, এই ঘড়িটি কেবল রক্তের বিনিময়ে চলে। সালটা ছিল ২০০৭। কলকাতা থেকে আগত গবেষক কৃষ্ণেন্দু সেন এসেছিলেন লোকশিল্প ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। আমলকীতলার কথা বহু পুরনো কাগজে পড়ে তাঁর কৌতুহল জন্মায়। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে বারণ করেছিল ইচ্ছাময়ী ভবনের কাছে যেতে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু সহজে ভয় পাওয়ার মানুষ নন। খুবই ডাকাবুকো স্বভাবের। প্রথম দিন বিকেলেই তিনি ওই জমিদার বাড়ির সামনে পৌঁছান। অর্ধভাঙা বিশাল ফটক, আগাছায় ঢাকা সিঁড়ি, চারিদিক মাকড়শার জালে ভর্তি এবং ঘরের জানালায় কাঁচ ভাঙা। সব মিলিয়ে যেন এক জীবন্ত ভূতুড়ে চিত্রকল্প। কিন্তু তার থেকেও বেশি নজর কাড়ে ঘড়িটা — যা দেওয়ালে ঝোলানো, অথচ ১০:৪৬ মিনিটে বন্ধ হয়ে আছে বিগত ৫০ বছর ধরে। কৃষ্ণেন্দু সেখানেই কাটাতে চান একটি রাত। রাত তখন ১১টা। কৃষ্ণেন্দু ক্যাম্পিং টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের এক কোণে বসে নোট করছেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পান — “টিক ... টিক ... টিক ... ” কৃষ্ণেন্দু মাথা ঘুরিয়ে দেখে — ঘড়িটি হঠাৎ চলছে! তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন — ঘড়ির কাঁটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ১০:৪৭-এর দিকে।

হঠাৎ বাতাস যেন থেমে যায়। ঘরের চারপাশে শোনা যায় ফিসফাস কণ্ঠ “ ঘড়ি চলছে... মানে আবার কেউ এসেছে... রক্ত চাই... কৃষ্ণেন্দু আতঙ্কিত হয়ে উঠেন, কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখেন। তিনি জানেন, বহু প্রাচীন বাড়িতে শব্দ প্রতিফলনের কারণে এমন বিস্ময় হতে পারে। কিন্তু তখনই তিনি ঘড়ির নিচে দেখতে পান — একটি ছোট মাটির পাত্রে জমে থাকা লাল তরল! যেন কেউ কিছুক্ষণ আগে

রক্ত ঢেলে রেখেছে। এখানে আসার আগে কৃষ্ণেন্দু স্থানীয় এক বৃদ্ধ পন্ডিত শঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি শুনিয়েছিলেন এক ভয়ঙ্কর কাহিনী ১৮৭৫ সালে জমিদার রজনীকান্ত চৌধুরী এই ঘড়িটি আনিয়েছিলেন ফরাসি এক কারিগরের কাছ থেকে। কিন্তু এটি ছিল এক টানাদেওয়া যন্ত্র, যা চলত এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় — রক্ত দিয়ে তৈরী এক তেলজাত দ্রব্য দিয়ে। ঘড়িটি প্রথমে প্রতীকী হলেও পরে বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে — যতদিন বাড়ির কেউ রক্ত দেবে, ততদিন বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হবে। ১৯৫৭ সালে, শেষবারের মতো জমিদার পরিবারের এক সদস্য, বিনয়কান্ত, ঘড়িতে মানুষের রক্ত ঢালেন। তার কয়েকদিন পরেই তিনি আত্মহত্যা করেন। আর তখন থেকেই ঘড়িটি বন্ধ হয়ে আছে ১০:৪৬-এ। কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণের পর কৃষ্ণেন্দু আবারও ঘড়ির দিকে যান। তিনি লক্ষ্য করেন, ঘড়ির নিচে রয়েছে একটি ছোট খাঁজ। অজান্তে চাপ দিতেই খুলে যায় একটি গোপন দরজা।

সেই দরজা দিয়ে নামা যায় একটি ভূগর্ভস্থ ঘরে, যেখানে পাথরের দেয়ালে আঁকা এক নারীমূর্তি — শ্যামলা, মাথায় খোঁপা, কপালে ত্রিকোণ চিহ্ন। তার নিচে খোদাই করা আছে — “আমাকে জাগাও, আমি তোমায় রক্ষা করবো। যদি আমাকে বন্ধ করো, আমি তোমায় গিলে নেবো।” ঘরের এক পাশে রয়েছে পুরনো খাঁচা, শিকল, আর অনেকগুলো ছোট শিশি — সবগুলোতেই লাল তরল। মনে হয়, ঘড়ির যন্ত্রটি এখানেই রিচার্জ হতো!

কৃষ্ণেন্দু কিছুক্ষণ ভাবলেন, কি হচ্ছে এসব। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ করে আবার ১০:৪৭ থেকে চলতে শুরু করল। এবার সে কাঁটা ঘুরতেই থাকল, ঘরের চারপাশে বাতাস হুহু করে উঠল, সব কাগজ-ফাইল উড়ে যেতে লাগল। আর ঘরের মধ্যে ভেসে এল একটি ভয়ানক মুখ! সেই নারীমূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠল, চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছিল। “তুমি তো রক্ত দাওনি, তবে কেন ঘড়ি চালালে? এবার তোমার সময় শেষ...”

কৃষ্ণেন্দু প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। হলঘরে এসে অবাক হয়ে দেখেন — ঘড়ির কাঁটা আবার ১০:৪৬ - এ এসে থেমে গেছে। কৃষ্ণেন্দু আজও বেঁচে আছেন, তবে তিনি আর কখনও কারো কাছে এই ঘটনা বিস্তারিত বলেন না। শুধু একটি কথা বলেন — সময় এক অদ্ভুত খেলোয়াড়। যদি তার নিয়ম না জানো, তবে সে তোমাকে গিলে ফেলবে। “ইচ্ছাময়ী ভবন আজও অন্ধকারে ডুবে থাকে। আর ঠিক রাত ১০:৪৬ মিনিটে, একবার করে টিক দেয় এই অদ্ভুত ঘড়ির কাঁটা।

সে আমার বন্ধু ছিল না
নয়না বিশ্বাস

অজস্র ভিড়ের মাঝে, খুঁজে বেড়ায় আমি কাকে?
যাকে চিনতাম আজ সে অচেনা আমার কাছে।
আজ সে অন্য কারো প্রেমিক, নয়তবা অন্য কারো বন্ধু!
তাকে আমি চিনতাম বহু বছর আগে।
খোঁজ নেয়না সে এখন আমার অন্য কাউর কাছে
অন্যেরা হলো আজ নিজের
তাইতো আমি হলাম পর তোমার কাছে।
তুমি তো বলেছিলে একদিন-
২ জন ২ জনকে ছাড়বো না কোনোদিন
যতই আসুক বিপদ ঝড়
আজ পড়েনা মনে আমার কথা।
আমার লাগলে আঘাত হতো তোমার ব্যথা।
সারাদিনের পর আমায় করতে তুমি জিজ্ঞাস?
কেমন গেলো তোমার সারাদিন শুনি বলো;
বলতে তুমি পেয়োনা ভয় আছি তোমার পাশে।
বলতে তুমি সেদিন আমায়,
সব যদিও যাই ভুলে, ভুলব নাকো তোমায়।
সবই এসব গল্পকথা আগে জানলে হতো!
একটাও নয় সত্যি কথা সবি বানানো গল্পও।
জানোই যখন থাকবে নাতো এসেছিলে কেনো মন গড়া কথা বলতে
আমি সব ভুলে গিয়ে চাইনাকো তোর মতো বন্ধু করতে।
বন্ধু তুই থাক ভালো, তোর জীবনটা হোক সুখময়।
খারাপ হোক ভালো হোক থাক তুই আমার বন্ধু
ভালো বন্ধু ভালোই বন্ধু।

কানাওলা

স্বপ্নারূন বন্দ্যোপাধ্যায়

কানাইপুর বাজার থেকে একটা বিশাল ইলিশ মাছ সঙ্গে এক কৌটা বাটার ওয়েল আর চিনি, আতপ চাল নিয়ে অবনী চলল দেশের বাড়ি। সঙ্গে তার মামাতো বোন সৌমা আর তার স্বামী বিশ্বরূপ। ওরা কলকাতা থেকে আসছে বাংলাদেশে পিসি পিসেমশাই কে দেখতে।

ওরা বিশালান্ধী তলায় নেমে বাজারের ভেতর দিয়ে হেঁটে শিবতলা ঘাট থেকে নৌকায় ওঠে। অবনীদেব - দেশের বাড়ি নিগমপুর যেতে হবে নদীপথে। শুকনোর দিনে কষ্ট করে হেঁটে যাওয়া যায় কিন্তু এই বর্ষাকালে অসম্ভব। কোথায় নদী, কোথায় মাঠ বোঝার উপায় নেই তখন, ভরসা ওই নৌকা।

সৌমা কলকাতা শহরের মেয়ে হলেও জলকাদায় ভয় নেই। অবনীদেব নিঘুমপুরে পিসি পিসেমশাই ছাড়াও এক আকর্ষণ জাগ্রত কালী মন্দির। অবনীর এক জ্যাঠা সেখানে তন্ত্রচর্চা করতেন। সেই উমাকান্ত জ্যাঠা ভারতে চলে গেছেন। কলকাতার বাড়িতে গিয়ে উনি বলেছিলেন পারলে একবার দেশ থেকে মা কালীকে দর্শন করে আসিস। সেই তবে থেকে সৌমার দেখার ইচ্ছা। যাহোক অবনী সবাইকে নিয়ে নৌকা করে রওনা দিয়েছে সন্ধ্যা সাতটা আটটা হবে। ঘন্টাকানেক নৌকা চলার পরও তারা পৌঁছাচ্ছে না দেখে অবনী বলে কি ব্যাপার সাবীর মিঞা? এত দেরি লাগে কেন? আমাদের তো পৌঁছে যাওয়ার কথা। সাবীর ও হাল নাড়াতে নাড়াতে বলে তাই তো, আমিও তো ভাবতে আছি হল কি? বিশ্বরূপ বলে তার মানে? সাবীর বলে এত কেবল একই স্থানে ঘুরতছি। সত্যি তাহলে কি হবে? হায় আমার মাছটা বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে। এবার সাবীর চোখ পাকিয়ে বলে ও মাছ আনছেন নি? হ্যাঁ। ওই জনাই পিছনে লাগছে। কে? মাছ নদীতে ফেলে দেন। কি বলছ সাবীর মিঞা? এত দাম দিয়ে এত বড় মাছ কিনলাম? তয় আর কি করবেন সারারাত পানিতে থাকেন, ভোরে পৌঁছাবেন না নে। পাড়ে আলো ফুটলি, পথ চিনুম। সৌমা সাহসী মেয়ে, সে হেসে বলে অবনিদা, বিস্কুটের একটা প্যাকেট এনেছেন না ওটা দেন খেয়ে শুয়ে পিরি। বিশ্বরূপ অবাক! তোমার ভয় লাগছে না? ভয় করে কি হবে ঘুম পেয়েছে। ওরা একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আলো ফুটেছে। নৌকা ঘাটে টাল খাচ্ছে। মাছটা কে যেন কাঁটা বেছে খেয়ে গেছে।

বিবাদী

উজান দাস

চেয়েছিল সে ডাক্তার হতে, হয়নি পূরণ সে লক্ষ্য
কিন্তু আবার সেই ছেলেটিই বন্দুক হাতে বেশ দক্ষ।
দেশপ্রেমে ছিল ভরা যার শরীরের প্রতিটি কোশ
মুসীগঞ্জের সিংহ শিশু বিনয় কৃষ্ণ বোস।

সুধীর নামেই চিনতো সবাই, পদবী ছিল গুপ্ত
বাদল হয়ে গর্জে উঠল ভয়কে করল লুপ্ত।
বিক্রমপুরে জন্ম তার কম ছিল না শক্তি
তার সঙ্গে বুকের ভিতর অভাব্য দেশভক্তি।

বিনয়ের গ্রামে জন্ম নিল, পদবী নিল বাদলের
দীনেশ গুপ্ত ছিল বাঘাঘতীন আদলের
রাইটার্স বিন্ডিং সেদিনও চলছিল অন্যদিনেরই মতো
বিনয় – বাদল - দীনেশ আসায় সমস্যা হলো যত।

তিনজনের তিনটি বন্দুক, লক্ষ্য কর্ণেল সিম্পসান
কর্ণেল কিছু বোঝার আগেই হয়ে গেল তার অবসান
কাজ শেষ এবার পলায়ন, কিন্তু পালাতে পারল না
বাদল গুপ্ত খেল বিষ, দিলোনা আর সাড়া।

ঘায়েল হয়ে বিনয় ঘোষও, দিলেন হাল ছেড়ে
ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দীনেশের প্রাণটাও নিল কেড়ে
ইতিহাসের রংহীন পাতায় আবার, পরল রক্তের দাগ
ডালহৌসি স্কোয়ার আজ তাই হয়ে গেছে বিবাদী বাগ।

ধ্রুবতারা

মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল

রত্নগর্ভা জননী তুমি বঙ্গভূমি
দিয়েছো জনম অগনিত রতন
হিরে পাল্লা চুণী।
বীরসিংহের সিংহশিশু নাম ঈশ্বর
বিদ্যা আর জ্ঞানে তুমি অথৈ সাগর।
কর্মবীর তুমি, মানুষের সেবায় ছিলে আগুয়ান
অসহায়ের দয়ার সাগর দেবতুল্য মহান।
মাতৃজাতি নারী ছিল ভীষণ অসহায়
তাদের হাতেখড়ি দিয়েছিল তোমার বর্ণপরিচয়।

বিধবাদের জীবন ছিল দুঃখেভরা প্রাণ
শাস্ত্র খুলে দেখিয়েছিলে তাদের পূর্ণবিবাহের প্রমাণ।
বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের চ্যালেঞ্জ ছিল
তোমার আপসহীন লড়াইয়ের শপথ
তোমার কীর্তি জয় করেছে ইতিহাসের পথ।
তোমার চিন্তন প্রসূত 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার'
নারীকুলের অগ্রযাত্রার বলিষ্ঠ সোপান।

চির ভাস্বর তুমি, তুমি ধ্রুবতারা
তুমি বিনা পথভ্রষ্ট মোরা দিশেহারা।
স্মরণে বরণে বাঙালির হৃদয়ে তুমি অনন্ত অম্লান
চিরদিন - চিরকাল।

ঝরা পাতা
দিশিতা হালদার

আমি বসে তাকাই সেই দিকে
নিচে দুটো, তিনটে, ঝরা পাতার দেহ ফিকে,
ঠিক যেন আমার এক একটি অপূর্ণ লক্ষ্য করে দেয় সাড়া।
শীতল হাওয়া, গাছটার গুরু আবছায়া।
মৃত, অসাড় - ঠিক যেন মন আমার
হাজার ঝড়, হাজার অপমান, হাজার প্রত্যাশা না পূর্ণ করার ধিক্কার।
মাটিতে, ধুলোয় মিশে সেই জীর্ণ পাতাগুলি ডাকে -
'হায় অদৃষ্ট! মোদের কি আর বাঁচার উপায় নেই?'
হাহাকার, হতাশা -- কেবলই লাঞ্ছনা বেজে ওঠে আমারও বুকে -
তবে কি আমিও সেই অসফল অপারকদের দলে?
লক্ষ্য বটে, ইচ্ছে নয়।
হাজার বঞ্চনা অপবাদে, দুইয়ের বিভেদ ভুলেছি যে -
তাই আমিও আজ ঝরাপাতা -
সেই হতাশার শেষ নিঃশ্বাসটির অপেক্ষারতা।
যেন ওদেরই মত মরমর করে উঠে মাঝেমাঝে -
আমিও কেঁদে উঠি।
পথিকের অবহেলায় যেমন ঝরাপাতা -

হালিসহর আনন্দম

আমার অশ্রুজলও তেমনি, - অদেখা, মূল্যহীন অভিনয়।
আমি আরো কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসি আমার ঘরের কোনটায়
জানলার ওপারে সেই মাঠ, সেই মৃতপ্রায় গাছ আর ঝরাপাতা।
কেবলই কী আশাহীনতা? কেবলই কি হীনতা?
জানা নেই জানা নেই আছে শুধু শূন্যতা।
হঠাৎ শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে
সোয়েটারের মোটা কাপড় ভেদ করে কনকনে এক হাওয়া।
এও কী তবে জানলার ওপার থেকে আসা বার্তা? নিশ্চয়ই তাই।
এক চিলতে রোদ যেন মারল উঁকি, গাছটার ন্যাড়া ডাল কুয়াশায় প্রস্ফুটিত করে।
ঠান্ডা হাওয়া টা আবার আমায় জাগিয়ে তুলল জরতর ঘর হতে
'জীবন যে একটাই' ঝরা পাতা থাক, সজীব সবুজ তো আবার
আমি এবার আকাশের এক ফালি রোদ আর সূর্যের দিকে চাই
সত্যিই তো! এও কি সম্ভব?
আবার যে বাঁচার উদ্দেশ্য খুঁজে পাই!
লড়ব, প্রত্যাশা পূরণ করতে নয় –
ওই লক্ষ্য আর ইচ্ছেকে মিলিয়ে মিশিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাই।

তুমি আরেকবার এসো কথাশিল্পী
দীপদুলাল বিশ্বাস

তুমি আরেকবার এসো কথাশিল্পী
আমাদের বিধ্বস্ত এই মাটিতে তুমি
ফিরে এসো আবার
চেয়ে দেখ অহল্যা দেশ আমার
শুয়ে আছে মৃত্যুর ঘুমে!
বিপন্ন মাটিতে এখনও লেগে আছে
বন্ধিত মানুষের রক্তের দাগ
নিঃশব্দ চিৎকারে ভেঙে যাচ্ছে অবরুদ্ধ
শব্দের শরীর
এখনও দাঁড়িয়ে আছি আমরা ধ্বংসের কালভূমে
পুড়ে যাচ্ছে হিংসা আর ঘৃণার আগুনে
দেশ-মাটি-সংসার!
চেয়ে দেখ... সমাজের জীর্ণ শরীরে
আজও লেগে আছে "রাজলক্ষ্মীর" সতীত্বের
রক্ত-মাংস-মেধ... কমললতা-বিরাজ বউয়ের
স্নেহদীর্ঘ হৃদয়ের করুণ রক্তক্ষরণ!
আজও সহস্র পার্বতীর অতৃপ্ত প্রেম
পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে বার্থ দেবদাসের
কামনার আগুনে!
কলঙ্কিত বিধবার শুভ্র শাড়িতে তুমিই তো
খুঁজেছিলে বেঁচে থাকার জীবনের রঙ
অস্পৃশ্যের ধূলিময় উঠানে তুমি ফুটিয়েছিলে
বিদ্রোহের রুদ্ধপলাশ!
দলিতের বিক্ষুব্ধ পদচিহ্নকে তুলে এনেছিলে
মুক্তির মুখরিত রাজপথে।

চেয়ে দেখ কথাশিল্পী
আজও পাপ আর পুণ্য দিয়ে মাপতে হয়
রমার মতো অসহায় নারীদের
নারীত্বের অধিকার!
আজও অগণিত অভাগীর তুচ্ছ কাঠের চিতায়
পুড়ে যাচ্ছে অন্ত্যজ মানুষের ঈশ্বর!
সহস্র অভয়া-অচলা-কিরণময়ীরা
অসম জীবন সংগ্রামে হারিয়ে যাচ্ছে
সমাজ-সভ্যতার আবিল অন্ধকারে!
মানবিক অবক্ষয়ের এই ক্রান্তিক্ষণে
আমরা তোমাকে চাই বন্ধু
আমাদের চেতনার নির্মম মৃত্যুর আগে
তোমার শণিত কলমের দুর্গিবার আঘাতে
আবার জেগে উঠতে চাই
আবার মানুষের গান গাইতে চাই
তুমি আরেকবার এসো ওগো কথাশিল্পী
আরেকবার এসো আরেকবার এসো
আরেকবার এসো!!

মা এলো
ঋত্বিকা চৌধুরী

অজানা সুর
বৈদ্যনাথ পাল

ভোরবেলায় শিউলি ফুলের গন্ধ,
মা এলে ঢাকের তালের ছন্দ ।
নীল আকাশে মেঘের খেলা,
পুজোর মাঠে বাচ্চাদের মেলা ।
মা আসার কথা ভেবে,
এই কথা ভেবে সবার যেন মন উঠে নেচে ।
কাছের মানুষ ঘরে ফেরে,
আবেগ জাগে মনের অন্তরে ।
মায়ের অনন যেন শান্ত স্নিগ্ধ,
ভক্তরা আজ আনন্দে মুগ্ধ ।
নতুন জামার গন্ধ, বন্ধুদের আড্ডা,
খুশিতে মোজে ওঠে শহর ও পাড়া ।
ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন,
সপ্তমীতে কলা বউ স্থাপন ।
অষ্টমীতে মায়ের সামনে অঞ্জলি,
নবমীতে ঢাকের কাঠি ও
কাশরের আওয়াজে সন্ধ্যাআরতি ।
দশমীর রাতে মায়ের বিদায়ের সুর,
সিঁদুর খেলায় নারীরা মেতে ওঠে বহুদূর ।
আসছে বছর দেখার আশা
রয়ে যায় মনের মায়ের জন্য ভালোবাসা ।

দুঃস্থ মনের মিষ্টি কথা একটু যদি শোন,
স্বপ্ন বরা মিঠে হাওয়ায় নিজেকে আবার চেন ।
কোন সে হাওয়ায় মিঠে ছোঁয়ায় প্রথম পরিচয়,
বলেছিলে মনের কথা নিশ্চিন্তে নির্ভয় ।
ছিল অনেক প্রতিশ্রুতি স্বপ্নমধুর আশা,
মনের রঙে রঙ মাখিয়ে অনেক ভালোবাসা ।
চলা বলা খোলামেলা হোক না সহজ বাঁকা,
শিমুল পলাশ হাসনাহানায় মনের খাতায় আঁকা ।
জ্যোৎস্না মাখা চাঁদের আলোয় দুটি মনের রথ,
না চাইতেই চিনেছিল আঁকা বাঁকা পথ ।
বসন্তের ঐ মিঠে হাওয়ায় কুজন গাওয়া পাখি,
দু হাতে বেঁধেছিলে স্বপ্ন মাখা রাখি ।
হোলির রঙে মিশিয়েছিলে মনেরই রঙ,
ক্ষীর ননী গায়ে মেখে সেজে ছিলে সং ।
হঠাৎ কোন দমকা হাওয়ায় মন সাগর উত্তাল,
দিক ভ্রান্ত পরিশ্রান্ত ছিঁড়লো নাও পাল,
হারিয়ে গেল পথ সাথী অজানা কোন সুরে,
মাঝে মাঝেই বাজে বাঁশি চেনা জানা সুরে ।

মারোমার ফরেস্ট

তাপস কুমার দত্ত

মারোমার ফরেস্ট রেস্ট হাউস (Maromar Forest Rest House) হলো ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের লাতেহার জেলায় অবস্থিত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ঐতিহাসিক জঙ্গল বাংলো। এটি পালামৌ টাইগার রিজার্ভ (Palamau Tiger Reserve)-এর অন্তর্গত এবং বেতলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। বিখ্যাত বাঙালি লেখক বুদ্ধদেব গুহর লেখায় এই মারোমার বাংলোর নস্টালজিক উল্লেখ পাওয়া যায়।

এটি ব্রিটিশ আমলের একটি পুরনো শিকারী লজ, যা ১৯৪৭ সালে সংস্কার করা হয়েছিল। এখানে বড় বড় ঘর, ড্রইং রুম এবং ফায়ারপ্লেস (বর্তমানে বন্ধ) রয়েছে।

প্রকৃতির আরও কাছাকাছি থাকার জন্য এখানে গাছের ওপর সুন্দর কাঠের কটেজ বা ট্রি হাউস তৈরি করা হয়েছে। এর বারান্দা থেকে সরাসরি জঙ্গল দেখা যায়।

চারদিকে পাহাড় এবং ঘন শাল-মহুয়ার জঙ্গল। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে সম্পূর্ণ শান্ত ও নিবিড় পরিবেশ উপভোগ করা যায়। বাংলোর ঠিক পিছন দিক দিয়ে একটি ছোট পাহাড়ি ঝোরা বা নদী বয়ে গেছে, যেখানে হেঁটে যাওয়া যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে বাংলোর আশেপাশে হরিণ (চিতল), ময়ূর বা বিভিন্ন নাম না জানা পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

অক্টোবর থেকে মার্চ মাস এখানে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে সেরা সময়, কারণ এই সময় আবহাওয়া খুব মনোরম এবং কুয়াশায় ঘেরা থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম থাকে।

প্রকৃত ভালোবাসা

মদন ঘোষ

দুজনের বাড়ির দূরত্ব সামান্য। রঞ্জনের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সুমনাদের বাড়ির লোকজনদের দেখা যায়। সুমনার ফুলের শখ। বাড়ির উঠোনের এক পাশে ফুল গাছ লাগিয়েছে। কিছু ফুল গাছ টবে। সুমনা নিজে পরিচর্যা করে। রঞ্জনের শখ বাঁশি বাজানো, সুমনার শখ গোলাপ ফুল গাছে। টবে রজনীগন্ধা ফুল ফুটেছে। রঞ্জন বাড়িতে বসে ফুলের সুবাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। রঞ্জনের বাঁশির সুর শুনে সুমনার মনপ্রাণ ভরে যায়। দুজনে স্কুলে পড়ছে। লুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করে। মেলামেশা করতে শঙ্কা হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে দুজনেই কলেজে ভর্তি হয়েছে। এখন ওরা অবাধে মেলামেশা করে। ওদের ভালবাসা উভয়ের বাড়ির অভিভাবকরা জেনে গেছেন। রঞ্জন কলেজে পড়ার সময় থেকেই চাকরির চেষ্টা করছিল। চাকরি হলেই সুমনাকে বিয়ে করবে। উভয়ের বাড়ির মত আছে। সুমনা গ্রাজুয়েশন করছে, সুমনা আর পড়বে না। রঞ্জন গ্রাজুয়েশন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বাবা মা সুমনার বিয়ে দেবেন। সুমনা রঞ্জনকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করবে। বাবা মা বেকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। সুমনা রঞ্জনকে বলল যে - শোনো, একটা চাকরির ব্যবস্থা কর। বাবা মা বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছে। রঞ্জন বললো সুমনা, তুমি তো জানো কলেজে পড়ার সময় থেকেই আমি চাকরির চেষ্টা করছি। সুমনার বাবা-মা অপেক্ষা করতে নারাজ। পাত্র দেখে সুমনার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সুমনা বিয়ে করেছে রঞ্জন কে বলল না।

রঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিল। স্বাক্ষরীতাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিল। দুজনার পরিচয় হয়, মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হতেই প্রেম ভালবাসা। স্বাক্ষরতা এমএ.এমএসসি পাস করে বিদেশী কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। রঞ্জন এম.এ এমকম পাস করেছে কিন্তু এখনো চাকরি পায়নি। চেষ্টা করছে।

বাবা মা স্বাক্ষরিতার বিয়ে দেবেন। স্বাক্ষরিতা বাবা মাকে বলল সে রঞ্জনকে ভালোবাসে, ওকে বিয়ে করবে, অন্য কাউকে নয়। স্বাক্ষরিতার বাবা-মা রঞ্জনদের বাড়ি এসে রঞ্জনের বাবা-মার সঙ্গে কথা বললেন। রঞ্জনের বাবা-মা বললেন রঞ্জন চাকরি করে না। বেকার ছেলের বিয়ে! তা কি করে সম্ভব। স্বাক্ষরিতার বাবা-মা বললেন, আমাদের মেয়ে আপনার ছেলেকে ভালোবাসে, ওকেই বিয়ে করবে। আমরা পাকা কথা বলতে এসেছি। বিয়ের দিন সেটল করলেন। যথারীতি শুভদিনে স্বাক্ষরীতা আর রঞ্জন এর বিয়ে হল। বিয়ের কিছুদিন পর রাস্তায় স্বাক্ষরীতার সঙ্গে সুমনার দেখা। সুমনা জানতে চাইলো আপনি বেকার ছেলে অঞ্জন কে বিয়ে করেছেন? স্বাক্ষরিতা বলল হ্যাঁ, আমি রঞ্জনকে ভালোবাসি। রঞ্জন চাকরি করছে-কি করছে না সেটা ওর ব্যাপার। চাকরিটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভালোবাসা আমার কাছে মহার্য। রঞ্জন তফাতে দাঁড়িয়েছিল, সুমনা খেয়াল করেনি। কাছে এসে বলল সুমনা কেমন আছো? তোমার হাজব্যান্ড কোথায়? দোকানে গেছে সিগারেট কিনতে। সুমনা তুমি তো সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারো না। কত বলি, মানা করি শোনে না আমার কথা। স্বাক্ষরীতা বলল রঞ্জন কোন নেশা করে না। চাও খায় না। জানি ওর মতো ছেলে আজকের দিনে বিরল আমার আত্মীয়-স্বজন ওর খুব প্রশংসা করে। আপনি একসময় রঞ্জনকে ভালোবাসতেন, রঞ্জন আমায় বলেছে। রঞ্জন বলল স্কুলে পড়ার সময় থেকে আমরা একে অপরকে ভালবাসতাম। আমাদের ভালোবাসা, রোমান্টিক ফুলের সুবাস, আর বাঁশির সুর শুনে দুজনে প্রেমে পড়েছিলাম। আমি অন্তর দিয়ে সুমনাকে ভালবাসতাম। সুমনা আমায় ভালোবাসতো না, ভালোবাসতো আমার চাকরিকে, স্বাক্ষরীতা বলল রঞ্জন ওনাকে কষ্ট দিও না চলো। সুমনার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। মুখের ওপর সুমনার হাজব্যান্ড রাকেশ সিগারেট খেতে খেতে এসে ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইলেন-সুমনা কি হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? সুমনা কোন কথা না বলে চোখের জল মুছে হাঁটতে থাকল।

অমরনাথে গুরুজী - গুরুজী অমরনাথে

স্বপন পাল

গুরুজী -গুরুজী ছোট ছোট শিশুর মুখে এই ডাক শুনতে ভীষণ ভালো লাগছিল। অমরনাথ তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে এই নামে বার বার ডাক শুনে আমার অন্তর আন্দোলিত হচ্ছিল। কখনও কেউ - গুরুজী আপকা সাথে এক সেলফি লেঙ্গে! আবার কেউ পায়ে পড়ে যাচ্ছে - গুরুজী আশীর্বাদ দিজিয়ে। কেউ দণ্ডবতে প্রণাম করে - গুরুজী, আপকা দর্শন তো হামারা সৌভাগ্য খুল যায়েগা। গুরুজী কাঁহাসে আয়া? বয়সে বড়রাও অনেকে আমার হাত নিয়ে মাথায় রাখছে। গুরুজী পথ চলতে চলতে পাঞ্জাবী ধাবা দেখে দাঁড়ানো, একটু চা, চায়ের সাথে টা, ঠাণ্ডায় বেশ লাগছিল। আর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ স্থির রাখার থেকে একটু বিশ্রাম। সাথে আমাদের ডাইভার আশরাফও একটু বিশ্রাম পায়। আবার চলতে চলতে এক গ্রামে, দোকানে নানান ফল। কলা ১৫০ টাকা ডজন, আপেল ১০০ টাকা কেজি। কিছু নিলাম, চলতে চলতে এখানকার ফল কেমন দেখা যাক, অদिति গাড়ি থেকে নেমে এসেছে, টয়লেট যাবে। জিঞ্জেস করলাম সেই ফলওয়ালাকে - তিনি তার দোকান লাগোয়া বাড়িতে যেতে বললেন। অনেকটা ভেতরে। আমিও সাথে গেলাম। বাড়ির লোক এসে দেখিয়ে দিল আরও দূরে আপেল বাগানের মধ্যে। ওয়াও! কি সুন্দর! কত আপেল, নিচেও পড়ে আছে। টুপ টাপ পড়তেই আছে তো। যেটাই পড়ছে, সেটাই কাছে থাকা ব্যাগে ভরছি। তারপর যখন ফিরে আসছি, বাড়ির দরজা থেকে উঁকি মেরে ফলওয়ালার বউ হবে হয়তো, গুরুজি, হামারা বাচ্চাকো সাথে এক ফটো খিচেঙ্গে? অদिति বাচ্চা দুটোকে আমার পাশে দাঁড় করালো। ওদের মা ফটো তুললেন বেশ কয়েকটি। খুব সুন্দর হাঁসি আর আপেলের মত গাল। আদর করতে ইচ্ছে হবেই। বাচ্চাদুজনকে আদর করে দুটি ক্যাডবেরি দিলাম। ক্যাডবেরি ব্যাগে রাখতেই হয়, কারণ পাহাড়ী পথে কোথায় খাবার পাবো, তাই। ক্যাডবেরি খেলে অনেক এনার্জি পাওয়া যায়। আর কর্পূর সাথে রাখতে হয় - স্বাসকষ্ট হলে নাকের কাছে রাখলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। লাদাখ থেকে ফেরার পথে এই জায়গাটা ছিল নুরা ভ্যালী ছাড়িয়ে কার্গিল এর আগে।

সবথেকে ছোট শিশু ছয় মাস হবে বয়স। কান্নাকাটি করছিল, আমার কোলে এসেই চুপ করে গেল। আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। তখন

কার্গিল স্মৃতিসৌধে আলপিন পড়ার শব্দ শোনার মত নিস্তব্ধতা। কার্গিল গ্যালারী দর্শণ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি - গুরুজী ইয়ে বাচ্চালোগ আপকাসাথ এক ফটো খিচনা চাতাহে। - কিঁউ নেহি, জরুর। সকলে দৌড়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে গেল, দুজন দুপাশে জড়িয়ে ধরল। ফটো তোলা হল। কিন্তু সবথেকে ছোটটার কি কান্না। ওর দাদা দিদিরা ফটো তুলেছে, ও তুলবে। কিন্তু ও কারোর কোলে যাবে না, আমার কোলে এল। চুপ করলো। এরা যেন আমার কত পরিচিত, কত আপনজন। পাশে থাকা একজনকে নাম জিজ্ঞেস করায় বলল-রুকবান আলী। বাহ্, খুব খুবসুরত নাম বেটা। তুমি তো মুসলিম হো নাহ্! - হুম্। - তো গুরুজী কা সাথ ফটো খিচনে কা ফায়দা কেয়া? - ওহ্ বুটা মালিক থা না, ওহি গুরুজী কো প্রণাম করকে বহুত সারা ইনাম পায়্যা হ্যায় না। ইসিলিয়ে মুসলিম সব গুরুজীকো বহুত মানতা হ্যায়। কী বুঝলেন আপনারা?

পার্বতী মহাদেবকে বললেন - অমরকথা শোনানোর জন্য। অমরকথা শোনানোর জন্য মহাদেব একটি নির্জন জায়গা চাইছিলেন। তখন বেছে নিলেন এই গুহা। এই গুহায় যাবার আগে ব্যালগাও (পহেলগাও এখন) তে নন্দীকে রেখে গেছেন। গণেশকে রাখলেন যে পর্বতে, তার নাম এখন গণেশ টপ। মহাদেবের গলায় যে শেখনাগ থাকে, তাকে যেখানে রাখলেন-তার নাম শেখনাগ এখন। পঞ্চতরণী পার করে পাহাড়ের মধ্যে বড় এক গুহায় এসে সবাইকে চলে যেতে বললেন। পায়রা সহ যারাই ছিল সেখানে, সকলে চলে গেলে মহাদেব শুরু করলেন সেই অমরকথা কাহিনী। কিন্তু, একটি পায়রা ডিমে তা দিচ্ছিল-সেই অবস্থায় সেখান থেকে চলে যায়। অমরকথা বলতে বলতে ওই তা দেওয়া ডিম ফুটে দুটি বাচ্চা পায়রা শুনে নেয় সেই অমরকথা। কি হবে এখন! মহাদেব তো মারতে উদ্যত। শিশু পায়রা দুটি মহাদেবের পায়ের কাছে এসে পড়ে। পার্বতী শান্ত করে মহাদেবকে - বোঝায় মহাদেবকে। ওদের কী দোষ?- তখন মহাদেব বর দেন - এখানে ভক্তরা এসে যদি কোনো পায়রা দেখতে পায়, সে মহা সৌভাগ্যশালী হবে। বহুকাল এভাবে এখানে মহাপুরুষ যারা, জানতে পেরে এই দুর্গম স্থানে আসতেন। কিন্তু, চতুর্দশ শতাব্দীর পরে ভেড়া চড়াতে এসে বুটা মালিক নামে একজন এই গুহায় এক সাধুর দেখা পান, সেই সাধু তাকে এক বস্তা ভেড়ার খাবার দেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভেড়াদের দিতে বলেন। বাড়ি গিয়ে দেখেন সেই হালকা বস্তা ভারী হয়ে গেছে। খুলে দেখেন - সোনা ও রত্নে ভর্তি সেই বস্তা। তারপর সেই বুটামালিক তো ধনী হয়ে গেলেন। তারপর তার এই গল্প সকলে

জানতে পেরে সকলেই ওই গুহায় যেতে থাকেন। এখন জুলাই আগস্টে প্রতিদিন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়ে থাকে। আমিও এক সাধুর সাথে সাধুবেশে অমরনাথ যাবো বলে রেডি হলাম। কলকাতা থেকে ট্রেনে জম্মু স্টেশনে নেমে পৌঁছলাম গীতা ভবন। আটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সেখানে একদিন থাকলাম। তার মধ্যেই অমরনাথ যাবার পাস পেলাম, ভোরবেলা সরকার থেকে আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে বাসে করে পহেলগাঁও পৌঁছে দেওয়ার পর - সেখানে এক রাত থেকে পরেরদিন সকালে আবার সরকারি গাড়ি করে চন্দনবাড়ি। এবার পায়ে হেঁটে চলা শুরু হল। এখানে বলে রাখি, অমরনাথ যাবার জন্য দুটি রাস্তা আছে এক হচ্ছে পহেলগাঁও দিয়ে আরেক হচ্ছে বালতাল দিয়ে। পহেলগাঁও দিয়ে যাওয়াই সঠিক পথ। এই পথেই মহাদেব গিয়েছিলেন, এছাড়াও এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম।

এবার বলি, অমরনাথ যাবো বললেই যাওয়া যায় না। অমরনাথ যেতে গেলে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন। যে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে মেডিক্যাল ফিটনেস করাতে হবে। অমরনাথ যাত্রা - এই সাইট এ গেলে সেখানে যে যে হাসপাতাল বলা আছে, সেখান থেকেই মেডিক্যাল করতে হবে। ওদের দেওয়া সেই ব্যাল্টেই টাকা জমা করতে হবে। তবেই জম্মু গিয়ে অফিস থেকে একটি আই কার্ড দেবে, যে কার্ড এ একটি চিপ থাকে, প্রত্যেক বেস ক্যাম্পে ঢোকা ও বেরোনোর সময় আপনার সাথে থাকা সমস্ত কিছু চেক হবে এবং আপনার সারা শরীরও। আর এই কার্ড স্ক্যান করতে হবে। স্ক্যান করলেই আপনার সমস্ত ডিটেইল স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। আপনি যদি মূল রাস্তা থেকে পাহাড়ের অন্য কোথাও যান, তাহলে সিকিউরিটি জানতে পেরে যাবে এখান থেকেই। তাই অমরনাথ যাত্রা পথে আপনি যাতে নিরাপদে থাকেন - তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চন্দনবাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলাম। পিঠঠু পিঠঠু - বলে কিছু মানুষ আপনার কাছে আসবে। আমি প্রথমে বুঝি নি। এই পিঠঠু হচ্ছে আপনার পিঠে যে ব্যাগ রয়েছে - সেটা ওরা বহন করে দেবে। এর জন্য টাকা নেবে। প্রথমেই এই পথে পিসুটপ, প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হবে। ঘোড়ায় গেলে ১২৫০ টাকা। আমরা হেঁটেই চলেছি। - গুরুজী! -প্রথম এখানেই এই ডাক শুনতে পেলাম। কেউ আমায় ডাকলেন। লিজিয়ে গুরুজী। ইয়ে কেয়া হ্যায়? - এ আপেল হ্যায়। কিতনা করকে? নেহি নেহি গুরুজী, ইয়ে আপকে লিয়ে, আপ তো গুরুজী হ্যায়। হাত ধরে মাথায় নিয়ে আশীর্বাদ চাইলেন। এই পথে কেউ লেবুর শরবত,

কোল্ড ড্রিঙ্কস, বিস্কুট প্যাকেট, আপেল বিভিন্ন কিছু এখনকার মুসলিম অধিবাসীরা বিক্রি করছেন। কিন্তু এরা গুরুজীকে কেন সম্মান করছে এত? যদিও এই পথে কোনো খাবার কিনতে হয় না। কারণ - পহেলগাঁও বেসক্যাম্প আসার পরেই প্রচুর লঙ্গর বা ভাণ্ডারা আছে। যেখানে আপনি চা, বিস্কুট, স্ন্যাক্স, ভাত, রুটি, বিভিন্ন তরকারী - সমস্ত রকম নিরামিষ খাবার পাবেন একদম ফ্রি। আর হ্যাঁ, এখানে আপনি টাকা দিয়েও কোনো খাবার কিনতে পারবেন না। পহেলগাঁও এর পরে আবার বেসক্যাম্প চন্দনবাড়ি। সেখান থেকে শেষনাগ বেসক্যাম্প প্রায় বারো কিলোমিটার। সন্ধ্যা হয়ে যাবে যেতে। তাহলে কি সন্ধ্যার আগে আপনি খাবার পাবেন না আর! অবশ্যই পাবেন, রাস্তায় যেতে যেতে একবার পর্বতের মাথায় আবার উপত্যকা, আবার পর্বত। পিসুটপ এসে খাবার পাবেন। পিসুটপ পার করে এবার জোজিভাল এসে খাবার পাবেন। এখানে গান বাজছে, নাচ করছে সকলে। আসলে ঠান্ডায় বরফ দেখতে দেখতে একটু গা গরম করে নেওয়া। কেউ স্নান করতে পারেন। টয়লেট এর সুবিধা এখানেই পাবেন। এরপর আবার পাবেন নাগাকোট, বিকালের টিফিন ও মজা নিতে পারেন। এত সুন্দর দৃশ্য - দুচোখের ক্লান্তি ঝরাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। এরপর হাঁটতে হাঁটতে শেষে শেষনাগ। আসার পথে প্রচুর ঝর্ণা দেখেছেন, বরফ গলতে দেখেছেন, সব ছিল স্বচ্ছ। কিন্তু, এই শেষনাগ একটি পাহাড়ের বুকে হ্রদ। এর জলের রঙ নীলচে সবুজ। বহু দিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ধবধবে সাদা সাদা বরফ গলার জল নেমে আসছে এই হ্রদে। হ্রদে এসেই রঙ নীলচে সবুজ। আবার যখন জলধারা বয়ে চলে যাচ্ছে নদী হয়ে, তখন জল আবার স্বচ্ছ। দূরে পাহাড়ের গায়ে বরফ জমে বিভিন্ন আকৃতি পায়। কোনোটা মনে হবে মহাদেব, কোনোটা গণেশ, কোনোটা শিবলিঙ্গ - নানান আকৃতি ভেসে উঠবে। শেষনাগ এসে রাত্রিযাপন। পহেলগাঁও এর মতোই এখানে টেন্ট আছে প্রচুর। পহেলগাঁও এ টেন্ট ছিল ৪৫০ টাকা জন প্রতি ভাড়া। এখানে ১০০ টাকা বেশি। সাধুদের অবশ্য সরকার থেকে আলাদা সুন্দর ব্যবস্থা করে থাকে। আমি সেই ক্যাম্প এ গেলাম। বাথরুম গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ভালোমন্দ খেলাম। প্রচুর ভাণ্ডারা কয়েক কিলোমিটার জুড়ে। এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সারাদিন এত হেঁটে কার ইচ্ছে হবে আবার হাঁটতে। তাই কাছাকাছি ভাণ্ডারা থেকে যা ইচ্ছে হল খেয়ে শুয়ে শুয়ে সারাদিনের সমস্ত দৃশ্য - কত মানুষ রাস্তায় গুরুজী গুরুজী বলে কাছে এসে কেউ সেলফি তুলেছে, কেউ নমস্কার, কেউ হাত

নিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে নিয়েছে তাই রোমন্তন করলাম। এ এক পরম অভিজ্ঞতা। এত ক্লান্তিতে ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক।

সকাল হলে প্রাতঃকৃত্য সেরে, যদিও এখানে একটু সময় লাগে। কারণ, পাহাড়ের উপর এত মানুষের থাকা খাওয়া বাথরুম - এসবই তো বরফ গললে তবে ব্যবস্থা করে সরকার থেকে। ভাবুন, প্রতিদিন প্রায় বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষ এই বেসক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে। যা সবই অস্থায়ী। প্লাস্টিক বা তাঁবু বা ফাইবার দিয়ে তৈরি, যা আবার দেড় মাস পরে খুলে নিয়ে নিচে চলে যাবে। তাই একটু কষ্ট হলেও সবাই সবাইকে এখানে সাহায্য করে। যাই হোক, রেডি হয়ে সকালের খাবার খেয়ে আবার যাত্রা শুরু। লম্বা লাইন পড়ে যায় ভোরবেলা থেকেই। বেসক্যাম্প থেকে বেরোনোর রাস্তায় চেকিং, কার্ড স্ক্যানিং- সময় তো একটু লাগেই। যদিও সাধুদের লাইনে দাঁড়াতে হয় না। সাধুদের আর্মির লোকেরা বিএসএফ বা সিআরপিএফ, জম্মু পুলিশ, অনন্তনাগ পুলিশ, অমরনাথ শাইন ভলান্টিয়ার্সরা সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করে। সবাইকেই সবরকম সাহায্য করে, কিন্তু, সাধুদের একটু বেশিই কেয়ার নেয়। গুরুজী গুরুজী বলে সম্মান করেন। যাই হোক, লাইন ছাড়াই বেরিয়ে গেলাম- হাঁটা শুরু করলাম। আজ আরও বেশি উচ্চতায় পথ চলতে হবে। ধবধবে বরফ, ধোঁয়া উঠছে, সূর্যমামা ভালো করে এখনও তেজী হতে পারে নি। তবুও ইচ্ছে হল একটু স্লিপ খাওয়ার। একটু কষ্ট করে উপরে উঠে বরফের মধ্যে গড়িয়ে নামার মধ্যে অনেক কষ্টের মধ্যে একটু সুখের হাসি হেসে নেওয়া। আবার তো পথ চলতেই হবে সারাদিন। সামনে বারবাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে টুকটাক খেয়ে এক গ্লাস গরম চা কী যে তৃপ্তি! আর বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষ ভাবে এই যাত্রায় সাধু সন্তদের আশীর্বাদ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তাই মাঝে মাঝেই আশীর্বাদ করা একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু, আর যে পারছি না এবার। অক্সিজেন লেভেল মেপে দেখলাম - ৭৯, পাশের একজনের দেখলাম ৭০, পথের মাঝে মাঝেই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন- চাইলেই অক্সিজেন দিয়ে দেন। শরীর বেশ ভারী আমার, ৯০কেজি। হাঁটু যদি নষ্ট হয় সারানো যাবে না। এইমাত্র একজনের হাঁটু দেখলাম ভীষণ ফুলে গেছে। তাকে কাপড়ে মুড়ে নিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারবাহিনী। পড়ে গেছে বা মচকে গেছে হাঁটতে পারছে না আর। একটু অসাবধান হলেই মৃত্যু। এই পথেই মোট আট জনের মৃত্যু দেখেছি। পিঠের ব্যাগটা বেশ ভার মনে হচ্ছে আজ। দু পা গিয়ে আর পারছি না। মনে হচ্ছে পারবো। কিন্তু পারছি না। একজন আর্মি এসে

গুরুজী বলে আমার ব্যাগটা পিঠে তুলে নিলেন অনেকটা উপরে উঠিয়ে দিয়ে আমার হাত তার মাথায় ঠেকিয়ে আবার তিনি তার ডিউটির জায়গায় ফিরে গেলেন। এভাবেই অনেক আর্মির লোকেরা সকলকেই সাহায্য করে থাকেন মনে হয়। আবার কিছুটা গিয়ে আর পারছি না। হঠাৎ একজন ঘোড়াওয়ালা কাছে এসে বললেন- গুরুজী, ঘোড়াপে চড়িয়ে। আমতা আমতা করছিলাম। হেঁটে না গিয়ে ঘোড়ায় যাবো? আবার হাঁটুর কথাও ভাবলাম। কেতনা লাগেগা, পঞ্চতরনী? -উঠিয়ে গুরুজী। আমার ব্যাগ টেনে নিয়ে নিলেন। আমি তাও বার বার জিজ্ঞেস করছি- না হলে যদি অনেক টাকা চেয়ে বসে! -গুরুজী, চিন্তা মত করিয়ে, আপকো জো মর্জি, ওই দেঙ্গে হামকো। বিশ্বাস হচ্ছিল না। দোদুল্যমান করে উঠেই বসলাম। বারবাল ছাড়িয়ে ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় মহাগণেশ টপ যখন পৌঁছলাম তখন ১১ টা। ঘোড়ায় করে বেশ সকলের আগে যাচ্ছিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল- ঠিক যেন স্বর্গ। যেহেতু হাঁটতে হচ্ছিল না, আরও বেশি করে উপভোগ করছিলাম -আকাশ, পাহাড়, বর্ণা, নদী, বরফ, মাঝে-মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এসেই বৃষ্টি নামায়। কখনও ঝিরঝির, কখনও বেশি। গুরুজী, কুছ টিফিন করেরগা ইয়াঁপে? আর কতনা টাইম লাগেগা পঞ্চতরনী? আর দো ঘণ্টা। চলিয়ে, নেহি খায়েঙ্গে কুছ ইধার। চলতে লাগলাম মহাগণেশ টপ ছাড়িয়ে পসিপাল এসে একটু চা খেলাম বর্ণার ধারে। ঘোড়াও বর্ণার জল খেয়ে নিল দেখলাম। যেতে যেতে ঘোড়াওয়ালার বাড়ির খবর নিলাম, প্রতিদিন আমার সহযাত্রী নকুলসাধু আগে এসে সাধুক্যাম্পে গিয়ে আমার জন্য জায়গা রাখে। আজ নকুল সাধুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। খুব মজা লাগছিল। নকুলসাধু ডাকছিল- দামোদর করে নিয়েছেন তো? কত বলেছে? ওরা কিন্তু..... - তুমি চিন্তা কোরো না....., ঘোড়া টগবগ করে এগিয়ে চলেছে সকল মানুষের আগে। সকল ঘোড়ারও আগে। ঘোড়ার মালিক শওকত আলী ছয় ছেলেমেয়ের বাবা দৌড়াচ্ছে পেছনে পেছনে। মাঝে মাঝে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আর্মি -ঘোড়া মত ছাড়িয়ে, এক্সিডেন্ট হো যায়েগা, একসাথ চলো। কত ছবির মত পাহাড়, কত সিনারী গুগল থেকেও হাজার গুণ ভালো। যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আসলে ছবি দেখা আর চাম্ফুস উপলব্ধি আকাশ পাতাল তফাৎ। আর সবার চোখ আর মন এক নয়, যে যেভাবে দেখে। আমার চোখে যা ধরা দিচ্ছে, পাশে থাকা আরেকজন সেটা নাও দেখতে পারে, তার মনের উপর নির্ভর করবে-সে কত সূক্ষ্ম ভাবে দেখবে। মন কতটা নেবে। চঞ্চল মন অনেক কিছুই দেখতে পায় না। আমি যা দেখছি, আমার থেকেও স্থির মন আরও

সুন্দর, আরও বেশি কিছু সে দেখবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়াও! কত বড় মাঠ। পাহাড়ে এসে আর অনেকদিন বাদে একটা বিশাল সমান্তরাল জায়গা দেখে মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। সামনে ওই দূরে পঞ্চতরণী বেসক্যাম্প। পাঁচটি নদীর মিলনক্ষেত্র। তাই এই জায়গা এত বড় সমান মাঠ মনে হচ্ছে। এই বিশাল মাঠের ওপারে ছোট ছোট টেন্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে নানা রঙের প্লাস্টিক পড়ে আছে মাঠে। দুপুর একটা বাজে, আমরা পৌঁছলাম। -কতনা দেঙ্গে বলিয়ে শওকত ভাই। গুরুজী, আপ কো মর্জি, আপকা মন যো চাহিয়ে হাম খুশিষে লেঙ্গে। রুপিয়া হো আর যো কুছ হ্যায় - ইয়ে শ্রেফ মেরা আশীর্বাদ হ্যায়। এই রে, এটা আবার কোন ছিলনা? (স্বগত) ৫০০ টাকা বের করেও ভাবলাম, থাক আরেকশো টাকা বেশি দিই। ৬০০ টাকা দিলাম। উনি টাকার হাত নিয়ে উনার মাথায় রাখলেন। ইয়ে মেরা বালবাচ্চাকো ভালোই রাখবে আশীর্বাদ দিজিয়ে গুরুজী। টাকাটা একটি সুন্দর ছোট্ট বক্সে রেখে দিয়ে 'ইয়ে রুপিয়া হাম নেহি খরচ করবে'। জিস দিন জিয়েগা, অ্যায়সেই রহেগা গুরুজী। এটা যেন উনার বিশাল প্রাপ্তি। উনি বেশ আত্মহারা। আমি এগিয়ে চললাম বেসক্যাম্প এর চেকিং সেরে যতদূর দেখা যায় দেখলাম উনি আমার দিকে তাকিয়েই আছেন।

প্রতিদিন তো নকুল সাধু আগে এসে সাধুদের থাকার জায়গা কোথায়, সেসব তিনিই ঠিক করে আমার আসার অপেক্ষায় থাকেন। আমি এসে বিশ্রাম নিই সাজানো বিছানায়। আজ! এক আর্মিকে জিজ্ঞেস করলাম -সাধুবালা ক্যাম্প কিধার হ্যায়? গুরুজী আইয়ে। আমার পিঠের ব্যাগ টেনে নিজের পিঠে নিয়ে -ইধার আইয়ে গুরুজী। প্রায় দু কিলোমিটার হাঁটার পর যেখান দিয়ে আমরা কাল বেরবো, ঠিক তার কাছেই গোল ছাদ দেওয়া বিশাল ঘর। -উপরমে যাইয়ে গুরুজী, বিশ্রাম করিয়ে। আপকে লিয়ে খানা - নেহি স্যার, হাম অভি নেহি খায়েগা নাহানে পর। উনি মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন। আমার তো জোর খিদে পেয়েছে, তাও উনাকে যেতে বললাম। আমি গিয়ে আমার পছন্দ মত খাবার খাবো। একজন সাধু রয়েছেন দক্ষিণের। তার উপর সব ছেড়ে দু জনের বিছানা করে আগে গেলাম খেতে। খেয়ে কিছুক্ষণ চারদিকের দৃশ্য নয়ন ভরে দেখলাম। বাড়িতে ফোন করে ভিডিও কলে দেখলাম। তারপর গরমজল নিয়ে বেশ লাগলো স্নান করতে। বিছানায় বসতেই ঘুমিয়ে পড়েছি কখন। উঠে দেখলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুরো ঘর ভরে সাধু। আমার পাশে নকুল সাধু কটায় এসেছেন? একটা। ঘোড়া কত নিল?

পরের দিন খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেছে। অন্ধকারেই প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে নকুলদাকে ডেকে তুললাম। আরও কয়েকজন উঠে পড়েছেন, কেউ পূজা-আহ্নিক এ ব্যস্ত। এক সাধু বললেন - আমরা যে আছি, এখানে একমাস পরে কেউ থাকবে না। ভাল্লুকেরা এখানে আশ্রয় নেবে। এই গোল ঘর থেকে বেরনোর একটিই দরজা, আর কয়েকটি ছোট জানালা আছে, সেই জানালার গা থেকে কয়েকটি লোম এনে দেখালেন -এই যে ভাল্লুকের লোম। নিয়ে যান অনেক কাজে লাগে। আমরা প্রত্যেকেই যারা এখানে আছি, প্রায় জনাচল্লিশ। সকলকেই এখান থেকে স্লিপার ব্যাগ দিয়েছে। সেই স্লিপার ব্যাগের মধ্যেই আছি, আর নিচে ফোম। তার নিচে বরফ জমে আছে। সকলকেই লাগছে ভাল্লুকের মতোই। প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে। আজ একটু আগেই বেরবো, যাতে বাবার দর্শন পাই। কারণ, রাতের ঠান্ডায় বরফ জমে, যত সময় বাড়ে, শিবলিঙ্গ মানুষের গরমে, চপারের হাওয়ায় গলতে থাকে। রেডি হয়ে ব্যাগ পিঠে নিয়ে - ও নকুলদা, আমি কি কিছু ফেলে যাচ্ছি? কেন? দেখে নিন সব। -নিয়েছি তো সব, কিন্তু ব্যাগ আজ ভীষণ হালকা মনে হচ্ছে। অর্ধেক ভারও নেই আজ। চলুন তাহলে, চা টা খেয়ে যাওয়া যাক।

এত শোভা চারধারে, আজ যেন একটু বেশি মজা হচ্ছে। একটু বাদেই দর্শন। হেঁটে চলেছি। একটু পরেই সঙ্গম। অনেক জায়গায় বরফে রাস্তা আটকে গেছে, রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে। এই পথে আমরাই প্রায় সকলের আগে। কিন্তু নদীর অপর পার দিয়ে বালতাল দিয়ে বহু তীর্থযাত্রী আসছেন। এই দুই রাস্তা এক জায়গায় গিয়ে মিলল, - এটাই সঙ্গম। প্রসাদ কিনলাম। হাঁটছি, হেলিপ্যাড এর পাশে নকুল সাধু আগে গিয়ে তার গামছা লাঠির মাথায় ওড়াচ্ছিলেন যাতে আমরা তার ওখানে যাই। কিন্তু হেলিকপ্টার এর হাওয়ায় নকুল সাধুর গামছা প্রসাদের প্যাকেট পাহাড়ের মাথায় উড়তে লাগল। যা তখনও আরও খানিক পথ বাকি, সকাল ৯ টায় পৌঁছলাম সেই আকাজক্ষিত গুহার কাছে। আমি বসলাম ব্যাগ, লাঠি, মোবাইল জুতো নিয়ে। নকুল সাধু ৫০০ সিঁড়ি বেয়ে অমরনাথ দর্শন করে ৩০ মিনিট পর। আমি এবার গেলাম। যেতে যেতে অমরনাথ এর কাছে আমার প্রার্থনা করলাম। যাদের যাদের মুখ ভেসে উঠল মনে সকলের মঙ্গল কামনা করলাম। সেই শিবলিঙ্গ - দেড় ফুট মত দেখা মিলল। তার থেকে বড় দেখলাম গণেশ পার্বতীর বরফস্তুভ। নিচে পুরোটাই বরফ। প্রার্থনা করতে করতে অনেক পায়রার দেখা মিলল। প্রায় দশতলা উঁচু গুহা। পায়রা উড়লে তো দেখা যায়ই। কিন্তু, একই জায়গায় অনিমেঘ চোখ রাখলে অনেক পায়রা দেখা যায়। এই গুহার মধ্যেই ছোট

ছোট খুপরি আছে, যেখানে পায়রারা ঢুকে আছে। গোলা পায়রা বেশি থাকলেও পাহাড়ের রঙে মিশে থাকা অনেক সাদা পায়রাও দেখলাম। প্রসাদ নিলাম। এখানেও গেরুয়া পরার সৌজন্যে সকলের মত আগে যেতে বলছে না। প্রসাদও অন্যদের তুলনায় বেশিই পেলাম। এবার নেমে আসার পথে যারা আমায় পুজো দেবার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকা দিয়ে কৃষ্ণদাস সরকার, বাবলু চৌধুরী একে একে সবার নামে বিল করালাম। নেমে এলাম এক নিদারুণ প্রশান্তি নিয়ে। পুজো দেবো বলে খাই নি আগে, প্রসাদ মুখে দিয়ে এবার খাওয়া যাক।

বালতাল এর রাস্তা বেশ খাড়া। কিন্তু, আমরা এই পথে নামবো। অতএব চিন্তা নেই। দিল্লির ৫৫৬ ভোগ এখানেও আছে দেখলাম। সবথেকে ভালো ও বড় এদের ভাঙুরা ছিল পৌষপত্নী। এখানেও কম নয়। অনেকরকম খাবার খেয়ে নানারকম ড্রিঙ্কস এর পর কোল্ড কফি খেয়ে প্রবল গতিতে নিচের দিকে নামছিলাম। মেঘ তো আসে যায়, ঝিরঝির বৃষ্টিও কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এ যে মুশল ধারে বৃষ্টি। রাস্তা এখানে পাকা করে দিয়েছে সরকার। ঘোড়া যাবার রাস্তাও আলাদা। বারারি এসেই দেখছি একসাথে আবার মানুষ ও ঘোড়া চলার পথ। আর বৃষ্টিতে ঘোড়ার লদিতে রাস্তা বেশ পিছল। চোখের সামনে অনেকেই স্লিপ কেটে পড়ছে আর সরাং করে অনেকটা নিচে। আর পড়বি পড় একের পর এক নিয়েই পড়তে হচ্ছে। যেমন করুন, তেমনিই হাসিও পাচ্ছে। কারো পা ভাঙছে, কারো বা হাত। ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। চিকিৎসার জন্য তো রেডক্রস থেকে শুরু করে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড, আর্মি, নানান সেবা কেন্দ্র।

মনে করেছিলাম আমাদের যাত্রা শেষ এখানেই। কিন্তু, এই বেসক্যাম্প এর শুরু এখানে, এখান থেকে বেসক্যাম্পের আরেক মাথায় আমাদের এখনও যেতে হবে ৩ কিমি। আর পারছি না এবার। শরীর ছেড়ে দিচ্ছে। ২৪ কিলোমিটার সকাল থেকে হেঁটে বালতাল পৌঁছে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, এখন আর মেনে নিতে পারছি না ৩ কিলোমিটারের এই রাস্তা। ভেজা শরীর, ব্যাগ ভিজে যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আর পারছি না। সন্ধ্যা তো আজ সারাদিনই। পাশ দিয়ে বয়ে চলা সিন্ধু নদীর গর্জন যেন অস্বস্তি লাগছে। পাশে কত দোকান, কত জড়ি বুটি, রুদ্রাক্ষ থেকে শুরু করে হাজারো রকম লদ দোকান। কিন্তু, এখন একটা আশ্রয় চাই। আর কিছু না। খাবারের জন্য তো কতই ভাঙুরা আছে, কিন্তু যতক্ষণ না গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছি, কিছুতেই ভালো লাগছে না। যদি হরকা বান আসে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নদীর ধারে টেনে তো থাকবোই না আজ। উঁচু জায়গা আরও

উঁচুতে উঠবো, হোক কষ্ট। রাস্তার দুধারে কত টেন্ট, ডাকছে। কিন্তু আমার সাথে সুন্দরবনের দুজন মহিলা আছে অদিতি আর অদিতির মা। রাস্তায় সকলেই আলাদা হয়ে যাই। নকুল সাধুর ফোন নেই, অন্য একজনের থেকে ফোন করে বললেন যেখানে আছেন, সেখানে যেতে আরও অনেক দেরী ৯টা বাজে। দোকান সব বন্ধ হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে অন্ধকার। মাঝে মাঝে টেন্ট এর মালিক এসে টেন্ট দেখতে বলছে, কিন্তু আমরা তিনজন কি করে থাকি! নকুল সাধুর ওখানেও কেউ পৌঁছায় নি বললেন। আমি ফোন করলে আর নকুল সাধুকে পাচ্ছি না। ১০ টা বাজতে চলল। আমরা একটা টেন্ট ভাড়া করলাম। জামা কাপড় সব মেলে দিয়ে আমি আর অদিতি ভাণ্ডারায় খেতে গেলাম। অদিতি ওর মায়ের জন্য খাবার নিয়ে এল। রাজা দা ফোন করল- ওরা এখন পৌঁছল, রাত তখন ১১ টা। রাতে আর কারো সাথে যোগাযোগ হ'ল না, ঘুম ভাঙল ভোর ৪টায়। নকুল সাধু ডাকছে। আমাদের ঘুম আর ভাঙছে না। আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। আবার ফোন -বাস স্ট্যান্ডে যেতে বলছে আমরা আজ লাদাখ যাবো এখান থেকে। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ রেস্ট নেবো এখানে। কোথাও যাবো না। আবার ফোন -নকুলদা আমরা শিবশক্তি ভাণ্ডারার বিপরীতে টেন্টে আছি। তুমি এখানে এসো। আমাদের রেডি হতে এখনও দু ঘণ্টা লাগবে। নকুলদা এসে বলছে, - কালরাতে তো আমি কোথাও জায়গা না পেয়ে এই ভাণ্ডারাতেই যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বলছে- আরতি সেরে খেয়ে ওখানেই ১০/১২ জন সাধু ঘুমিয়ে ছিলাম। -দেখলাম তো, ওখানে আমি আর অদিতি খেতে গিয়ে। তার মধ্যে যে ছিলে, তা বুঝি নি। কিন্তু, ওখানে রাত ১২ টা থেকে বসে আছি। কেন? নিচের দিক দিয়ে জলের ধারা বয়ে গেছে। আমার জুতো জামা টাকা ফোন আর খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে এখন একটু এখানে বিশ্রাম নিয়ে নাও। সকাল হতেই কত হকার -ভালো শাল আছে। ভালো শিলাজিৎ আছে। ভালো জাফরান আছে। ভালো রুদ্রাক্ষ আছে। ওখানকার চা খেলাম বিছানায় বসে, খুব ভালো লাগলো। ৮ টায় টেন্ট-বালতাল ছেড়ে ৩ দিনের জন্য গাড়ি ঠিক করে চললাম লাদাখ।

আনন্দম — সংস্কৃতির এক প্রাণের ঠিকানা
অপর্ণা দে

আনন্দম—নামটির মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে আনন্দ, মিলন এবং সৃষ্টির এক সুন্দর অনুভূতি। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান করার স্থান নয়; আনন্দম যেন বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত ও মানুষের মিলনের এক আপন ঠিকানা। এখানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রাখিবন্ধন, বসন্ত, বর্ষা কিংবা বাংলার নানা উৎসব—প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আনন্দম তার নিজস্ব সৌন্দর্যে সেজে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন যে সংস্কৃতি মানুষের মনকে বৃহত্তর করে, মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে। তাঁর ভাবনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়—আনন্দমের আসল সৌন্দর্য তার মঞ্চে নয়, সেই মঞ্চকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা ও মিলনে।

রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানের দিনে ‘আনন্দম’ যেন অন্য এক রূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা, নৃত্য ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবিগুরুর সৃষ্টি নতুন করে মানুষের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। তাঁর প্রকৃতি, প্রেম, মানবতা ও বিশ্বমানবতার ভাবনা অনুষ্ঠানের পরিবেশকে আরও গভীর করে তোলে।

আবার নজরুলের অনুষ্ঠানে আনন্দমে জেগে ওঠে বিদ্রোহ, সাম্য ও প্রাণের শক্তি। নজরুলের গান ও কবিতা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং মানবতার কথা বলতে শেখায়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে অদম্য প্রাণশক্তি, তা আনন্দমের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে।

রাখিবন্ধনের মতো অনুষ্ঠানেও আনন্দম মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। রাখির বন্ধন শুধু হাতে বাঁধা একটি সুতো নয়; এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। তাই এমন অনুষ্ঠান আনন্দমকে আরও আপন করে তোলে।

আনন্দমের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো—এখানে সংস্কৃতি কেবল মঞ্চে পরিবেশিত হয় না, মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। ছোট-বড়, শিল্পী-দর্শক—সবাই মিলে একটি সাংস্কৃতিক পরিবার তৈরি করে।

হালিসহর আনন্দম

স্বপ্ন উড়ান

কলমে -- স্বপ্না রায়

প্রথম সবসময় সর্বসেরা। আমার সাহিত্য জগতে বেশ কিছু বছরের পথ চলা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা বেরলেও, নিজস্ব একক কাব্য গ্রন্থ “স্বপ্ন উড়ান” আমার কাছে এক অনন্য অনুভূতি। পরিবারের সকলের উৎসাহে, এবং আনন্দমের সদস্যদের সহযোগিতায় আমার এ প্রয়াস সফল হয়েছে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ছিল আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের বহুকালের
 মনের বাসনা ছিল লালিত চিরদিনের ।
 উড়লো ধ্বজা সাফল্যের, লালিত স্বপ্ন দিলো উড়ান
 রয়ে গেল প্রিয়জনের ভালবাসার নিদর্শন ।
 স্বপ্ন মন বুনছিল আজীবন অন্তরালে
 মনে মনে প্রতিক্ষনে যা ছিল হৃদয়স্থলে ।
 ভালোবাসার আনুকূল্যে সফলতার প্রথম ধাপ
 পেরোতে হবে অনেকটা পথ, সাথে সাথ হাতে হাত ।
 প্রথম প্রেম, ভালোবাসা রয় চিরকাল মনের মাঝে
 প্রথম স্বপ্ন উড়ান দেওয়ার ক্ষণ রইলো গহীন কোণে ।
 “স্বপ্ন উড়ান” দিল পাড়ি সাহিত্যের অঙ্গনে
 পাঠক কুল করল ধন্য কবিতা পড়ে এক মনে ।
 স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত, মনের মাঝে হাজার প্রশ্ন
 সব প্রশ্নের উত্তর আজ পেলাম আমি সগর্বে ।
 প্রথম সব সময় সর্ব সেরা তাই – “স্বপ্ন উড়ান” প্রথম আবেগ
 প্রথম ভালোবাসা
 প্রথম উত্তেজনা
 প্রথম উচ্ছ্বাস
 প্রথম লালিত স্বপ্নের উড়ান
 সর্বসেরা একান্ত হৃদয়ের গান

হালিশহরের বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ -- চতুস্পাঠী ও সংস্কৃত চর্চা
শিবসৌম্য বিশ্বাস

“কাম কমল গঙ্গেশ

তিন নিয়ে বঙ্গদেশ”

এই প্রবাদ বাক্যটি একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরত। নব্য ন্যায়ের এই তিন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তখন বাংলায় আলোড়ন তুলেছিলেন। এর মধ্যে কাম হলেন কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন হালিশহর সমাজের নৈয়ায়িক, বিদগ্ধ পণ্ডিত আর সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তান। হালিশহর তথা কুমারহট্টের প্রথম পণ্ডিত সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায় সেন বংশের প্রতাপশালী রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১১৭৯ - ১২০৬ খ্রিঃ)। এই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় মহাদেবের পুত্র শ্রেষ্ঠ কুলীন বলে স্বীকৃত মকরন্দ; তাঁর ১১ জন পুত্রের অন্যতম ‘জনক’ এই অঞ্চলে প্রাচীন ‘কোনা’ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। “জনকস্য কোনা সমাজ”ই হচ্ছে কুমারহট্ট-হালিশহরের সম্ভবত প্রাচীনতম সমাজ। এরপর সাবর্ণ বংশের আদিপুরুষ পঞ্চগনন গঙ্গোপাধ্যায় অর্থাৎ পাঁচু শক্তিখান বিদগ্ধ ‘হালিশহর সমাজ’ গঠন করেন মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সময়, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা গনেশের রাজত্বকালে হালিশহরের উত্তরাংশে বাস করতেন শ্যামসুন্দর আচার্য। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর চতুস্পাঠিতে প্রচুর ছাত্র অধ্যয়ন করতো। এই বংশেরই অন্যতম পণ্ডিতবর্গ হলেন পুরন্দর আচার্য, গোপাল আচার্য, ভগবান আচার্য। আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রথম দীক্ষাগুরু ছিলেন এই শ্যামসুন্দর আচার্যেরই পুত্র শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরি স্বয়ং। গুরুর কাছে জ্ঞানাহংকারী নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং পরাভব স্বীকার করেন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রাবল্যে, পরে দীক্ষিত হন - এটা ইতিহাস তবে সবই তো লীলা।

তখন থেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সঙ্গে হালিশহরের পণ্ডিতদের শাস্ত্র নিয়ে তর্কযুদ্ধ লেগেই থাকতো।

এ নিয়ে প্রবাদও আছে ইংরেজ সাহেব উইলিয়াম ওয়ার্ল্ড (১৯৬৯-১৮২৩ খ্রিঃ) তাঁর গ্রন্থ “Account of the writings religion and manners of the Hindoos” (1st published on 1811 A.D.) তে উল্লেখ করেছেন নদীয়া (নবদ্বীপ) আর ত্রিবেণীর পরেই এই কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজের স্থান ছিল। সে সময় এখানে ৭-৮টি ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল। চারটি বেদ পড়ানো হতো বলে এই সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের নাম হয় মুসলমান আমলে ‘চতুষ্পাঠী’; চলতি কথায় ‘টোল’। পরবর্তী সময়ে টোলের নাম পরিবর্তন হয়ে ‘পন্ডিতবাড়ী’ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। ১৫০ বছরেরও বেশি প্রাচীন গুড উইল ফ্রেটারনিটি রামপ্রসাদ ভিটায় টোল খুলেছিল। এখানে প্রথমে যোগেন্দ্রনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও পরে বাণীকণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রায় জনশূন্য হালিশহরে শেষ টোলটি ধরে রেখেছিলেন ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার ও মাধব চূড়ামণি আর অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসাবে সে সময় নাম করতে হয় বনমালী বিদ্যাসাগর এর। তিনিও বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন।

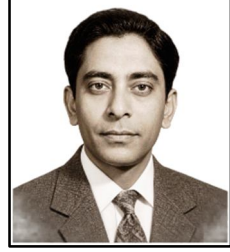
এরপর ইংরেজ আমলের শেষপাদে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব, আসামবঙ্গীয় স্বারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে ‘ঋষি বিদ্যালয়’ স্থাপন করেন যুগোপযোগী একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ার মানসিকতা নিয়ে। এই মঠের চতুষ্পাঠীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অধ্যাপনা করেছেন। গুরুতে অধ্যাপনা করেন পন্ডিত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ। এর পরবর্তী অধ্যাপকবৃন্দ হলেন যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, শ্যামাপদ মিশ্র ন্যায়তর্কতীর্থ, হেমন্ত কুমার ষষ্ঠতীর্থ, গদাধর পুততুঙ্গ ব্যাকরণ তীর্থ, পঞ্চগনন তর্ক বেদান্ত তীর্থ, গোপাল চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ বেদান্ত উপনিষদ তীর্থ, পন্ডিত রাজেন ব্রহ্মচারী প্রমুখ। এখানে সরকারি স্তরে পঠন-পাঠনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এখানকার শিষ্যগণ অন্তর্বাসী।

হালিশহরে আধুনিককালে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীশ্রী অখিল মহারাজ, স্বামী নির্বানন্দ সরস্বতী, শ্রী অনিবার্ণ, শ্রী কিশোরী দাস বাবাজি, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শ্রী ত্রিপুরেশ্বর মজুমদার, ঠাকুর শ্রী শ্রী অনিল চন্দ্র (মজুমদার)।

মননে শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ বিশ্বাসের (১৯৩৪- ১৯৭৬) প্রয়াণের অর্ধশতবর্ষ

পুণ্যভূমি কুমারহাট হালিশহরের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বসত করা একটি নাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ বিশ্বাস। ২০২৬ সালে তাঁর প্রয়াণের অর্ধশত বর্ষ পালন করছেন তাঁর একমাত্র সুযোগ্য পুত্র শিবসৌম্য বিশ্বাস ও তাঁর পরিবার।

১৩ ই জুলাই ১৯৩৪ রথযাত্রার শুভলগ্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪২ বছর বয়সে ৬ই আগষ্ট ১৯৭৬ খ্রীঃ তিনি প্রয়াত হন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের গ্রাম বাজিতপুর থানা মিরপুর জেলা কুষ্টিয়া। পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস ও মাতা সরলাবালা দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা কিংস এডওয়ার্ড মিশনারি স্কুল চাপড়া, কৃষ্ণনগর ও উচ্চ শিক্ষা নৈহাটি আর.বি.সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলা বিভাগের স্নাতক। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে গেজেটেড অফিসার। তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি বিশ্বাস ছিলেন নৈহাটি প্রফুল্ল সেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।



জগন্নাথ বিশ্বাসের শ্বশুরবাড়ি বর্তমান বড় শীতলা বাড়ি হালিশহর পূর্বাচল উত্তর চব্বিশ পরগনা। তিনি আমৃত্যু বসবাস করে গিয়েছেন নৈহাটি ও পরে হালিশহরে। তাঁর ক্রয় করা জমি উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহর পূর্বাচল মেইন রোডে। পরবর্তীতে উক্তস্থানে নির্মিত বাসভবনকে "পিতৃস্মৃতি" (১৯৯৩) নামকরণে শ্রদ্ধাৰ্থ নিবেদন করা হয় এবং মর্মর মূর্তি ও তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়।

একমাত্র পুত্র শিবসৌম্য বিশ্বাস (জহর) কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। একজন গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, কবি ও সমাজের বিভিন্ন কাজে যুক্ত এবং একমাত্র কন্যা সৃজনী বিশ্বাস (রূপা) গৃহবধূ। স্ত্রী কন্যা নাতনি নিয়ে শিবসৌম্য বিশ্বাসের সুখের সংসার। সমাজের বিভিন্ন কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনের সাথে থাকেন। শিবসৌম্য বিশ্বাসের এই সামাজিক কাজে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ও কন্যা সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জগন্নাথ বিশ্বাসের ৫০ বছর পূর্তিবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ৬ই আগস্ট ২০২৬ একটি স্মারক গ্রন্থ "পিতৃস্মৃতি" এর মোড়ক উন্মোচিত হয় কলকাতার বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে মাননীয় ট্রাস্টি সম্পাদক কুশল চৌধুরীর করকমলে। সমাজে স্বর্ণীয় এই মানুষটির অবদানকে স্বীকৃতি দিতে তাঁর প্রয়াণের অর্ধশতবর্ষে স্মরণে-মননে-শ্রদ্ধায় প্রবর্তন করা হয়েছিল "ঈশ্বর জগন্নাথ বিশ্বাস স্মারক সম্মান ২০২৬"। স্মারক, গ্রন্থ ও উত্তরীয় দিয়ে বিশিষ্টজনদের সম্মান জানিয়ে চলেছেন তাঁর একমাত্র পুত্র শিবসৌম্য বিশ্বাস ও পরিবার।

আনন্দম পরিবারের তরফ থেকে যুগ্ম সম্পাদকের এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাই এবং তাঁর পিতার প্রতি রইল আমাদের শতকোটি প্রণাম।



From The Desk of
Kusal Chowdhury, Trustee, Dakshineswar Kali Temple

Phone : 2564-5222/2544-4888 (Offi.) # 2329-1847/4488 (Resi.)

Tele-fax : 91-33-2564-1444 # E-mail : kusalchowdhury61@yahoo.com

E-mail : dakshineswarkalitemple@yahoo.com # Website : dakshineswarkalitemple.org

শুভেচ্ছা

স্বর্গীয় জগন্নাথ বিশ্বাস ছিলেন একজন উদার মনের মানুষ। আধ্যাত্মিক মনীষা ছিল কল্পনাশীল। তিনি মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মায়ের টানে প্রায়ই চলে আসতেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে এবং নাট মন্দিরে বসে ধ্যানস্থ হতেন। সেইসঙ্গে বহু আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। উচ্চপদস্থ আধিকারিক হওয়ার সুবাদে তাঁর কাছে বহু মানুষ নানা ভাবে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর ও আন্তরিক।

আগামী ৬ আগস্ট ২০২৬ স্বর্গীয় জগন্নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ৫০তম প্রয়াণ বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি সন্ধ্যা এবং ‘পিতৃস্মৃতি’ শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে ভাল লাগল। শ্রদ্ধা নিবেদন সন্ধ্যার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৬

ধন্যবাদান্তে—

প্রতি—

শিব সৌম্য বিশ্বাস

হালিশহর, পূর্বাচল

পোস্ট: নবনগর

জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা

কুসল চৌধুরী

ট্রাস্টি

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ও দেবোত্তর এস্টেট

কলকাতা: ৭০০০৩৫

হালিসহর আনন্দম

আনন্দমের গাড়ী পরিষেবায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন –
তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতাঃ

১। স্বপন পাল	- ৫০,০০০.০০
২। শিবসৌম্য বিশ্বাস	- ২৫,০০০.০০
৩। কৃষ্ণদাস সরকার	- ২০,০০০.০০
৪। রিন্টু দে	- ২০,০০০.০০
৫। কৃষ্ণ মজুমদার	- ১০,০০০.০০
৬। স্বপ্না রায়	- ৫,০০০.০০
৭। জ্যোতির্ময় পাল	- ৫,০০০.০০
৮। রুদ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	- ৫,০০০.০০
৯। তাপসী রায়	- ৫,০০০.০০
১০। অপর্ণা দে	- ৫,০০০.০০
১১। সঙ্গীতা চৌধুরী	- ৩০০০.০০
১২। মালা প্রামানিক	- ২,০০০.০০
১৩। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	- ২,০০০.০০
১৪। মমতা গাইন	- ১,০০০.০০
১৫। কাকলি মল্লিক	- ১,০০০.০০
১৬। ভাস্কর মজুমদার	- ১,০০০.০০
১৭। সুবোধ দেবনাথ	- ৫০০.০০
১৮। দিবাকর পন্ডিত	- ৫০০.০০
১৯। চন্দ্রনাথ বিশ্বাস	- ৫০০.০০
২০। ড: সীমা রায়	- ৫০০.০০

হালিশহর ভ্রমণ

॥ হালিশহর আনন্দম এর সাথে ॥ হালিশহর সহ আরও ভ্রমণ

হালিশহর আনন্দম, সরকার বাজার, হালিশহর, উঃ ২৪ পরগণা,

মোবাইল কল / হোয়াটস্ অ্যাপ - 9830293674

সারাদিন ঘুরে দেখানো ও খাওয়া দিয়ে পাঁচশো টাকা একদিন। কি কি দেখবেন?

শঙ্করাচার্যের মঠ, রামপ্রসাদের ভিটা, নিগমানন্দ আশ্রম, চৈতন্য ভোবা, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বামাকালি মন্দির, শ্যামাসুন্দরী মন্দির, অনুকুল মন্দির, পুষ্প আশ্রম, মা তারা মন্দির, সার্বণ চৌধুরিদের মন্দির এছাড়াও সাধুঘাট, রাসমণি ঘাট, বাধাঘাট, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী পার্ক, রামপ্রসাদ ঘাট সহ নানা পুরোনো শিব মন্দির ও তার ইতিহাস শুনতে শুনতে সারাদিন কেটে যাবে।

সকালে এসেই চা / কফি -বিস্কুট টিফিনে কচুরী বা পরোটা

দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ অথবা মাংস,

নিরামিষ চাইলেও পাবেন, চাইলে মন্দিরের প্রসাদ পেতে পারেন। বিকেলে এগরোল বা চাউমিন বা মোমো সাথে চা / কফি অথবা নিরামিষ রুটি তরকারী।

যদি দূর থেকে আসেন, রাতে থাকতে চান, সেক্ষেত্রে আরও পাঁচশো টাকা।

যদি এসি চান, হাজার টাকা।

সন্ধ্যায় আপনার সাথে কথোপকথনের লাইভ, রাতে ভাত বা রুটি। দুদিনের ভ্রমণে এর সাথে থাকছে- রাণী রাসমণি মন্দির, কল্যাণী জগন্নাথ মন্দির, ইন্সন মন্দির, লেকপার্ক, নৈহাটি বড়মা, বঙ্কিম ভবন, কেশব সেনের বাড়ি, রামঘাট, দাদুরাম আশ্রম প্রভৃতি।

প্রথম দিনের মতো একই খরচ।

তিনদিন থাকলে দেখতে পাবেন এর সাথে ব্যান্ডেল চার্চ, ইমাম বাড়ি, শরৎ চন্দ্রের বাড়ি, লাহিড়ী বাবার আশ্রম।

এভাবে আপনি বেশ কয়েকদিন হালিশহর থেকে হালিশহর বা আশে পাশে ঘুরে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।



With best compliments from

A WELL WISHER

মা মনমা মিষ্টান্ন ভান্ডার

সরকার বাজার, হালিশহর

মো : ৭২৭৮৩০৫৩৪৯

৩২৯৩৭৮৫৯৪৩

রুবি মিউজিক

সরকার বাজার, হালিশহর

মো: ৮৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭

প্রো : তপস্বিনী গাঙ্গুলী

এখানে খুব কম খরচে নিজস্ব স্টুডিওতে আধুনিক মানের
রেকর্ডিং করা হয়, গান, আবৃত্তি, প্রচার অডিও ইত্যাদি

সময় কে ধরে রাখুন স্মৃতির পাতিয়া

ছবি যখন কথা বলে

Ph. - 7003495224



দাম্পত্য চশমা - কম দামে Ph. 9830293674

প্রতি মাসের ২ তারিখ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।

আনন্দম্ অভিটোরিয়াম, সরকার বাজার, হালিশহর